বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি

একাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি

একাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে একাদশ শ্রেণির
ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।
বিক্রয়যোগ্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি

একাদশ শ্রেণি

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০২৪

প্রকাশক : ড. প্রিয়দর্শিনী মল্লিক
সচিব
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ
বিদ্যাসাগর ভবন, ৯/২, ব্লক-ডি জে
সেক্টর-II, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০০৯১

কপিরাইট পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক সংরক্ষিত। মাননীয়া সচিব, ড. প্রিয়দর্শিনী মল্লিক মহাশয়ার লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ পুনঃপ্রকাশ / পুনর্মুদ্রণ / স্ক্রিপ্ট ব্যবহার / হরফ অনুবাদ করা যাবে না।

মুদ্রণ
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় সংবিধান

প্রস্তাবনা

"**আমরা, ভারতের জনগণ**, ভারতকে একটি **সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র**রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে **সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যাচবিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম** এবং **উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা** প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে **ব্যক্তির মর্যাদা** এবং **জাতীয় ঐক্য** ও **সংহতি** সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথগ্রহণ করে, **আমাদের গণপরিষদে** আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই **সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ** এবং **নিজেদের অর্পণ** করছি।"

CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC AND TO SECURE TO ALL ITS CITIZENS** :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION**.

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

মৌলিক অধিকার (ভারতীয় সংবিধানের ১৪-৩৫ নং ধারা)

১. সাম্যের অধিকার

- আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে;
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না;
- সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার থাকবে;
- অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধনের কথা ঘোষণা করা এবং অস্পৃশ্যতা-আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এবং
- উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

২. স্বাধীনতার অধিকার

- বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার;
- শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার;
- সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার;
- ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার;
- ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার;
- যে-কোনো জীবিকার, পেশার বা ব্যাবসাবাণিজ্যের অধিকার;
- আইন অমান্য করার কারণে অভিযুক্তকে কেবল প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে;
- একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না;
- কোনো অভিযুক্তকে আদালতে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না;
- জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার;
- যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না; এবং আটক ব্যক্তিকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

- কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না;
- চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

- প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা আছে;
- প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মপ্রচারের স্বার্থে সংস্থা স্থাপন এবং সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে;
- কোনো বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে করদানে বাধ্য করা যাবে না;
- সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং সরকারের দ্বারা স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার

- সব শ্রেণির নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে পারবে;
- রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাত বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না;
- ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৬. শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

- মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকেরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতীয় সংবিধানের ৫১এ নং ধারা)

১। সংবিধান মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

২। যেসব মহান আদর্শ জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, সেগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ ও অনুসরণ;

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ;

৪। দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া;

৫। ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশসাধন এবং নারীর মর্যাদাহানিকর প্রথাসমূহকে বর্জন;

৬। আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যদান ও সংরক্ষণ;

৭। বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসাধন এবং জীবন্ত প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ব পোষণ;

৮। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারসাধন;

৯। সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন;

১০। সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্নপ্রকার কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন; এবং

১১। ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কর্তব্য।

ভূমিকা

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ দীর্ঘ বারো বছর বাদে সমস্ত বিষয়ে পাঠক্রম পরিমার্জন ও পরিবর্তনের পদক্ষেপ নিয়েছে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে এবং এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রকাশিত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সংকলনটি নবকলেবরে পরিবেশন করা হল। সর্বসিদ্ধান্তমতে সংসদ ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে 'সেমিস্টার সিস্টেম' প্রবর্তন করেছে। নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রকাশিত 'বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি' সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হল বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় করানো। আমাদের সেই উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও সফল হয়েছে। একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই সংকলনের মাধ্যমে শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্যেরও আস্বাদ পাচ্ছে। এখানে গতানুগতিকতা বা একঘেয়েমি এড়াতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। একই মলাটের মধ্যে আনা হয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা অর্থাৎ গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, বড়ো গল্প ইত্যাদি।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসুর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তরের অনুদানে এই বইটি ২০২৪ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

সংকলনটিতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসৃত হয়েছে। সংকলনটি প্রকাশে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

মে, ২০২৪
বিদ্যাসাগর ভবন

ডঃ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ড. জয়দীপ ঘোষ
ড. মৌসুমী মল্লিক
শ্রীমতী লক্ষ্মী দত্ত বনিক
শ্রীমতী ঋতা মুখার্জী

প্রচ্ছদ

সুব্রত মাজী

সূ|চি|প|ত্র

বাংলা ক

একাদশ শ্রেণি

সেমিস্টার - I

বাঙালির শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (প্রথম পর্যায়)

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় : প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সাহিত্য ৩-৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সাহিত্য ৯-৩৮

ভাষা (প্রথম পর্যায়)

প্রথম অধ্যায় : বিশ্বের ভাষা ও পরিবার ৪১-৫০

দ্বিতীয় অধ্যায় : ভারতের ভাষা পরিবার ও বাংলা ভাষা ৫১-৬২

তৃতীয় অধ্যায় : ভাষাবৈচিত্র্য ও বাংলা ভাষা ৬৩-৭০

সেমিস্টার - II

বাঙালির শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (প্রথম পর্যায়)

তৃতীয় অধ্যায় : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা ৭৩-১২২

চতুর্থ অধ্যায় : লৌকিক সাহিত্যের নানা দিক ১২৩-১৩৬

সূ|চি|প|ত্র

পরিশিষ্ট : এক

প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)

নির্দেশিকা ও নমুনা

- সটীক অনুবাদ ১৪০
- সাক্ষাৎকার গ্রহণ ১৪৮
- প্রতিবেদন রচনা ১৫৭
- স্বরচিত গল্পলিখন ১৫৯

পরিশিষ্ট : দুই

প্রুফ সংশোধন রীতি ও পদ্ধতি

- নির্দেশিকা ও নমুনা ১৬৩

বাঙালির শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
(প্রথম পর্যায়)

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সাহিত্য

ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক দিকনির্দেশ :

প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য প্রথমেই আমাদের তৎকালীন বাংলার ভৌগোলিক সীমা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিতে হবে। মোটামুটিভাবে বলা যায় অবিভক্ত বাংলা (পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ), বিহার (উত্তরাংশ, মিথিলা, সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, সিংভূম, ছোটনাগপুর ইত্যাদি) ওড়িশা, আসাম (ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ উপত্যকা)—এই সুবিশাল অংশ জুড়েই ছিল প্রাচীন বঙ্গদেশ। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনো দেশের ভৌগোলিক এলাকাও পরিবর্তিত হয়। বিশেষ করে এক বৃহৎ কালখণ্ডের প্রেক্ষিতে, কোনো রাজতন্ত্রের উত্থানপতন, জয়-পরাজয়, স্থানীয় অভ্যুত্থান বা বৈদেশিক শক্তির আক্রমণের নিরিখে এই পরিবর্তন এক স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় ঘটনা। তাই বঙ্গদেশের ক্ষেত্রেও এই ভৌগোলিক সীমারেখার বহুবার পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সেই সময়কালে বঙ্গদেশের সমগ্র এলাকা জুড়ে (পাল-বর্মন-সেন রাজাদের রাজত্বকালে) অখণ্ড বঙ্গভূমির কোনো ধারণা পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছিল তা নয়। তবে যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই বিস্তৃত কালপর্বে মানুষের যে ভাষা-সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য ছিল, সেই বনিয়াদের ওপর ভিত্তি করেই, বাঙালির সংস্কৃতি গড়ে উঠতে শুরু করে।

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সময়কাল প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে একটি ভাঙাগড়া বা টানাপোড়েনের সময়। এই দুশো বছরের মধ্যে কয়েকশো বছর ব্যাপী স্থায়ী পালবংশের রাজত্বের অবসান হয়েছে, ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বর্মন ও সেন বংশ; এরপর আবার মুসলিম আক্রমণে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেন-রাজত্ব—সুতরাং রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে, সামাজিক অস্থিরতায় আন্দোলিত এই সময়কে আমরা যুগসন্ধির (time to transition) সময় বলে চিহ্নিত করলে অত্যুক্তি হবে না। মনে রাখতে হবে এক রাজতন্ত্রের অবসান থেকে অন্য রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মানে শুধু ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও হস্তান্তর নয়। রাজারা যে ধর্মের পৃষ্ঠপোষক, সে সময় সেই সমস্ত ধর্ম রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করেছে এবং অন্য ধর্ম কোণঠাসা হয়েছে। গুপ্তযুগের সময় থেকে পাল, বর্মন ও সেন রাজাদের সময় পর্যন্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য বিস্তারের সংঘাত, উভয় ধর্মের অভ্যন্তরে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। দুই ধর্মমতের মধ্যে তৈরি হয়েছে নানা দল-উপদল ও মতবাদ এবং এই ঘরে-বাইরে বিরোধ তাদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এক সমন্বয় গড়ে তুলতে কখনও সাহায্য, কখনও বাধ্য করেছে। আবার জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু ব্রাহ্মণ্য (আর্য) সংস্কৃতি আমদানি হওয়ার আগে থেকেই বাংলার আদি অধিবাসীদের মধ্যে একটা নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাবধারা ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল; যা বাংলার একান্ত ভেতরের জিনিস। এই প্রাক-আর্য সংস্কৃতির বহতার সঙ্গেই হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, লোকায়ত, সহজিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মমত এসে যোগ দিয়ে সংঘর্ষ এবং সমন্বয়ের একটি অন্তর্লীন কাঠামো গড়ে তোলে। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' এর ব্যতিক্রম নয়। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক সত্তা নিয়ে আলোচনার সময় আমরা এই সমন্বয় ও সংমিশ্রণকেই গভীর ও ব্যাপকভাবে লক্ষ করেছি, এবং বাঙালি সংস্কৃতির উন্মেষলগ্নে সেই একই সুর বজায় থাকতে দেখব।

চর্যাপদের আবিষ্কার :

সাংস্কৃতিক ঐক্যের একটি প্রধান উপাদান হল ভাষা। কেননা ভাষার মাধ্যমেই কোনো জাতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তরাধিকার প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এ বাঙালির ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতি কেমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তা দেখা যাক। তবে তার আগে এই 'চর্যাপদ' আবিষ্কার হল কীভাবে? তার পাঠোদ্ধার করে কী পাওয়া গেল? বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে একটি পুথি সংগ্রহ করে আনেন। অন্য দুটি অপভ্রংশ রচনার সঙ্গে একত্রে এর নাম ছিল 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। এই ঘটনার প্রায় দশ বছর পরে ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে ছিল সংস্কৃত টীকাসহ ধর্মাচরণের বিধিনিষেধ বিষয়ক মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি (৪৬টি সম্পূর্ণ গান এবং ১টি খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ গান) এবং বৌদ্ধাচার্য সরোজবজ্র ও কৃষ্ণাচার্য রচিত দোহা। সাধারণভাবে লোকমুখে এটিই চর্যাপদ বা চর্যাগীতি নামে পরিচিত। এর বেশ কিছুকাল পরে প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় নেপাল থেকেই চর্যাপদের অন্য একটি তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন। তিব্বতিতে প্রাপ্ত পদ বা গানের সংখ্যা একান্ন। যা থেকে বোঝা যায় মূল বইয়ে মোট একান্নটি পদ বা গান ছিল। যাইহোক এই চর্যাপদের আবিষ্কার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কেননা চর্যাপদ হল একই সঙ্গে বাংলা ভাষা তথা নব্য ভারতীয় আর্যভাষার (NIA) প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত।

রচনাকাল :

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় নানা দিক বিচার করে প্রমাণ করেছেন এই পদগুলি দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়েছিল। আর এর গীতিকারেরা সকলেই হয় প্রাচীন বাংলার অধিবাসী ছিলেন, নয় তাঁদের বাংলাদেশ ও বাঙালির জীবন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল।

কবি পরিচিতি :

চর্যাগীতি রচয়িতাদের সকলের জীবন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য যথেষ্ট নয়। বরং তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বল্প এবং পরস্পরবিরোধী। তবে তার মধ্য থেকেই আমরা জানতে পারি মোট চব্বিশ জন কবির কথা। যার মধ্যে কাহ্নপাদের (বা কৃষ্ণাচার্য) সর্বাধিক বারোটি, ভুসুকুপাদের আটটি, সরহপাদের চারটি, কুক্কুরীপাদের তিনটি, লুইপাদ-শান্তিপাদ-সবরপাদের দুটি এবং ডোম্বীপাদ, চাটিল পাদ, দ্বারিক পাদ, ধামপাদ প্রমুখের একটি করে পদ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেছিলেন এঁরা সকলেই বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্য। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে মহাযান, বজ্রযান, সহজযান, হীনযান ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা এবং সর্বোপরি তান্ত্রিক মত, চর্যার বিভিন্ন গানে নানা অভিব্যক্তি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাই এখানেও সমন্বয়ী ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে। যে সমস্ত চর্যাকারেরা তাত্ত্বিক দিকটিকে প্রচ্ছন্ন রেখে সমকালীন কোনো রূপছবির সাহায্যে তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেখানে পদগুলি কাব্যসম্ভাবনাময় ও গীতমাধুর্যের প্রকাশক। এক্ষেত্রে ভুসুকপাদ, শবরপাদ, ঢেন্ঢনপাদ প্রমুখের নাম আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়।

কাব্যমূল্য :

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গানগুলির মূল্য আমরা বিচার করব। বৌদ্ধ সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত এবং সেই সাধনপথের আনন্দকে প্রকাশ করার জন্য এই গানগুলো লেখা, শুধু কাব্যসৃষ্টির জন্য নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই গানগুলির প্রবর্তিত খাতেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলি, আউল-বাউল-মারিফতি-মুরশিদি গানের প্রবাহ চলেছে।

চর্যাপদের প্রায় সবকটি গানই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা, অন্ত্যমিলযুক্ত এবং কোথাও কবির নাম অনুল্লিখিত থাকলেও সবক্ষেত্রে রাগরাগিণীর নির্দেশ বেশ স্পষ্ট, যেমন মল্লার, বঙ্গালি ইত্যাদি। আর চর্যায় গানগুলিতে লৌকিক জগতের যে চিত্রময় বর্ণনা আছে তা আমাদের অভিভূত করে।

শবরপাদের ২৮নং পদটি উদ্ধার করা যাক—

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী।
ণাণা তরূবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিন্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।।

(উঁচু উঁচু পাহাড়ে শবরী বালিকা বাস করে, শবরী ময়ূরপুচ্ছ পরেছে আর তার গলায় গুঞ্জাফুলের মালা। ওগো উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করো না। আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা বৃক্ষ মুকুলিত হল। আকাশ স্পর্শ করেছে তাদের পুষ্পিত ডাল। শবরী নানা ভূষণে সেজে এ অরণ্যে একা ঘুরে বেড়ায়।)

এখানে কবির রূপানুরাগ অনবদ্য। ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জার মালায় সজ্জিত শবরী বালিকা এবং পুষ্পিত শাখায় পল্লবিত প্রকৃতির চিত্ররূপের মধ্যে শবরের প্রেমানুভূতির ব্যঞ্জনা আধুনিক কবিতা পাঠককেও আলোড়িত করে, যার আবেদন চিরকালীন। এইরকম শবরপাদের আরেকটি পদ—

....হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা।।
তইলা বাড়ীর পাসেঁর জোহ্নাবাড়ী তাএলা।
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশফুলিলা।।
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অণুদিণ-শবরে কিম্পি ন কেবই মহাসুহেঁ ভেলা।। (চর্যা ৫০)

(আমার উঁচুতে ঘর। কার্পাসফুলে তার চারপাশ ভরে গেছে। বাড়ির পাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার আলোয়

আঁধার কেটে গিয়ে যেন অজস্র ফুল ফুটেছে আকাশে। কঙ্গুচিনা ফল পেকেছে আর শবর-শবরী প্রেমাবেগে মেতে উঠেছে।)

এভাবে চর্যাপদে বারবার সাধারণ মানুষের জীবনের নিখুঁত বিবরণ কাব্যময়তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নদী, মাটি, ডালপালা, নৌকা, দাঁড়, ঘাট, অরণ্য, শবর-শবরী, ডোম্বী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন অথচ দৈনন্দিন অনুষঙ্গকে চর্যাকারেরা অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। চারপাশের চেনা জগতের ছোটো ছোটো খণ্ড মুহূর্ত, বাস্তব জীবনের দৃশ্য যেন ছায়াছবির মতো বারবার ফিরে আসে। শান্ত সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টা, গোরুর দুধ দোয়া ও উষ্ণ দুধের গন্ধ, অরণ্যের আঁধারে শিকারির হরিণ ধরা, গ্রাম্য বধূর বিষণ্ণ মুখ, মাদলের আওয়াজে বোঝা যায় বর চলেছে বধূ আনতে, সেখানে স্ত্রীআচার, বাসরঘর, অথবা 'নিসি অন্ধারী মুসা অচারা'—অন্ধকারে ইঁদুরের ঘোরাফেরা এবং সর্বোপরি নদীময় বাংলার শান্ত, স্রোতস্বিনী, তরঙ্গে উত্তাল সজলতার কথা নানান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা জানি চিত্রধর্মিতা কবিতার একটি বিশিষ্ট দিক। বিশেষ করে মানুষ আর প্রকৃতির সহজ ও গভীর সম্পর্কের চিত্রগীতিময় মানবিক প্রকাশ চর্যাপদেই আমরা প্রথম খুঁজে পেলাম।

দার্শনিকতা ও ধর্মমত :

মনে রাখতে হবে চর্যাগীতিগুলি মূলত সাধনসংগীত। এগুলি দীর্ঘকাল নৃত্য-সহকারে গীত হত। সাধক কবিরা তাঁদের সাধনার নিগূঢ় সংকেত প্রচার করেছেন এই গানগুলির মধ্য দিয়ে। বৌদ্ধধর্মের মহাযানী শাখা পরবর্তীকালে বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান ইত্যাদি নানা শাখায় বিবর্তিত হয় এবং এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তান্ত্রিকতা। যার অনুপ্রবেশ ব্রাহ্মণ্যধর্মেও ঘটেছিল কেননা তন্ত্র, মন্ত্র ও অন্যান্য রহস্যময় গূঢ় পন্থা এসবই বাংলার আদিম কৌম সমাজের অর্থাৎ অনার্য সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য বিশেষত্ব। চর্যাপদে এই বিভিন্ন যানের বিবর্তিত রূপের সঙ্গে তান্ত্রিকতার সমন্বয় ও মিশ্রণ ঘটেছিল। বাংলার অন্তরের এই সমন্বয়ী রূপের কথা আমরা তাই প্রথমেই আলোচনা করেছিলাম। তবে চর্যাগীতি প্রাথমিকভাবে বৌদ্ধ দর্শনেরই প্রতিধ্বনি। আর, বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য হল এই দুঃখ-বেদনাময় মানবজীবন থেকে নির্বাণ বা মুক্তি। এই নির্বাণপ্রাপ্তির উপায় বা অবস্থাকে কেন্দ্র করেই বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদের বিবর্তন। কেননা শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ—নির্বাণের এই তিনটি অবস্থা। সহজ ভাষায় বলতে গেলে সাধনার মাধ্যমে মানুষ এই মহৎ উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হয়। তাই চর্যাকারেরা তাদের গানে অন্তরে লীন মনোময় অনুভূতির উপরেই জোর দিয়েছেন। একথাও ঠিক চর্যায় কোথাও দেহ-সাধনার কথা আছে, তন্ত্রের প্রসঙ্গ আছে, আবার তন্ত্র, মন্ত্র, ধ্যান, জপ ও দেহের অসারতার কথাও সাধক-কবি বলেছেন নিরাসক্ত মনে। আসলে সাধনগীতির ঐতিহাসিক বাস্তবতা হয়তো এটাই—নানা মৌলিক চিন্তাধারা ও সংশ্লেষকে সম্বল করে তা গড়ে ওঠে, পরে সেই সমস্ত গূঢ় দার্শনিক প্রসঙ্গ কালের স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমশ চাপা পড়তে থাকে; একমাত্র তার স্বতন্ত্র মানবিক আবেদনটুকু চিরকালীন হয়ে থেকে যায়। একই পথে হেঁটে বৈষ্ণব-গান, বাউলগান, মুরশিদি গান, নাথ সাহিত্যের দেহযোগের গান, শাক্তপদাবলি প্রভৃতি সাধনসংগীত হয়েও, আধুনিক মানুষের কাছে নি:সঙ্গ অসহায় মনের; বেদনাময় আকুতির শিল্পিত প্রকাশ হিসেবেই সর্বোচ্চ সমাদর পায়।

ভাষা ও উত্তরাধিকার :

চর্যাপদের ভাষাকে কেউ কেউ বলেছেন সন্ধ্যা বা সন্ধা ভাষা। অর্থাৎ সন্ধ্যার ম্লান আলোয় যেমন রহস্যের প্রহেলিকা থাকে, অস্পষ্টতা থাকে, তেমনই চর্যার ভাষাও আধেক স্পষ্ট আধেক অস্পষ্ট। তার কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা বোঝা যায় না। মতান্তরে 'সন্ধা' শব্দের অর্থ 'সম্যক ধ্যান' অর্থাৎ সম্যক ধ্যানের মাধ্যমে যে ভাষার

পাঠোদ্ধার সম্ভব। মনে রাখতে হবে আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগের ভাষায় চর্যাপদ লেখা। সুতরাং, বাংলা ভাষার আদিম ও অপরিণত স্তরের লক্ষণ এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। এই অপরিচয়ের দূরত্বকে অতিক্রম করতে পারলে, দুর্বোধ্যতার আড়াল ভেঙে আমরা গানগুলির মধ্যে যে কাব্যরস ও সমকালীন লৌকিক জগতের প্রাণবন্ত ছবি আছে তা প্রত্যক্ষ করি।

যে সময় চর্যাপদ লেখা, তখন বাংলাদেশে সংস্কৃত, শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং মাগধী প্রাকৃত লেখ্য ভাষার মর্যাদা পেত। এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন অপভ্রংশ হল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার (MIA) শেষ স্তর। লোকায়ত বা প্রাকৃত ভাষার সহজ-সরল রূপটি এই ভাষার ছাঁদে ফুটে উঠেছে। সেই সময়ের বাংলায় মাগধী অপভ্রংশের সঙ্গে সারা উত্তর ভারত জুড়ে শৌরসেনী অপভ্রংশের বহুল প্রচলন ছিল। আর 'মাগধী' অপভ্রংশের স্থানীয় গৌড়বঙ্গীয় রূপের সঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশের খুব বড়ো কিছু পার্থক্যও ছিল না। তাই স্বাভাবিকভাবেই হিন্দি, মৈথিলি ও ওড়িয়াভাষীরাও চর্যাপদের উপর তাঁদের দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Origin and Development of Bengali Language' বইয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চর্যাপদ যে বাংলা ভাষার পূর্বসূরি তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। খুব সংক্ষেপে বললে, তাঁর যুক্তিগুলি ছিল—

১. চড়িলে, জান্তে, বুঝিআ প্রভৃতি শব্দে—ইলে, —ইতে, —ইয়া যোগ করে অসমাপিকা পদ সৃষ্টি। ২. ভইল, জিতেল প্রভৃতি শব্দে —ইল যোগ করে অতীতকালের ক্রিয়াপদ গঠন। ৩. করিব, যাইবে—ইব যোগ করে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ গঠন। ৪. এক, দুই, চৌষঠ্ঠী প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের রূপ। ৫. ডোম্বীএর, হরিণার প্রভৃতি—এর, —অর বিভক্তি যোগে সম্বন্ধ পদ সৃষ্টি। ৬. বাহবকে, গঅবঁরে ইত্যাদি গৌণ কর্মে—কে, ক, রে বিভক্তির প্রয়োগ। ৭. সাঙ্গ, মাঝ, অন্তর ইত্যাদি অনুসর্গের পদ হিসেবে ব্যবহার। ৮. 'অপনা মাংসে হরিণা বৈরী' (নিজের মাংসের জন্য হরিণ নিজেরই শত্রু), বর সুন গোহালী কিসো দুট্ঠ বলন্দে (দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো) প্রভৃতি বাংলার একান্ত নিজস্ব বাগ্‌ধারার প্রয়োগ।

এইসব ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং সহজ কোমল নদীময় বাংলার রূপচ্ছবি থেকে নি:সংশয়ে প্রমাণিত হয় চর্যাগীতি বাংলা ও বাঙালির প্রাচীনতম পূর্বসূরি।

সমাজ ও লৌকিক জীবন :

আমরা এই অধ্যায়ের আরম্ভেই চর্যাগীতির সমকালীন সমাজ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কেননা এই গানগুলির বস্তুগত খুঁটিনাটির মধ্যে প্রাচীন বাংলার লৌকিক জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। সে সময়ে দরিদ্র নিম্নবিত্ত বাঙালির জীবনে দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না।

'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেসী।।
বেংগ সংসার বড়্হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামায়।। *(চর্যা ৩৩ / ঢেন্ডন পা)*

(অর্থাৎ টিলার উপরে আমার ঘর, সেখানে প্রতিবেশী নেই, হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য উপবাস। অথচ ব্যাঙের সংসার ক্রমশ বেড়েই চলে।) এখানে লক্ষণীয় বাঙালির প্রিয় খাদ্য এই ভাত। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির

মতে আদি-অস্ত্রালদের প্রধান খাদ্যবস্তু ছিল ভাত। বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে ভাতের এই ভূমিকা আদি-অস্ত্রালদের কাছ থেকেই পাওয়া, পরে যা বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেছে। এছাড়াও পরনের ছেঁড়া কাপড়, ভাঙা কলসি, জীর্ণ কুঁড়ে ঘরের চাল উড়ে যাওয়া, মাটির দেয়াল গলে পড়ার ছবি—এক লহমায় শবর-শবরী, ডোম-ডোমনী, নিষাদ প্রভৃতি সমাজের প্রান্তীয় মানুষগুলির নি:স্ব নিরানন্দময় জীবনের দৈনন্দিন বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তোলে। এই অভিশাপগ্রস্ত জীবনে একমাত্র বিনোদন ছিল যূথবদ্ধ নাচ, গান এবং গ্রামীণ উৎসব। তাই যৌথ নাচ-গানের প্রসঙ্গ বারবার বিভিন্ন চর্যাগানে ফিরে ফিরে আসে। আর সেইসঙ্গে ঘর-গেরস্থালি আর বিবাহের প্রসঙ্গও এসে যুক্ত হয়। মাদল বাজিয়ে বরের বিয়ে করতে যাওয়া, কর্পূর দিয়ে পান খাওয়া এবং বধূসাজে অলংকৃত রমণীর বাসরঘরে অন্যান্য মেয়েদের ভিড় করার ছবিও কবিতায় অনায়াসে উঠে আসে। সে সময়ও বিবাহে বরপক্ষ যৌতুক নিত এবং বেশি যৌতুকের লোভে নীচজাতের মেয়েকে বিয়ে করতেও দ্বিধা করত না। এই সত্য কাহ্ন পা ('ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা।' চর্যা ১৯) ডোমবীকে বিয়ে করার মধ্যে দিয়ে পাঠককে জানিয়েছেন। তখনকার দিনে রাত্রে চোর-ডাকাতেরও উপদ্রব ছিল, মধ্যরাতে চোর বউয়ের কর্ণাভরণ খুলে নিয়ে যায় ('দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।' চর্যা ২)। তাই চোর আটকানোর জন্য প্রহরীরও প্রয়োজন হত ('সুন বাহ তথতা পহারী।' চর্যা ৩৬)। সমাজে শ্রেণিভেদ, বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা ছিল। ডোম, নিষাদ, শবরেরা গ্রামের বাইরে, উঁচু টিলায় বাস করত। এই প্রান্তবাসী মানুষদের বৃত্তি ছিল তুলো ধোনা, দই বানানো, মদ বিক্রি, মাছধরা, নৌকা চালানো, পশুপাখি শিকার, জাদুবিদ্যা, সাপের খেলা দেখানো ইত্যাদি। আর ধনীর ঘরে সোনারুপোর অভাব ছিল না। তারা বেশ আড়ম্বর করে মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করে পুজো করতেন। —এই ধরনের নানান টুকরো লোকজীবনের ঘটনা-মুহূর্ত ও কৃষিনির্ভর নদীময় গ্রামীণ বাংলার ছবি দিয়ে চর্যাগীতিগুলো গড়া। সেখানে উচ্চবর্ণের মানুষদের পরিবর্তে প্রান্তিক-অনার্য-অতি সাধারণ মানুষের তথাকথিত অমার্জিত জীবন; সমাজ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও অবক্ষয়ের দুর্বিপাকেও সুখ দুঃখের আলো-আঁধারিতে ভরা তাঁদের বেঁচে থাকার ঐতিহাসিক উজ্জ্বলতা ছত্রে ছত্রে দেখা যায়। বাংলা কবিতায় চর্যাগীতির হাত ধরেই নিঃস্ব, অন্ত্যজ, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কথা সাহিত্যের আঙিনায় এসেছিল, একথা আজ আমরা বলতেই পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী 'অন্ধকারময় যুগ'। সাহিত্য রচনার কোনো অনুকূল পরিবেশ, সামাজিক স্থিতি সে সময়ে ছিল না। তুর্কি বিজয়ের ফলশ্রুতিরূপে বাংলাদেশে যে প্রবল সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, তাতে সেই সময়পর্বে কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি; বরং পরবর্তী সময়ের জন্য সুযোগ্য প্রস্তুতিই যেন এই কালপর্বে সংঘটিত হয়েছিল, যার প্রকাশ ও পরিপূর্ণতা কয়েক শতাব্দী ধরে দেখা গেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'মধ্যযুগ' বলতে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে বোঝায়। মধ্যযুগের কাব্যভাবনা ও রচনার বিবর্তনের পথরেখা অনুসরণ করে এই যুগের সাহিত্যকে তিনটি প্রধান উপচ্ছেদে ভাগ করা যায়—

(এক) প্রাক-চৈতন্য পর্ব অর্থাৎ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী পর্ব (চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী),

(দুই) চৈতন্য পর্ব (ষোড়শ শতাব্দী),

(তিন) চৈতন্যোত্তর পর্ব (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী)।

সমগ্র মধ্যযুগ তো বটেই, আধুনিক যুগের জীবন ও সাহিত্যচিন্তা পর্যন্ত চৈতন্যদেবের বিপুল, সর্বাতিশায়ী প্রভাবে এমনভাবে প্রভাবিত, যার তুলনা সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই অতুলনীয়। সেই কারণে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাকে তাঁরই নামাঙ্কিত করে উপবিভাগ করা হয়ে থাকে। প্রাক-চৈতন্যযুগে রচিত সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখ্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলি, তিনটি 'আদি মনসামঙ্গল কাব্য'। উত্তর-চৈতন্য যুগের সাহিত্যসম্ভারের মধ্যে রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের ধারা, কাশীদাসী মহাভারত, চৈতন্য – জীবনীসাহিত্য, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি, আরাকান রাজসভাশ্রিত কবিদের কাব্য, শাক্ত পদাবলি প্রভৃতি। পলাশির যুদ্ধ (১৭৫৭) বা ভারতচন্দ্রের মৃত্যু (১৭৬০) থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে যুগসন্ধিক্ষণ (মধ্য থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের) বলা হয়।

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে যে বাংলা সাহিত্যের সূচনা, তার প্রতিষ্ঠা পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি যে তখন মূলত রাজকীয় মর্যাদার উপর নির্ভরশীল থেকেছে, তা তোমরা ইতিমধ্যেই জেনেছ। বাংলা ভাষার জন্মমুহূর্তে তা পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। সেই সময়ে বাংলা ভাষায় গীতিকবিতার আকারে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের তথা সহজিয়াদের যে গানগুলি রচিত হয়েছিল, 'চর্যাগীতি' নামে পরিচিত সেই গানগুলিই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মসাধনার বিচারে চর্যাগীতি বাঙালি জাতি ও তার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পদ।

গৌড়বঙ্গে সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সেই গীতধারা এদেশে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক সেন রাজারা সংস্কৃতির বাহনরূপে সংস্কৃতকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ায় বাংলা ভাষা রাজদরবার থেকে নির্বাসিত হয়ে লোকজীবনকে আশ্রয় করেই আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। তোমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই

বিস্তৃতভাবে জেনেছ যে, সে ভাষায় সাহিত্য কিছু রচিত হলেও তা ছিল অনভিজাত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শ্রেণিহীন বৌদ্ধ, বর্ণহীন শৈব, অন্তঃপুরচারিণী এবং তথাকথিত শূদ্রেরাই ছিলেন তার ধারক ও বাহক। তাদের সাহিত্যের অধিকাংশই আবার লৌকিক ছিল বলেই, ছিল মৌখিকও। ছড়া, কথা, গানের আকারে সেই সাহিত্যের প্রচুর নিদর্শন এখনও বাংলার লোকসাহিত্যে প্রচলিত আছে। এই বিষয়টি তোমরা বইয়ের 'চতুর্থ অধ্যায়ে' বিস্তারিতভাবে জানবে।

দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এদেশে তুর্কি আক্রমণ শুরু হলে কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে। বর্ণভেদ, বংশ কৌলীন্যের ভেদ নানাবিধ সংস্কারে প্রায়-নিঃশেষিত প্রাণশক্তির হিন্দুরা লুণ্ঠন ও ধর্মান্তরিকরণের সেই সন্ত্রাসের সময়ে পুথি নিয়ে কেউ নেপাল-তিব্বতে আশ্রয় নিলেন, অনেকে রাজশক্তির অনুগ্রহভিক্ষার আকর্ষণে ধর্মান্তরিত হলেন। কেউ বা ওড়িশা ও মিথিলার কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়লেন। এই সময় বৌদ্ধদের সঙ্ঘারামও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মান্তরিত হয়ে শূদ্রদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন।

প্রায় দেড়শ বছর গৌড়বঙ্গ-বিজেতা সুলতানদের জীবনচিত্র দেখলে বোঝা যায় তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের প্রকৃত চেহারা। সেখানে শুধুই গৃহবিবাদ, ষড়যন্ত্র, পদচ্যুতি, হত্যা। তাই অশান্তি ও অরাজকতার এই ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়নি। দীর্ঘকালের বিপর্যয় ঘুচে গিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙালীর সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ লক্ষ করা গেল ভাষায়, গীতে ও পাঁচালী কাব্যে।

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ গৌড়বঙ্গে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করলে, তখন থেকেই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি নতুন পথ ধরে এগোনোর সুযোগ পায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইলিয়াস শাহী ধারার সাময়িক পতন ঘটে। হিন্দুরাজা দনুজমর্দনদেব আপন শক্তি ও প্রতিভাবলে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করলে তাঁরই আনুকূল্যে হিন্দুশাস্ত্র ও বাংলা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। তাঁর পুত্র যদু 'জালালুদ্দিন' নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেন এবং তাঁর পরে ইলিয়াস শাহী বংশই আবার গৌড়ের অধিকার লাভ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত (১৪৮৪) এই বংশই নানাদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে যান। এরপর কয়েক বছর হাবসী খোজাদের উত্থানে শান্তি বিঘ্নিত হয়। তারপর গৌড়ের সিংহাসনে বসেন সম্রাট হোসেন শাহ (১৪৯৩-৯৪)। হিন্দু কবিদের ভাষায় তিনি ছিলেন 'নৃপতিতিলক'। তাঁর সময় থেকেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এদেশে যে সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে, তাতে দুটি সংস্কৃতির অভূতপূর্ব সমন্বয় স্পষ্ট লক্ষ করা যায়—এক, লৌকিক সংস্কৃতি এবং দুই, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। বঙ্গদেশে লৌকিক সংস্কৃতির ধারাটিই প্রাচীনতর। এদেশে আর্য অধিকার বিস্তৃত হওয়ার আগে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ও মোঙ্গল গোষ্ঠীর জনতা বাস করতেন। ভারতীয় ধর্মসাধনায় যোগ ও তন্ত্রমতে সাধন এঁদেরই দান বলে অনুমান করা হয় ('প্রথম অধ্যায়' দ্রষ্টব্য)। ইহলোকের চেতনা ও সমৃদ্ধি এঁদের জীবনবোধের অঙ্গ ছিল। অলৌকিক সিদ্ধি অর্জন করা ছিল ধর্মসাধনের প্রধান লক্ষ্য। এঁরা তুকতাক মন্ত্র ও মুষ্টিযোগে বিশ্বাস করতেন। গাছে ও পাথরে দেবকল্পনাও এঁদের ধর্মবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য ছিল। এঁদের সাহিত্য মৌখিক সাহিত্য—যার পরিচয় বিধৃত রয়েছে এঁদের ছড়ায়, গানে, লোককথায়।

যখন এদেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটল, বেদ-পুরাণের সংস্কার হল, স্মৃতি-শাস্ত্রের বর্ণাশ্রম বিধান এল, এল সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য ধারা, তখন প্রাণধর্মে চঞ্চল লৌকিক সংস্কৃতি ধারার সঙ্গে সুউচ্চ দার্শনিকতা ও

সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির ব্রাহ্মণ্য আদর্শের সংঘাত তৈরি হল। যাতে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্রোত প্রাণধর্মকে ভাসিয়ে দিল। সমাজের উচ্চ মঞ্চে অভিজাত বর্ণ অধিষ্ঠিত রইলেন। নিম্নস্তরে রইলেন লৌকিক সংস্কার-বিশ্বাস নিয়ে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের দল। বাংলাদেশে দেখা যায়, সংস্কৃতির এই দুই ধারার মিশ্রণ সুপ্রাচীন কাল থেকেই ঘটে আসছে। সংস্কৃত পুরাণ স্মৃতির শাসন যেমন নিম্নস্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তেমনই 'শূদ্র' ও মহিলাদের মাধ্যমে লৌকিক সংস্কৃতি উচ্চস্তরের হিন্দুদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। বর্ণ হিন্দুদের প্রতিটি অনুষ্ঠানে 'স্ত্রী আচার' একটি অবশ্যপালনীয় বিশিষ্ট অঙ্গরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই স্ত্রী-আচারের ভিত্তি লৌকিক আচারবিচার। এই প্রসঙ্গে আর্যসমাজে কিছু লৌকিক দেবদেবীর অনুপ্রবেশও স্মরণীয়। বটগাছে কুবের-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান কল্পনা ও জাগরণ উৎসব দ্বারা 'কোজাগর' লক্ষ্মীর আরাধনা, 'দুর্গাপত্রী' (বিন্নী ধানের গাছ বা বেলপাতা) নিয়ে রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি উল্লেখ, দ্বাদশ শতাব্দীর কবি গোবর্ধন আচার্যের সংস্কৃত কাব্য 'আর্যাসপ্তশতী'তে পাওয়া যায়।

এই মিশ্রণের পথ আরও প্রশস্ত হল মুসলিম অভিযানের ফলে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন মঙ্গল দেবদেবীর মহিমা বিষয়ক কাব্যগুলি এই মুসলিম আক্রমণের ফলেই অঙ্কুরিত হয়। এই আক্রমণে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য জীবন ও লৌকিক জীবন সমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। সমাজের নেতৃত্ব থেকে অপসারিত বর্ণহিন্দুরা সংখ্যায় কম ছিলেন, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের অবতলবর্তী মানুষদের সঙ্গে নিয়ে ধর্ম বাঁচাতে ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তাঁদের পূজিত দেবদেবীদের সঙ্গে নিজেদের দেবদেবীর সমন্বয় ও সম্পর্ক গড়ে তুলতে তৎপর হলেন। এভাবেই মঙ্গলকাব্যের মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর প্রমুখ লৌকিক দেবতা উচ্চ হিন্দুস্তরে সম্মানের আসন লাভ করলেন।

মুসলিম বিজয়ের ফলে নানাভাবে সংস্কৃতির সমন্বয় ক্রমশ নিবিড় হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতানগণ এদেশের ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ থেকে রাজসভায় কবি-পণ্ডিতদের আহ্বান জানালেন। সংস্কৃতিবান, শিক্ষিত পণ্ডিতেরা রাজ-নির্দেশে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলা ভাষায় কাব্যাকারে অনুবাদ করলেন। এযাবৎকাল সংস্কৃত পাঠে যাদের অধিকার ছিল না, তারাও অনূদিত কাব্যপাঠের অধিকারী হয়ে উঠলেন। এইভাবেই বাংলা ভাষায় অনুবাদ সাহিত্যের গোড়াপত্তন হল এবং তাতে এসে মিশল পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে জনশ্রুতিমূলক লৌকিক আখ্যান, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-বিশ্বাসের সঙ্গে সমন্বিত হল লৌকিক সংস্কার-বিশ্বাস। আর এইভাবে সুলতানদের মধ্যস্থতায় বাংলার দুটি বিচ্ছিন্ন, আলাদা সংস্কৃতিধারা যেন একত্রিত হল। এই ভাব-সমন্বয়ের লক্ষণ যে কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দু ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়—হিন্দু-মুসলমান মিলনের ভিত্তিও এভাবে রচিত হয়েছে। মুসলিম সুলতানেরা হিন্দু কবিদের যেমন 'খান' উপাধিতে ভূষিত করেছেন (যশোরাজ খান, গুণরাজ খান); আবার হিন্দু কবিরাও সুলতানদের 'শ্রীযুক্ত' করে তুলেছেন ('শ্রীযুত হুসেন জগত ভূষণ')। সংস্কৃতির সমন্বয়ের দিক থেকে এসকল ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত, বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ কাব্য-শাখা সুলতানদেরই প্রেরণাসঞ্জাত। পরবর্তীকালে পির-ফকিরদের দ্বারা সুফিমত ও হিন্দুমতের যে মিলন ঘটেছিল, তারও মূলে ছিল সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলিম আমলেই মিথিলার সঙ্গে বাংলার যোগ নতুন করে স্থাপিত হয়েছে। মুসলিম লস্করদের মাধ্যমে আরাকানের সঙ্গে এদেশের সংস্কৃতিগত যোগসূত্র হয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে যেসব কাব্য-কবিতা রচিত হয়েছে, সেগুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এক---বৈষ্ণব গীতিকবিতা, দুই---কাহিনি সমন্বিত পাঁচালি কাব্য। পাঁচালি কাহিনিগুলির একভাগ

রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-পুরাণাদির অনুবাদ। অন্যভাগ, লৌকিক দেবদেবীর মহিমাজ্ঞাপক 'মঙ্গল-গীতি'। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে স্পষ্টত তিনটি শাখায় ভাগ করা যেতে পারে— (১) গীতিকবিতা বা পদাবলি, (২) অনুবাদ শাখা এবং (৩) মঙ্গলকাব্য শাখা।

এই সাহিত্যের সম্পূর্ণ আয়োজন কেবল ধর্মকে কেন্দ্র করে। অথচ তুর্কি অভিযানের আগে এদেশেই সংস্কৃত রসসাহিত্যের বিচিত্র কাব্যশাখার অনুশীলন হয়েছে—নাটক রচিত হয়েছে, মহাকাব্য রচিত হয়েছে, প্রেমাশ্রিত খণ্ডকাব্য রচিত হয়েছে। সেসব সাহিত্য ধর্ম-বহির্ভূত জীবনের স্বাদে পূর্ণ। অথচ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় যে কাব্যরচনার ধারা প্রবর্তিত হল, তাতে ধর্মই মুখ্য। ইংরেজ-অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত সাহিত্যের জগৎ এমনই ধর্মাশ্রিত থেকেছে। এই প্রথাবদ্ধ, সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই সাহিত্যে কোনো নতুনত্ব ছিল না। কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র, ভাষা, ছন্দ পর্যন্ত বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে রকমের ক্লান্তিকর, ক্লিশে হয়ে পড়েছিল। তবে এরই মধ্যে কোনো কোনো কবি নিজেদের মৌলিকতা প্রকাশ করেছেন, যার মাধ্যমে বাঙালির গীতিপ্রবণতা, গল্প শোনার আগ্রহ পরিতৃপ্ত হয়েছে। ধর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকেও কাব্যসাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতির কথা, জীবনের সুখ-দুঃখের কথা, সমাজের নিয়ম-নীতির কথা, এসেছে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গিমা—প্রবাদ প্রবচন, লোকশ্রুতি, ধাঁধা-প্রহেলিকা, রঙ্গ-রসিকতা। সমগ্র বাঙালি জীবনই প্রতিফলিত হয়েছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে।

তুর্কি আক্রমণ—সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিণাম :

আনুমানিক ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন বিন বখ্‌তিয়ার খিলজি বাংলাদেশের শাসক লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে নবদ্বীপ জয় করেন। সেনবংশকে গৌড়দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে খিলজি একে একে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গও অধিকার করেন। এভাবেই বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হল। ধ্বংস হল মন্দির, বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় নিদর্শন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, নথিপত্র, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি। চলল ব্যাপক হত্যা, ধর্মান্তরিকরণ। সমাজে তখন চরম নিরাপত্তাহীনতা। সমাজজীবনে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ভেদাভেদ কমে এল। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা গেল। সাংস্কৃতির প্রতিরোধ গড়ে উঠতে লাগল। অখণ্ড বাঙালিত্বের ধারণার বীজ বপিত হল। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে বসেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। তাঁর সুশাসনে আর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যে পুনরুজ্জীবন লক্ষ করা যায়। ক্রমশ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর্য-অনার্যের সমন্বয়, পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে লৌকিক কাহিনির সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যধারার বঙ্গানুবাদ শুরু হয়। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি রচনা শুরু হয়। বাইরের শক্তির আঘাতে বাঙালির জাতীয় জীবন তার নানা অসঙ্গতি, ভাঙন, ভেদাভেদ ভুলে সংহত শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন :

শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের অধিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘর থেকে বাংলায় লেখা রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক প্রথম আখ্যানকাব্যটির পুথি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে কাব্যটি তাঁরই সম্পাদনায় মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। কাব্যের প্রাপ্ত পুথিটিতে প্রথম ও শেষদিকের কিছু পৃষ্ঠা না পাওয়ার কারণে গ্রন্থনাম,

রচয়িতা বা রচনাকাল সম্পর্কে জরুরি কিছু তথ্য অজানা থেকে যায়। বস্তুত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি কাব্যের বিষয়বস্তু বিচার করে সম্পাদকেরই দেওয়া। প্রাপ্ত পুথির ভিতরে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামে একটি গ্রন্থের চিরকুট থাকায় কেউ কেউ মনে করেন পুথিটির নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায়, সম্পাদক প্রদত্ত নামেই এর পরিচিতি। মধ্যযুগের আদিপর্বের বাংলা ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত হয়ে থাকতে পারে বলে গবেষকেরা অনুমান করেন। সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ কবি বড়ু চণ্ডীদাস/অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস/চণ্ডীদাস ভাগবতাদি পুরাণ, জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে যেমন অকুণ্ঠ সাহায্য নিয়েছেন, তেমনি লোকজীবন-নির্ভর প্রচলিত কাহিনিরও সহায়তা নিয়েছেন। রাধা চরিত্রটির পরিকল্পনাতেও তিনি তাঁর দক্ষতার অনুপম সাক্ষ্য রেখেছেন। কাব্যে রাধা তাঁর পৌরাণিক পরিচয় তুলে ধরে বারংবার কৃষ্ণপ্রেম প্রত্যাখ্যান করেছেন। পরিশেষে আত্মসমর্পণ ও বিরাগের বিলুপ্তি, যথার্থ কৃষ্ণপ্রিয়া হয়ে ওঠা—এই সমগ্র বিষয়টিকে কবি সংলাপধর্মী নাটক, আখ্যানকাব্য ও গীতিকবিতার মিশেলে অপূর্ব সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন। পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলির রাধা চরিত্রের পূর্বাভাস তাঁর অঙ্কিত রাধা চরিত্রে লক্ষ করা যায়। সমগ্র কাব্যটি— জন্ম, তাম্বুল, দান, নৌকা, ভার, ছত্র, বৃন্দাবন, কালীয়দমন, যমুনা, হার, বাণ, বংশী ও রাধাবিরহ— এই তেরোটি খণ্ডে বিন্যস্ত। কৃষ্ণের জন্ম থেকে মথুরা প্রবাস পর্যন্ত কাহিনিধারা কাব্যটিতে বিধৃত হয়েছে। কাব্যের মূল চরিত্র তিনটি—কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়াই। কাব্যটি মূলত উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক। এছাড়া কাব্যে প্রচুর রাগরাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অলংকারশাস্ত্রানুসারী উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক প্রভৃতি অলংকার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত মেলে। বিভিন্ন গ্রামীণ সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতিরও পরিচয় কাব্যটিতে পাওয়া যায়।

অনুবাদ কাব্যধারা—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য :

সংস্কৃতে রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ মধ্যযুগের বাংলা কাব্যকে ক্লাসিক মহিমা এনে দিয়েছে। গুপ্তযুগ থেকেই বাংলাদেশের সমাজে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, পৌরাণিক সংস্কার সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে দৃঢ়মূল হয়েছে। বৌদ্ধ পালরাজাদের মধ্যে আর্যশাস্ত্র-সংহিতা, পুরাণ-মহাকাব্যের প্রতি আনুকূল্য লক্ষ করা যায়।

বাংলায় ইসলামি শাসন কায়েম হলে অনেক পাঠান সুলতান হিন্দু কবি-পণ্ডিতদের থেকে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের গল্প শুনতে আগ্রহী হন, অনুবাদ রচনায় তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেন। যেমন- রুক্নুদ্দিন বারবক্ শাহ্ মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনার জন্য 'গুণরাজখান' উপাধি দেন। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁ ও তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ তাঁদের হিন্দু সভাকবিদের দিয়ে মহাভারত অনুবাদ করিয়ে দেন। সাহিত্য-অনুবাদের এই ধারার মাধ্যমে সমাজে অসাম্প্রদায়িক ঔদার্যের ছবিই ফুটে ওঠে এবং তা সমাজ-সংস্কৃতির পুনর্গঠনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়।

বাংলা ভাষায় রামায়ণের প্রথম অনুবাদক **কৃত্তিবাস ওঝা**। আনুমানিক ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়ায় তাঁর জন্ম হয়। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' হিসেবে প্রচলিত, জনপ্রিয় গ্রন্থটি শ্রীরামপুরের খ্রিস্টীয় যাজকেরা প্রথম মুদ্রিত করেন (১৮০২-০৩)। পরে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বিতীয় সংস্করণে দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন (১৮৩০-৩৪)। তিনি সম্ভবত রাজা দনুজমর্দন কংস গণেশের (গৌড়) সভা অথবা তাহিরপুরের রাজা

কংস নারায়ণের সভা অলংকৃত করতেন। কৃত্তিবাস মূল রামায়ণের অনুবাদকালে তাকে 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে রচনা করেছেন এবং কাব্যকায়াকে আধুনিক করে গড়ে তুলেছেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীরাম পাঁচালি'। বহু শতাব্দীব্যাপী আপামর জনসাধারণের মধ্যে তাঁর কাব্যের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ রামায়ণের মূল চরিত্রগুলির মধ্যে বাঙালি স্বভাবের প্রক্ষেপণ, কাব্যে প্রতিফলিত বাংলার পরিবেশ ও প্রাত্যহিক জীবনচিত্র, ভক্তি ও করুণরসের সর্বজনগ্রাহ্যতা এবং সাধারণ মানুষের মননে সহায়ক পাঁচালির ঢঙ। গবেষকদের অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কবি তাঁর এই কাব্য রচনা করেছিলেন।

রামায়ণের অনুবাদের ধারা

- *পঞ্চদশ শতাব্দী* :

  কৃত্তিবাস ওঝা—শ্রীরাম পাঁচালি।

  মাধব কন্দলি —শ্রীরাম পাঁচালি।

- *ষোড়শ শতাব্দী* :

  শঙ্কর দেব—শ্রীরাম পাঁচালি (উত্তর কাণ্ড)।

- *সপ্তদশ শতাব্দী* :

  নিত্যানন্দ আচার্য—'অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ।

  রামশঙ্কর দত্ত—রাম কথা।

  'দ্বিজ' অথবা পতিত ভবানীনাথ—লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়।

  দ্বিজ শ্রীলক্ষ্মণ—অধ্যাত্ম রামায়ণ।

  চন্দ্রাবতী—রামায়ণ।

- *অষ্টাদশ শতাব্দী* :

  ফকির রাম 'কবিভূষণ'—অঙ্গদ রায়বার।

  রামচন্দ্র—বিভীষণের রায়বার।

  রামনারায়ণ—বিভীষণের রায়বার।

  কাশীরাম—কালনেমির রায়বার।

  দ্বিজ তুলসী—অঙ্গদ রায়বার।

  খোশাল শর্মা—অঙ্গদ রায়বার।

  জগন্নাথ দাস—লঙ্কাকাণ্ড।

  দ্বিজ দয়ারাম—তরনীসেনের যুদ্ধ।

  কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী—অধ্যাত্ম রামায়ণ।

  দ্বিজ শিবরাম—লক্ষ্মণ শক্তিশেল।

  উৎসবানন্দ—সীতার বনবাস।

  জগৎরাম রায়—অদ্ভুত রামায়ণ।

কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর রামায়ণের অনুবাদে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি অনেকাংশেই বাল্মীকির প্রদর্শিত পথে না গিয়ে নিজ কল্পনা অনুসারে চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বীরত্বের গরিমা প্রচার নয়, রাম চরিত্রের মাধুর্য বর্ণনাই তাঁর অন্বিষ্ট। তাঁর কাব্যের মূল সুর ভক্তি। বাঙালি হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনাদর্শ, কল্পনা, সমাজ-ভাবনা, জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বাঙালির নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মজীবনে তাঁর কাব্যের বিপুল প্রভাব লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে বহু কবির প্রক্ষেপ, লিপিকরদের হাতে পরিবর্তন তাঁর কাব্যের রূপটিকে যেমন বদলে দিয়েছে, বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও রামায়ণের অনুবাদে ব্যাপক বদল ঘটিয়েছে।

মহাভারত অনুবাদের ধারা

ষোড়শ শতাব্দী

'কবীন্দ্র' পরমেশ্বর দাস—পাণ্ডব বিজয়

শ্রীকর নন্দী—অশ্বমেধ কথা

রামচন্দ্র খান—অশ্বমেধ পর্ব

দ্বিজ রঘুনাথ—অশ্বমেধ পাঁচালি

অনিরুদ্ধ—ভারত পয়ার

রুদ্রদেব—আদিপর্ব

দ্বিজ বলরাম—বন পর্ব

বৈদ্য পঞ্চানন—কর্ণ পর্ব

রামনন্দন—শল্য পর্ব

দ্বিজ বৈদ্যনাথ—শান্তি পর্ব

সপ্তদশ শতাব্দী

কাশীরাম দাস—মহাভারত

নিত্যানন্দ ঘোষ—মহাভারত

কৃষ্ণানন্দ বসু—শান্তিপর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব

রামনারায়ণ দত্ত—দ্রোণ পর্ব

দ্বিজ হরিদাস—অশ্বমেধ পর্ব

ঘনশ্যাম দাস—অশ্বমেধ পর্ব

'সঞ্জয়'—মহাভারত

অষ্টাদশ শতাব্দী

দুর্লভ সিংহ—ভারত পাঁচালি

গোপীনাথ পাঠক—সভা পর্ব

সুবুদ্ধি রায়—অশ্বমেধ পর্ব

পুরুষোত্তম দাস—পাণ্ডব পাঁচালি

দ্বিজ রামলোচন—শ্রী পর্ব

দ্বৈপায়ন দাস—ভারত পাঁচালি

চৈতন্যোত্তর যুগের রামায়ণের মধ্যে 'অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ' উল্লেখযোগ্য। পাবনা জেলার অমৃতকুণ্ডা গ্রামে ১৭শ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত সাঁতোলের রাজা রামকৃষ্ণের সভাকবি নিত্যানন্দ আচার্যের এই রচনা উত্তরবঙ্গে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কবি 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' 'রঘুবংশম্' থেকে তাঁর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। ইনি ছাড়া আর যাঁরা বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— কৈলাস বসু, দ্বিজ ভবানীদাস, দ্বিজ শ্রীলক্ষ্মণ চক্রবর্তী, কবিচন্দ্র প্রমুখ।

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। কৃত্তিবাস ওঝা স্বয়ং লিখেছেন— 'লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত'। রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় অগণিত কবি মহাভারত রচনাতেও আত্মনিয়োগ করেন। কেউ কোনো বিশেষ পর্ব বা উপাখ্যান নিয়ে, কেউ বা সমগ্র মহাভারত কাব্যের অনুবাদ করেন। খ্রিস্টীয় আনুমানিক ষোড়শ শতকে বাংলায় মহাভারত রচনা শুরু হয়। বাংলায় সংস্কৃত মহাভারতের প্রথম কবি সম্ভবত পরমেশ্বর দাস, যিনি তাঁর কাব্যে 'কবীন্দ্র' উপাধি ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাব্যের নাম 'পাণ্ডববিজয় পাঞ্চালিকা'। বাংলার শাসনকর্তা হুসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁরই এক সেনাপতি, চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খানের আদেশে রচিত আঠারো পর্বে সমাপ্ত এই কাব্যটিকে 'পরাগলী মহাভারত' ও বলা হয়।

পরাগল খানের পর তাঁর পুত্র নসরৎ খান, যিনি ছুটি খান বা ছোটে খাঁ নামেই পরিচিত ছিলেন, চট্টগ্রামের শাসক হন। মহাভারত-কাহিনির প্রতি অনুরক্ত হয়ে তিনি তাঁর সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বিস্তৃত অনুবাদ করান, যার কাহিনি কবি প্রকৃতপক্ষে জৈমিনী সংহিতা থেকে গ্রহণ করেছেন।

ষোড়শ শতকে রামচন্দ্র খান নামে এক ভক্ত বৈষ্ণব কবিও জৈমিনী সংহিতা অবলম্বনে অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। এছাড়া এই শতকে পীতাম্বর দাস মহাভারতের নল-দময়ন্তী কাহিনি নিয়ে একটি পাঁচালি কাব্য রচনা করেন। কবি দ্বিজ রঘুনাথ 'অশ্বমেধ পাঁচালী' রচনা করেন। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভাই শুক্লধ্বজের প্রেরণায় কবি অনিরুদ্ধ 'ভারত-পাঁচালী' রচনা করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মহাভারতের মধ্যে নন্দরাম দাসের উদ্যোগ ও দ্রোণপর্ব, বিশারদ ভণিতাযুক্ত বন ও বিরাটপর্ব, নিত্যানন্দ ঘোষের 'ভারত-পাঁচালী', অনন্ত মিশ্রের 'অশ্বমেধ পর্ব', দ্বিজ হরিদাসের 'অশ্বমেধ পর্ব', দ্বিজ হরিদাসের 'অশ্বমেধ পর্ব', রামেশ্বর নন্দীর 'মহাভারতের আদিপর্ব'; শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ রচিত 'ভারত- পাঁচালী' উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত উল্লেখযোগ্য মহাভারত কাহিনির মধ্যে রয়েছে রাজীব সেনের 'উদ্যোগ পর্ব', দ্বিজ ঘনশ্যামের 'অশ্বমেধ পর্ব', দ্বিজ কৃষ্ণরাম, প্রেমানন্দের ভণিতায় 'অশ্বমেধ পর্ব', রাজেন্দ্রদাসের 'মহাভারত, আদিপর্ব' ইত্যাদি। কবিচন্দ্র, ষষ্ঠীবর সেন এবং গঙ্গাদাস সেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করেন।

বাংলা ভাষায় মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক **কাশীরাম দাস** আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। পিতা কমলাকান্ত দাস। বর্ধমানের কাটোয়া অঞ্চলের সিঙ্গিগ্রাম অথবা দাইহাটের নিকটবর্তী সিঙ্গিগ্রাম অঞ্চলে সম্ভবত তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল। তিনি মহাভারতের কটি পর্ব অনুবাদ করেছিলেন, তা ঠিক জানা না গেলেও, তাঁর মহাভারতের প্রথম চার পর্ব (১৮০১-০৩) শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই প্রেস থেকেই সম্পূর্ণ অংশ জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক কাশীদাসী মহাভারতের মুদ্রণ, প্রকাশ ও প্রচার এর জনপ্রিয়তার সহায়ক হয়েছিল। মধুর শব্দ, অলঙ্কার, উপমা, ছন্দ ব্যবহারে নিপুণ কবি কাশীরাম দাস পুরাণ কাহিনি, পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব এবং বাঙালি চরিত্র ও সংস্কৃতির নিবিড় জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। মেদিনীপুরের আবাসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থেকে শিক্ষকতা জীবন অতিবাহিত করার সুবাদে রাজবাড়িতে আসা পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত ও কথকদের মুখে মহাভারত কথা শুনে তিনি তা অনুবাদে উৎসুক হয়ে পড়েন। সমগ্র কাব্যটি তাঁর নামে চললেও আদি, সভা, বন পর্বের পর বিরাট পর্বে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই তিনি লোকান্তরিত হন। ভারত পাঁচালি কাব্যের কবিরূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর নামে রচিত 'সত্যনারায়ণের পুঁথি', 'স্বপ্নপর্ব', 'জলপর্ব' ও 'নীলোপাখ্যান' প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর কাব্যটি রচিত হয়েছিল। মূল মহাভারতের ভাবানুবাদ করতে গিয়ে কবি বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে নিজের কল্পনাকেও যুক্ত করেছেন। তিনি নাটকীয় ঘটনাবিন্যাসের জাল বুনে কাব্যের চরিত্রগুলির উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচনারীতি সরল, সহজ, প্রাঞ্জল, রসপ্রদীপ্ত। চরিত্রচিত্রণে বাঙালিয়ানার পরিচয়ে কবি যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। বাঙালির সামাজিক, পারিবারিক আদর্শ, ধর্মবোধ, নৈতিকতা—এসবই ছিল তাঁর কাব্যের রসদ। তাই বাঙালির কাছে তাঁর কাব্যের চিরকালীন সমাদর।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ' সাধারণভাবে 'ভাগবত' নামে পরিচিত। বেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম এবং তাঁর ব্রহ্মসূত্রের বারোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত অকৃত্রিম ভাষ্য হল 'ভাগবত'। এর বিষয়বস্তু হল শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথা। বাংলায় ভাগবতচর্চার শুরু চৈতন্য-পূর্ব যুগে হলেও এর বিস্তার ঘটেছে চৈতন্য পরবর্তী যুগে। সংস্কৃত ভাগবত পুরাণ অবলম্বনে বাংলায় প্রথম কাব্য রচনা করেন বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রাম নিবাসী মালাধর বসু বা গুণরাজ খান। তিনি চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি ছিলেন। তাঁর কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

কাব্যটি ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দ অবলম্বনে কবি তাঁর কাব্যটি রচনা করেছেন এবং তত্ত্বগত জটিলতার পরিবর্তে কাহিনির প্রতি বেশি আলোকপাত করেছেন।

শ্রীচৈতন্য যে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থটি পাঠ করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (২।১৫)। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের নাম-উল্লেখ পাওয়া যায়। এটিই সন-তারিখযুক্ত প্রথম বাংলা কাব্য। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, বৈষ্ণবীয় তন্ত্র গ্রন্থের অনুসরণে কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কবিত্বের সঙ্গে ভক্তিপ্রাণতার মিশেল ও ঐশ্বর্যভাবের সঙ্গে মধুর কান্তাভাবের সমন্বয় শ্রী চৈতন্যও আস্বাদন করেন। রাধাভাবের উন্মেষ তাঁর কাব্যেই প্রথম লক্ষ করা যায়, যা বৈষ্ণব পদাবলির পূর্বাভাসকে সূচিত করেছে। কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবের চেয়ে মধুর ও কান্তা ভাবটিই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। অনূদিত গ্রন্থ হলেও প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তিনি আপন কবিত্বশক্তিকে উজাড় করে দিয়েছেন।

ভাগবত অনুবাদের ধারা

● *পঞ্চদশ শতাব্দী* : মালাধর বসু—শ্রীকৃষ্ণবিজয়। যশোরাজ খান—কৃষ্ণমঙ্গল। ● *ষোড়শ শতাব্দী* : গোবিন্দ আচার্য—কৃষ্ণমঙ্গল। পরমানন্দ গুপ্ত—কৃষ্ণলীলা। রঘুপণ্ডিত—কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী। দ্বিজ মাধব—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। 'দুঃখী' শ্যামাদাস—গোবিন্দমঙ্গল। কবিশেখর—গোপালবিজয়। কৃষ্ণদাস—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। ● *সপ্তদশ শতাব্দী* : শ্রীকৃষ্ণকিংকর—শ্রীকৃষ্ণবিলাস। যশশ্চন্দ্র—গোবিন্দবিলাস। ভবানন্দ—হরিবংশ। ● *অষ্টাদশ শতাব্দী* : অভিরাম দাস—কৃষ্ণমঙ্গল। বলরাম দাস—কৃষ্ণলীলামৃত। দ্বিজ রমানাথ—শ্রীকৃষ্ণবিজয়। শঙ্কর চক্রবর্তী—গোবিন্দমঙ্গল। দ্বিজ মাধবেন্দ্র—ভাগবতসার। ঘনশ্যাম দাস—শ্রীকৃষ্ণবিলাস। দ্বিজ রামেশ্বর—গোবিন্দমঙ্গল। দ্বিজ প্রভুরাম—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। নন্দরাম ঘোষ—শ্রীকৃষ্ণবিজয়। দ্বিজ লক্ষ্মীনাথ—কৃষ্ণমঙ্গল। ভক্তরাম দাস—গোকুলমঙ্গল। পরাণ দাস—রসমাধুরী।

কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য ধারা : শ্রীমদ্ভাগবতের ভাব উৎসারিত আরেকটি বিশিষ্ট কাব্যশাখা হলো 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। পঞ্চদশ শতকে মালাধর বসুর কাব্য রচিত হওয়ার পর ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চলে এই ধারা।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগে শাক্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করে এক শ্রেণির আখ্যায়িকা কাব্য লিখিত হয়েছিল, যেগুলি 'মঙ্গল গান' নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন ধর্ম ও উপধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব-প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কবিরা দেবতার যে প্রশস্তিগান রচনা করেছেন সেগুলিই কালক্রমে 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত হয়। 'মঙ্গল' শব্দটি মাহাত্ম্য প্রচারমূলক যে কোনো রচনা বোঝাতে ব্যবহৃত হত, তা সে চরিতসাহিত্যের ক্ষেত্রে, পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক সংস্কৃত পুরাণের অনুবাদের ক্ষেত্রে, এমনকি তীর্থ মাহাত্ম্যসূচক রচনার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে মঙ্গলগান রচিত হয়ে আসলেও ব্যাপক প্রচারের কারণে সেই সময়ের ভাষাছাঁদ পরবর্তীকালে লিপিকরদের হাতে অনেকটাই আর মূলানুগ থাকেনি।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে সমন্বয় লক্ষ করা গেছে, মঙ্গলকাব্যে কোনো একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তে, তারই পরিচয় মেলে। এই গানগুলি দেবদেবীর পূজা বা উৎসব উপলক্ষ্যে পরপর কয়েকদিন ধরে একটানা সুর-তাল সহযোগে গাওয়া হত। মানুষ বিশ্বাস করত এ গান শুনলে মঙ্গল হয়। এক মঙ্গলবার থেকে পরের মঙ্গলবার পর্যন্তগানগুলি গীত হবার রেওয়াজ ছিল। বাংলার সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস গানগুলিতে বিধৃত রয়েছে। কখনো লৌকিক, কখনো বা পৌরাণিক দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনের কাহিনিতে মানুষও উপেক্ষিত থাকেনি।

ষোড়শ শতাব্দীর ভাগবত অনুসারী কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য

যশোরাজ খান---কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দ আচার্য---কৃষ্ণমঙ্গল, পরমানন্দ গুপ্ত---কৃষ্ণস্তবাবলী রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্য---শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী, দ্বিজ মাধব আচার্য---কৃষ্ণমঙ্গল, কবিশেখর রায়---গোপালবিজয়, দুঃখী শ্যামদাস—গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণদাস—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস—শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ভবানন্দ—হরিবংশ, পরশুরাম চক্রবর্তী—কৃষ্ণমঙ্গল, ঘনশ্যাম---হরিবংশ/ব্রহ্মবৈবর্ত, ভাগবৎ কৃষ্ণকীর্তন, যশশ্চন্দ্র---গোবিন্দবিলাস, ঘনশ্যাম দাস---শ্রীকৃষ্ণবিলাস, বলরাম দাস---কৃষ্ণলীলামৃত, দ্বিজ রমানাথ---শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র---গোবিন্দমঙ্গল/ভাগবতামৃত, দ্বিজ মাধবেন্দ্র—ভাগবতাসার, দ্বিজ রামেশ্বর—গোবিন্দমঙ্গল, দ্বিজ প্রভুরাম—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য

সনাতন বিদ্যাবাগীশ—ভাষাভাগবত, কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণমঙ্গল, কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস—শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ঘনশ্যামদাস—কৃষ্ণবিলাস, দ্বিজ ঘনশ্যাম—হরিবংশ, বংশীদাস—কৃষ্ণকেলিচরিতামৃত, অভিরাম দাস—গোবিন্দবিজয়, পরশুরাম চক্রবর্তী—কৃষ্ণমঙ্গল, যশশ্চন্দ্র—গোবিন্দবিলাস, পরশুরাম রায়—মাধব সঙ্গীত, ভবানন্দ—হরিবংশ, ভবানী দাস (ঘোষ)—রাধাকৃষ্ণবিলাস, নরহরি দাস—কেশবমঙ্গল, দ্বিজ নরহরি দাস—উদ্ধব সংবাদ, দ্বিজ গোবিন্দ—অক্রুর আগমন পালা, কবি বল্লভ—রসকদম্ব, যদুনন্দন দাস—কর্ণামৃত, গুরুচরণ দাস—প্রেমামৃত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী—ভাগবতামৃত গোবিন্দমঙ্গল, মহারাজা গোপাল সিংহ—রাধাকৃষ্ণমঙ্গল, দীন বলরাম দাস—কৃষ্ণলীলামৃত দ্বিজ রমানাথ—শ্রীকৃষ্ণবিজয়, দ্বিজ রামেশ্বর—গোবিন্দ বিজয়, রামেশ্বর দাস—শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, বনমালী দাস—গোবিন্দমঙ্গল, ভক্তরাম দাস—গোকুলমঙ্গল, নন্দরাম ঘোষ—তালভক্ষণ, দ্বিজ বৃন্দাবন—শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, পরাণ দাস—রসমাধুরী, কৃষ্ণরাম দত্ত—রাধিকামঙ্গল, দ্বিজ চণ্ডী—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, রসিক শেখর—পারিজাতহরণ, উদ্ধবানন্দ—রাধিকামঙ্গল, দীন হরিদাস—মুকুন্দ মঙ্গল, রামপ্রসাদ রায়---কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু, দীননাথ---শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা, জয়ানন্দ দাস---কৃষ্ণের জন্ম, দ্বিজ জয়নারায়ণ—শ্রীকৃষ্ণবিলাস, বাণীকণ্ঠ দ্বিজ—কৃষ্ণমঙ্গল, দামোদর দাস—কৃষ্ণমঙ্গল, রামকৃষ্ণ দিবজ—গোবিন্দমঙ্গল, দ্বিজ কবিরত্ন---শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, হরিবোল দাস---নৌকাখণ্ড, চন্দ্রশেখর---অক্রুরাগমন, হরিকৃষ্ণ দাস---অক্রুরাগমন, দ্বিজ সন্তোষ—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, বিশ্বনাথ ভট্টরায়—শ্রীকৃষ্ণলীলা। এছাড়া নন্দদুলাল দাসের নামে একটি পুথি পাওয়া যায়; অক্রুরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনোদ্যোগ পর্যন্ত কাহিনি বর্ণনার পর পুথিটি খণ্ডিত।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই মঙ্গলকাব্যগুলি রচনারীতি ও বিষয়বস্তুর পরিকল্পনার দিক থেকে নতুনত্ব হারিয়ে বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের নায়কই স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু, কোনো বিশেষ দেবতার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে মানবজন্ম লাভ করে। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের সূচনায় গণেশ প্রমুখ পঞ্চদেবতার বন্দনা, এরপর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণন, সৃষ্টিরহস্য কথন বাঁধাধরা রীতিতে পরিণত হয়। এছাড়া শিব প্রসঙ্গ (ধর্মমঙ্গলে শুধুমাত্র 'শিব' প্রসঙ্গের পরিবর্তে হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান), নায়িকার সারা বছরের দুঃখের কথা (বারমাস্যা) বর্ণনা, নারীদের পতিনিন্দা প্রসঙ্গ, চৌতিশা/বর্ণানুক্রমিক চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতার স্তব, পাক-প্রণালীর/রন্ধনকার্যের বিস্তৃত বর্ণনা, বিশ্বকর্মার শিল্পকীর্তির বর্ণনা, সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা, সদাগরদের উপকূল বাণিজ্যের প্রসঙ্গ, জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গ, প্রহেলিকা বা ধাঁধার উল্লেখ, যুদ্ধ বর্ণনা, দেবীর জরতী/বৃদ্ধার বেশ ধারণ করে নায়ক-নায়িকাকে ছলনা/রক্ষা করা প্রসঙ্গ, মশান বা শ্মশান বর্ণনা, নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনা, সাজ-সজ্জার বর্ণনা, নগরবর্ণনা, দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকে দেবতার পদতলে নতশীর্ষ করানো প্রসঙ্গ, দৈবকার্যে হনুমান ও বিশ্বকর্মার অবতারণা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, নানান কুসস্কার, ভক্ষ্য, ভোজ্য, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান প্রসঙ্গ ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই অনিবার্যভাবে এসেছে।

মঙ্গল গানগুলির মধ্যে সর্পদেবী মনসার মহিমা ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত মনসা-মঙ্গল কাব্যধারাই প্রাচীনতম বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। চৈতন্য-পূর্ব যুগের মনসামঙ্গলের কবি হিসেবে এই কাব্যধারার প্রাচীনতম কবি হরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই এবং নারায়ণ দেবের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যের মনসামঙ্গল কাব্যের প্রচলন যেমন প্রাচীন, তেমনই ব্যাপক। শতাধিক কবি চাঁদ সদাগর-বেহুলা-মনসার কাহিনি নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। এর সঙ্গে হরিবংশ ও ঊষা-অনিরুদ্ধের পৌরাণিক কাহিনি যুক্ত হয়েছে। চৈতন্য পরবর্তী যুগের মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাস, জীবন মৈত্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাব্যের নাম কোথাও 'পদ্মপুরাণ', কোথাও 'মনসার ভাসান' আবার কোথাও 'মনসার জাগরণ'। বাঙালির অনমনীয় পুরুষকার যে দৈবশক্তিকে প্রতিহত করতে পারে, তার আশ্চর্য কাহিনি মনসামঙ্গল কাব্যে স্থান পেয়েছে। মনসামঙ্গলের কবিদের রচনায় সূক্ষ্ম বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, লৌকিক সাহিত্যের বর্ণনার বিশিষ্টতা, হাস্যরস, ভৌগোলিক জ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান মূর্ত হয়ে উঠেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যধারা

হরিদত্ত—কালিকাপুরাণ, নারায়ণ দেব—পদ্মাপুরাণ, আনুমানিক পঞ্চাদশ শতাব্দী, বিজয়গুপ্ত—পদ্মাপুরাণ—পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দী, বিপ্রদাস---মনসামঙ্গল---পঞ্চদশ শতাব্দী, গঙ্গাদাস সেন---মনসামঙ্গল---ষোড়শ শতাব্দী, দ্বিজ বংশীদাস---পদ্মাপুরাণ---ষোড়শ শতাব্দী, কালিদাস---মনসামঙ্গল---সপ্তদশ শতাব্দী, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ---মনসামঙ্গল---সপ্তদশ শতাব্দী, তন্ত্রবিভূতি---মনসামঙ্গল---সপ্তদশ শতাব্দী, জগজ্জীবন ঘোষাল---মনসামঙ্গল---সপ্তদশ/অষ্টাদশ শতাব্দী (আনু.), ষষ্ঠীবর দত্ত---পদ্মাপুরাণ---অজ্ঞাত রামজীবন—মনসামঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, জীবন মৈত্র—মনসামঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, দ্বিজ রসিক—মনসামঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, বিষ্ণু পাল—মনসামঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, বাণেশ্বর রায়—মনসামঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী।

মনসা মঙ্গলের পরেই চণ্ডীমঙ্গলের কথা উল্লেখযোগ্য। দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক এই কাব্যধারার আদি কবি মানিক দত্ত খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। **কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী** লিখেছেন—'মানিক দত্তেরে আমি করিলুঁ এ বিনয়/যাহা হৈতে হৈল গীত পথ-পরিচয়'। অনুমিত হয় যে, তিনি মালদহ অঞ্চলের কবি। তাঁরই রচনাধারা অনুসরণ করে এই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর আত্মপ্রকাশ। তাঁর আদি বসতি ছিল বর্ধমান জেলার রায়না থানার অধীন দামুন্যা গ্রামে। পিতা হৃদয় মিশ্র, মা দৈবকী। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে তিনি বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামে আসেন এবং সেখানকার ভূস্বামীর আশ্রয়ে থেকে স্বপ্নাদিষ্ট কবি তাঁর কাব্য রচনা করেন। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, মানসিংহ যখন বাংলার সুবেদার, তখন তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যকে তিনি 'অভয়া-মঙ্গল', 'চণ্ডিকামঙ্গল', 'অম্বিকামঙ্গল' প্রভৃতি নামে পরিচায়িত করেছেন। তাঁর রচনায় বাস্তবনির্ভর কাহিনিবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি, কৌতুকরস সৃষ্টির নৈপুণ্য লক্ষ করা যায়। তাঁর কাব্যে সর্বপ্রথম ঔপন্যাসিক গুণ লক্ষ করা যায়। কাব্যধারার পূর্বতন কবির প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করলেও তাঁর আপন প্রতিভার সাক্ষ্য তিনি তাঁর রচনায় রেখেছেন। প্রথাগত, গণ্ডিবদ্ধ কাহিনি কলেবরের শৃঙ্খলে তাঁর কবিত্বের স্ফূরণ ক্ষুণ্ণ হয়নি। মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার ছন্দপ্রয়োগ এবং একপদী, ত্রিপদীর কাঠামো ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি রচনায় বৈচিত্র্য এনেছেন। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি অলংকারের প্রয়োগে, প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনকে কাব্যভাষায় সুষ্ঠু ও সাবলীল ব্যবহারে তিনি উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখেন।

চণ্ডীমঙ্গলের আরেকজন কবি দ্বিজমাধব মুকুন্দের পূর্ববর্তী কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অপর নাম মাধবানন্দ। তাঁর গ্রন্থ 'সারদা চরিত' নামে পরিচিত। গ্রন্থটি আনুমানিক ১৫৭৯খ্রি:-১৬৪৪ খ্রি: র মধ্যে রচিত হয়েছিল। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায় 'আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টির এমন মৌলিক প্রয়াস তাঁহার পূর্বে আর খুব বেশি কবি দেখাইতে পারেন নাই।' তাঁর পুথি কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গ, বিশেষত, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রাম থেকে চলে গিয়ে সম্ভবত তিনি পূর্ববঙ্গে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর রচনা অনুসরণে চণ্ডীমঙ্গলের একটি নির্দিষ্ট ধারার সৃষ্টি হয়েছিল।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারা

ষোড়শ শতাব্দী :

মানিক দত্ত—চণ্ডীমঙ্গল,

দ্বিজমাধব—মঙ্গলচণ্ডীর গীত,

মুকুন্দ চক্রবর্তী—কবিকঙ্কণ চণ্ডী,

সপ্তদশ শতাব্দী :

দ্বিজ রামদেব—অভয়ামঙ্গল,

অষ্টাদশ শতাব্দী

মুক্তারাম সেন—সারদামঙ্গল,

হরিরাম—চণ্ডীমঙ্গল

ভারতচন্দ্র রায়—অন্নদামঙ্গল,

জয়নারায়ণ সেন—চণ্ডীমঙ্গল,

ভবানীশঙ্কর—মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা,

আকিঞ্চন চক্রবর্তী—চণ্ডীমঙ্গল

এছাড়াও দ্বিজ বলরাম, দ্বিজ জনার্দন, মুক্তারাম সেন, রামানন্দ যতির লেখা চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালি রচনা এবং মুকুন্দ মিশ্রের বাসুলীমঙ্গল ও রাধাকৃষ্ণ দাসের গোসানীমঙ্গল উল্লেখযোগ্য।

চণ্ডীমঙ্গলে দুটি খণ্ড/কাহিনি লক্ষ করা যায়। আখেটিক খণ্ড এবং বণিক খণ্ড। আখেটিক খণ্ডের নায়ক ব্যাধ কালকেতু, বণিক খণ্ডের নায়ক ধনপতি সদাগর। দুটি কাহিনির সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। উভয়খণ্ডেই দেবী চণ্ডীর মহিমা কীর্তিত হলেও তাঁর স্বরূপ এই দুই কাব্য খণ্ডে আলাদা। প্রথম খণ্ডে তিনি পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দ্বিতীয়টিতে হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার দেবতা।

মঙ্গলকাব্যের আরেকটি প্রধান শাখা ধর্মমঙ্গল। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তন করে এই কাব্যধারা গড়ে উঠেছে। আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই ধারার আদি কবি ময়ূরভট্ট বর্তমান ছিলেন। তাঁর কাব্যের নাম ছিল 'হাকন্দ পুরাণ'। তাঁর কাব্যটি পাওয়া না গেলেও ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী এই নামেই তাঁর কাব্যের উল্লেখ করেছেন। এই কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, এটি শুধু রাঢ় অঞ্চলেই রচিত হয়েছিল। তখন রাঢ় বলতে বোঝাত পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর এবং পশ্চিমে ছোটোনাগপুর পার্বত্যভূমি-বেষ্টিত ভূ-ভাগকে। অর্থাৎ বর্তমান বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চল। এই অঞ্চলের ধর্মমত, আচার পদ্ধতি, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাস ধর্মমঙ্গল কাব্যে ফুটে উঠেছে। ধর্মকে বুদ্ধ, কচ্ছপ, যম, সূর্য, বিষ্ণু, বরুণ ইত্যাদি নানারূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শুধু ডোম জাতির লোকেদেরই এই দেবতার পূজায় পৌরোহিত্য করার অধিকার রয়েছে। ধর্ম মূলত আদিবাসীদের সূর্যদেবতা। ডোম জাতি প্রাচীন আদিবাসী জাতিসম্ভূত। পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ তারা হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে উঠে ধর্মঠাকুরের পূজার অধিকার রক্ষা করে আসছে। মঙ্গলকাব্য রচনার যুগে সর্বস্তরের সমাজের দ্বারা ধর্মঠাকুরের প্রভাবকে স্বীকার করার ফলে উচ্চবর্ণের কবিরাও তাঁর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য রচনা করেছেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা

ময়ূরভট্ট---কাব্যনাম ও আবির্ভাবকালে অজ্ঞাত, আদিরূপরাম---কাব্যনাম ও আবির্ভাবকাল অজ্ঞাত, খেলারাম—ধর্মমঙ্গল—ষোড়শ শতাব্দী (আনুমানিক), মানিকরাম গাঙ্গুলী—ধর্মমঙ্গল—ষোড়শ শতাব্দী, রূপরাম—ধর্মমঙ্গল (অনিশ্চিত), শ্যাম পণ্ডিত—ধর্মমঙ্গল (ষোড়শ-সপ্তদশ, আনুমানিক), সীতারাম দাস—অনাদিমঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, রাজারাম দাস—ধর্মমঙ্গল—সপ্তদশ শতাব্দী, প্রভুরাম—ধর্মমঙ্গল—অজ্ঞাত, ঘনরাম—ধর্মমঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—ধর্মমঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, সহদেব চক্রবর্তী—ধর্মমঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, নরসিংহ বসু—ধর্মমঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, হৃদয়রাম সাউ—ধর্মমঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী।

এছাড়া গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ, রামকান্ত রায়, ধর্মদাস বৈদ্য, বিশ্বনাথ দাস প্রমুখ কবি এই কাব্যধারায় কাব্য রচনা করেছেন।

এছাড়াও, ধর্মমঙ্গল কাব্যের আরেকটি বিশিষ্টতা হল এই যে, এই কাব্যের একটি ক্ষীণ ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। গৌড়ের সম্রাট ধর্মপালের পুত্রের সঙ্গে অজয় নদের দক্ষিণ তীরবর্তী একটি পার্বত্য গড়ের অধিপতি ইছাই ঘোষের যুদ্ধবৃত্তান্ত এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। এই গড়ের নাম ঢেকুরগড়, পরে ইছাই ঘোষ যার নাম পরিবর্তন করে রাখেন ত্রিষষ্ঠী গড়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়কের নাম লাউসেন, ইনি গৌড়ের এক সামন্তরাজ কর্ণসেনের পুত্র, তাঁর রাজধানীর নাম ময়নানগর যা বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যগুলির উপর থেকে দেবদেবীর প্রতি ভক্তি দূর হয়ে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এই সময়ে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় তাঁর পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের বংশগৌরব প্রচার করার উদ্দেশ্যে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এই সময়ে বর্গির আক্রমণের বৃত্তান্ত অবলম্বন করে কবি গঙ্গারাম তাঁর 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' গ্রন্থ রচনা করেন।

ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০) হাওড়া জেলার ভুরশুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের ইনি শ্রেষ্ঠ কবি। সম্পত্তির বিবাদের কারণে তাঁকে স্বগৃহ পরিত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে থাকতে হয়। হুগলি জেলার দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে থাকার সময়ে

ইনি ফারসি ভাষা শিক্ষা করেন। পুরুষোত্তম ধামে বাস করার সময় কিছুদিন সন্ন্যাস জীবনস্থাপন করেন, কিন্তু পরে সংসারী হন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে সভাকবি নিযুক্ত করে কৃষ্ণনগরে নিয়ে আসেন এবং তাঁরই আদেশে তিনি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন ও 'রায়গুণাকর' উপাধি পান। মহারাজের কুলদেবতা অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কাব্যই 'অন্নদামঙ্গল'। কাব্যের তিনটি অংশ, প্রথমাংশে হরিহোড়ের কাহিনি, দ্বিতীয়াংশে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি এবং তৃতীয়াংশে মানসিংহের কাহিনি। তিনি তাঁর কাব্যে অন্তর্মুখী ভাব-গভীরতার বদলে বহির্মুখী শব্দবিন্যাস-নৈপুণ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে সমসাময়িক সমাজের রুচির প্রতিফলন সার্থকভাবে ঘটেছে। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে—'বিদ্যাসুন্দর', 'রসমঞ্জরী', 'সত্যপীরের কথা', 'নাগাষ্টক' প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবির সম্মান তাঁর প্রাপ্য। ভাষার লালিত্যে, ছন্দ-অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্যে ও চরিত্রচিত্রণের দক্ষতায় তিনি বাংলা কাব্যে নতুন সুষমার প্রবর্তক ছিলেন।

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য :

অষ্টাদশ শতকের সৃষ্টি 'কালিকামঙ্গল' কাব্যধারায় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেরই অনুকরণ লক্ষ করা যায়। দেবী কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক এই কাব্যধারায় বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়জ আকর্ষণের ও পরিণতির কাহিনি রূপলাভ করেছে। আধুনিক সময়ে রচিত হওয়ায় কাব্যে যেমন নাগরিকতার স্পর্শ এসেছে, দেবমহিমাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে, অন্তরের আবেগধর্ম ছেড়ে কবিরা বাইরের অলংকরণেই যত্নশীল থেকেছেন। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান মূলত উত্তর-পশ্চিম ভারতের কাহিনি। কাশ্মীরের কবি বিহ্লনের লেখা সংস্কৃত খণ্ডকাব্য 'চৌর-পঞ্চাশিকা'র আদর্শে কাব্যটি রচিত। তবে বিদ্যাসুন্দর কাহিনিতে যে ধর্মীয় প্রসঙ্গ রয়েছে, তা 'চৌর-পঞ্চাশিকা'য় নেই। বাংলায় ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিদ্যাসুন্দর কাহিনি রচনার সূত্রপাত হয়। এই পাঁচালি রচনার প্রথম কবি দ্বিজ শ্রীধর। সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণরাম দাস, প্রাণরাম কবিবল্লভ, সাবিরিদ খান এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি কঙ্ক, বলরাম চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র, রাধাকান্ত মিশ্র, রামপ্রসাদ প্রমুখ বিদ্যাসুন্দর কাহিনি রচনা করেছেন। কবি ভারতচন্দ্র রায় বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'অন্নদামঙ্গল'। কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—'অন্নপূর্ণা মঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'মানসিংহ'। দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক এই কাহিনিতে সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। অন্নপূর্ণা লৌকিক চণ্ডী, পুরাণবর্ণিত চণ্ডীর প্রভাবে মধ্যযুগের শেষভাগে অন্নদায় পরিণত হয়েছেন এবং নিষ্ঠুর শক্তিদেবী থেকে শুভঙ্করী হয়ে উঠেছেন। দেবীমহিমা বর্ণনার পাশাপাশি কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তি বর্ণনা ও কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রশস্তি রচনা করেছেন। এরই পাশাপশি নবাব আলীবর্দী খাঁর শাসনকালে দেশে বর্গির হাঙ্গামা, বিদেশি বণিকদের চক্রান্ত, সমাজের স্বার্থপরতা, দুর্নীতি প্রভৃতি ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা নানা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন। ভারতচন্দ্রের পর খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে যে কয়েকটি 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচিত হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাধাকান্ত মিশ্রের 'কালিকামঙ্গল', রামপ্রসাদ সেনের 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' এবং কবীন্দ্র চক্রবর্তীর 'কালিকামঙ্গল'।

কালিকামঙ্গল

কঙ্ক — পীরের পাঁচালি (ষোড়শ শতাব্দী), শ্রীধর — বিদ্যাসুন্দর—(ষোড়শ শতাব্দী), শা'বিরিদ খান—কালিকামঙ্গল (ষোড়শ শতাব্দী), গোবিন্দ দাস—কালিকামঙ্গল (ষোড়শ শতাব্দী), কৃষ্ণরাম দাস—কালিকামঙ্গল (সপ্তদশ শতাব্দী), প্রাণরাম চক্রবর্তী—কালিকামঙ্গল (সপ্তদশ শতাব্দী), বলরাম চক্রবর্তী—কালিকামঙ্গল (সপ্তদশ শতাব্দী), রামপ্রসাদ সেন—বিদ্যাসুন্দর (অষ্টাদশ শতাব্দী), ভারতচন্দ্র রায়—বিদ্যাসুন্দর (অষ্টাদশ শতাব্দী), নিধিরাম আচার্য—কালিকামঙ্গল (অষ্টাদশ শতাব্দী)। এই ধারায় দ্বিজরাজধাকান্ত, কবীন্দ্র প্রমুখ কবিও কাব্য রচনা করেছেন।

বিবিধ দেবদেবী মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য :

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল বাংলার প্রধান মঙ্গলকাব্য। কিন্তু এছাড়াও, বাংলায় আরো অসংখ্য মঙ্গলকাব্য রচিত হয়, যাদের মধ্যে লৌকিক ও স্থানীয়-দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে রচিত মঙ্গলকাব্য যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে বেশ কিছু পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যও। এই ধারার মধ্যে রয়েছে—শীতলামঙ্গল, বাসুলিমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি ব্রতকথা বা পাঁচালি জাতীয় রচনা।

● শীতলা মঙ্গল—নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, বল্লভ, মানিকরাম গাঙ্গুলী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, শঙ্কর। ● ষষ্ঠীমঙ্গল—কৃষ্ণরাম দাস, রুদ্ররাম চক্রবর্তী, শঙ্কর। ● রায়মঙ্গল—মাধব আচার্য, কৃষ্ণরাম দাস, রুদ্রদেব। ● সারদামঙ্গল—দয়ারাম দাস। ● সূর্যমঙ্গল—রামজীবন (আদিত্যচরিত) মালাধর বসু (অষ্টলোকপাল কথা), দ্বিজ কালিদাস (সূর্যের পাঁচালি)। ● গঙ্গামঙ্গল—মাধবাচার্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ, জয়রাম, দ্বিজ কমলাকান্ত, দুর্গাপ্রসাদ মুখুটি, প্রাণবল্লভ, অকিঞ্চন চক্রবর্তী। ● পঞ্চাননমঙ্গল—দ্বিজ রঘুনন্দন। ● সুবচনীমঙ্গল—দ্বিজ মাধব, দ্বিজ রামজীবন, মাধব দাস। ● তীর্থমঙ্গল—বিজয়রাম সেন।

অন্যান্য দেবীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে রয়েছে লক্ষ্মীমঙ্গল (কবি শিবানন্দ কর) কপিলা-মঙ্গল, বরদামঙ্গল (কবি নন্দকিশোর), কামাখ্যামঙ্গল প্রভৃতি।

নীচে অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন শাখা ও তাদের প্রধান কবিদের নাম দেওয়া হল :

শিবায়ন :

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শিবের গীত মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সমাজের তথাকথিত নিম্নতম স্তরে আবদ্ধ এই গানগুলি লৌকিক শিবের গৃহস্থালির কাহিনি নিয়ে রচিত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যেও শিব-পার্বতীর সংসার জীবনের কথা রয়েছে। শূন্যপুরাণেও শিব-প্রসঙ্গ রয়েছে। শিবায়নের উদ্দেশ্য শিবমঙ্গল গান, শিবের মহিমা বর্ণনা করা। পৌরাণিক মহিমাবর্জিত শিব এখানে কৃষক রূপে চিত্রিত। তিনি কখনো বা দোষ-গুণে গড়া শাঁখারির ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রকৃতপক্ষে পুরাণ-বহির্ভূত যেসকল শিব-কাহিনি বহুকাল থেকে এদেশের সমাজে প্রচলিত ছিল, শিবমঙ্গল কাব্যে সেগুলিকেই বিষয় করে তোলা হয়েছে। শিবায়নের হরপার্বতীর পারিবারিক জীবনচিত্রে অভাব অনটন-ক্লিষ্ট দরিদ্র বাঙালির গার্হস্থ্যজীবনই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। সপ্তদশ শতক থেকে শিবের কাহিনি মঙ্গলকাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্যরূপে রচিত হতে থাকে। প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ শিবমঙ্গল কাব্য সম্ভবত রামকৃষ্ণ রায় রচিত 'শিব-মঙ্গল' কাব্য। এছাড়া এই কাব্যধারায় শঙ্কর কবিচন্দ্র, রামকৃষ্ণ দাস প্রমুখ কবির নাম পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কর্ণগড়ের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত শিবায়ন বা 'শিব সংকীর্তন' কাব্যটি শিবমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় রচিত কাব্যটিতে শিবকাহিনির পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের অসামান্য মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। আটপালার পাঁচালিকাব্য বা 'অষ্টমঙ্গলা' হলেও এতে পদ্মপুরাণ, ভাগবতের আখ্যায়িকার সংমিশ্রণ কবি ঘটিয়েছেন।

বাংলাদেশে মধ্যযুগে শিব-দুর্গাকে অবলম্বন করে কয়েকটি আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছিল। এগুলির সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের প্রচুর মিল লক্ষ করা যায়। শিবায়ন কাব্যগুলিতে পুরাণ ও গ্রাম্যকাহিনির সংমিশ্রণ ঘটলেও পৌরাণিক শিবচরিত্রের মহিমান্বিত রূপ প্রকাশিত হয়নি, কৃষক শিবের ঘর-গৃহস্থালির গল্পই এগুলির উপজীব্য। গ্রামজীবনে

কৃষিকাজের দেবতারূপেই এই শিব পূজিত হয়েছেন, যা একান্তভাবে অনার্য শিবসংস্কার প্রসূত। সংস্কৃতে রচিত নানান শিবপুরাণ, কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য থেকে কবিরা তাঁদের কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন, কাহিনি নির্মাণে পৌরাণিক ও লৌকিক ভাবের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শিবায়নের দু'জন কবি হলেন শঙ্কর কবিচন্দ্র এবং রামকৃষ্ণ রায়। বিষ্ণুপুর নিবাসী শঙ্কর কবিচন্দ্রের শিবায়নের পূর্ণাঙ্গ পুথি পাওয়া না গেলেও 'শঙ্খপরা' ও 'মাছধরা' শীর্ষক দুটি পালা পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর রচনা বাস্তবধর্মী, চিত্তাকর্ষক।

হাওড়া জেলার আমতার কাছে রসপুর গ্রামের রামকৃষ্ণ রায় নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর 'শিবমঙ্গল' কাব্যে কবি কাশীখণ্ড, হরিবংশ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, মহাভারত, স্কন্দপুরাণের সাহায্য নিয়েছেন, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এর দ্বারা ও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ কাব্যটি ছাব্বিশটি পালায় বিভক্ত। তাঁর এই কাব্যে লৌকিক শিবের বর্ণনার স্থান অত্যন্ত সীমিত। তাঁর কাব্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে এখানে একাধিক স্থানে গদ্য-দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

মৃগলুব্ধ : শিবমহিমা বিষয়ক কাহিনির একটি উপধারা 'মৃগলুব্ধ' নামে পরিচিত। একদা শৈবতীর্থ চট্টগ্রামে 'মৃগলুব্ধ' নামে শিবমহিমা বিষয়ক কয়েকটি পৌরাণিক ধরনের পুথিপুত্র মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের প্রচেষ্টায় পাওয়া গেছে। কী করে একজন ব্যাধ শিবকৃপায় উদ্ধার পেল এবং রাজা মুচকুন্দ এবং তাঁর রানি শিব-চতুর্দশীর ব্রত উপলক্ষ্যে শিবমাহাত্ম্য শুনে সশরীরে স্বর্গে গেলেন 'মৃগলুব্ধে' সেই কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে। কাহিনিকার হিসাবে রামরাজা ও রতিদেবের নাম জানা যায়।

বৈষ্ণব পদাবলি :

খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন, 'নিভৃত গিরি-কন্দরে বারিরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে, একদিন সেই পাষাণ বেষ্টনী ভেদ করিয়া বারিরাশি নিম্ন অভিমুখে ছুটিয়া চলে অমৃতপ্রপাত রূপে। সেইরূপে ভাগবতের অপূর্ব কাব্যরস লৌকিক ভাষায় নামিয়া আসিল প্রথম বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলিতে। ভাব যেমন প্রবল, প্রতিভাও তেমনি প্রদীপ্ত। এইরূপ শুভযোগেই বৈষ্ণব পদাবলির জয়যাত্রা শুরু হইয়াছিল।' প্রবাদেই রয়েছে 'কানু বিনে গীত নাই'। 'বৈষ্ণব অর্থে বিষ্ণু সম্বন্ধীয়' বোঝালেও, বৈষ্ণব পদাবলি-সাহিত্যে পৌরাণিক বিষ্ণুর কথা নয়, কৃষ্ণলীলা তথা রাধা-কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ পৌরাণিক দেবতা হলেও প্রাচীন কোনো পুরাণে রাধার উল্লেখ নেই। 'গাথাসপ্তশতী'তে আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের আগে রচিত অপভ্রংশ-প্রাকৃত ভাষার একটি রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদের উপস্থিতি দেখে পণ্ডিতদের অনুমান, সেন-আমলের লোক-বাংলাতেই রাধা-প্রেমকথার প্রথম উদ্ভব ঘটেছিল। প্রাকৃত প্রেমকে বৈষ্ণব কবিরা সহজেই আধ্যাত্মিকতার স্তরে উপনীত করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ থেকেই বৈষ্ণব পদাবলির ধারা শুরু হয়। সেই সময় থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অগণিত বৈষ্ণব কবির রচনায় বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে, বৈষ্ণব পদাবলি হয়ে উঠেছে বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সূত্রেই কবিরা রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন। চৈতন্যপূর্বযুগের পদসাহিত্যে বৈষ্ণবচেতনা অপ্রতুল হলেও তাঁর পরবর্তীকালে এক বিশিষ্ট ধর্মীয় চেতনার সুষ্ঠু প্রকাশই পদাবলির মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'ভক্তিরসামৃত', 'উদ্ধবসন্দেশ', 'শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত', 'গোবিন্দলীলামৃত', 'বিদগ্ধমাধব, জগন্নাথবল্লভ' প্রভৃতি গ্রন্থের ভাবধারা, ঘটনাবিন্যাস চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের রচনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

প্রথাগত এই সংস্কারের মধ্যে পদগুলি রচিত হলেও বৈষ্ণব ধর্মের উপাসনা প্রেমধর্মেরই উপাসনা, যা মানুষে মানুষে পার্থক্যকে স্বীকার করে না, শত্রু-মিত্র ভেদ মানে না; তাই এর আবেদনও সর্বজনীন।

পদাবলির চণ্ডীদাস :

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস নামে অজস্র কবির নাম পাওয়া যায়। কবি-সাধক চণ্ডীদাস তাঁর পদাবলিতে সহজ সুরে ভাব-গভীর কথা শুনিয়েছেন। তাঁর কোনো পদই সুস্পষ্টভাবে কোনো রসপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁর রচিত পূর্বরাগের পদে আত্মনিবেদনের সুর কিংবা বিরহের স্তরে বিরহোত্তীর্ণ অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়। আক্ষেপানুরাগের পদ রচনায় তাঁর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁর রচিত পদগুলিতে পূর্বরাগ পর্যায়ে আত্মহারা রাধাচিত্র যেমন উদ্ভাসিত, তেমনই কৃষ্ণচরিত্রের আকুলতাও প্রস্ফুটিত। 'বাসকসজ্জা' পর্যায়ে মিলন ঔৎসুক্য, হাহাকার, বেদনা, 'খন্ডিতা' পর্যায়ে বঞ্চনার ক্ষোভ, আক্ষেপানুরাগে কৃষ্ণপ্রেম পরিপূর্ণভাবে না পাওয়ার নৈরাশ্য ঘুচে গিয়ে 'নিবেদন' পদে চণ্ডীদাসের রাধা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের পদে সমর্পণ করেছেন। 'মাথুর' পর্যায়ে আবার রাধার বিরহ-যন্ত্রণার চিত্রায়ণ ঘটেছে। 'ভাবসম্মিলন' স্তরেও রাধার মনে দুঃখের স্মৃতি। চণ্ডীদাস মূলত বিরহেরই কবি। বিষাদের করুণ রাগিণীই তাঁর কাব্যবীণায় বেজেছে মরমী সুরে।

বিদ্যাপতি : 'মৈথিল কোকিল' :

'বিদ্যাপতি' একাধিক কবি পন্ডিতের নাম অথবা উপনাম। বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতি বিহারের অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গা জেলার (অধুনা মধুবনি মহকুমা/মিথিলা) বিস্‌ফি গ্রামে আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁর তিরোধান হয়। তিনি রাজা শিবসিংহের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কুলধর্মে শৈব বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদ রচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর প্রশ্নাতীত অধিকার ছিল। সংস্কৃত ব্যতীত স্থানীয় উপভাষা অবহট্‌ঠেও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ ছিলেন। তাঁর নামাঙ্কিত প্রথম রচনা কীর্তিলতা লেখা হয়েছিল রাজা কীর্তিসিংহের আমলে। বইটি অবহট্‌ঠ ভাষায় লেখা গদ্যে-পদ্যে গ্রথিত একটি ঐতিহাসিক কাব্য। বিষয় কীর্তিসিংহের কীর্তি, পৈতৃক রাজ্যখণ্ড উদ্ধার। তাঁর পরবর্তী রচনা সংস্কৃতে লিখিত ভূপরিক্রমা (অপ্রকাশিত) কীর্তিসিংহের আত্মীয় দেবসিংহের আশ্রয়ে। দেবসিংহের পুত্র শিব সিংহের আশ্রয়ে লেখা হয়েছিল সংস্কৃতে ও অবহট্‌ঠে লেখা কীর্তিপতাকা (অপ্রকাশিত) এবং লৌকিক ও ঐতিহাসিক কাহিনিগ্রন্থ 'পুরুষ পরীক্ষা'। 'পুরুষ পরীক্ষা' রচনা শেষ হওয়ার আগেই শিব সিংহের মৃত্যু হয়। দ্রোণবারের রাজা পুরাদিত্যের আশ্রয়ে বিদ্যাপতি সংস্কৃতে পত্রদলিল 'লিখনাবলী' লিখেছিলেন। এছাড়াও তাঁর নামে 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে পদাবলির কবি হিসাবেই তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধি। চৈতন্যদেব তাঁর পদ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। বাঙালি বৈষ্ণব পাঠক ও কবিদের কাছেও তাই তিনি স্মরণীয়। শুধু গানে ব্যবহৃত একপ্রকার কৃত্রিম ভাষায় বিদ্যাপতি পদ রচনা করেছিলেন। এ ভাষা পরবর্তী সময়ের বহু কবিকে আকৃষ্ট করেছে এবং বৈষ্ণব পদে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। এমনকি কিশোর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে বজ্রবুলি ভাষার অনুবর্তন ঘটিয়েছেন। বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রায় আটশো পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনায় জয়দেবের অনুসরণ লক্ষ করে তাঁকে 'অভিনব জয়দেব' অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাঁর পদাবলির বাংলা অনুবাদ করে কবিরঞ্জন 'ছোটো বিদ্যাপতি' অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। বাঙালি তিনি ছিলেন না, বাংলাতে পদও তিনি রচনা করেননি, তবু তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হল এই যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই তাঁর উৎকৃষ্ট পদের সঙ্গে

বাঙালির পরিচিতি, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা নির্ভর রচনার প্রতি বাঙালির অন্তরের টান, পরবর্তীকালে বাঙালি কবিসমাজে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পদরচনার প্রবণতা। বৈষ্ণব পদাবলির বিভিন্ন রসপর্যায়—যেমন, বয়:সন্ধি, অভিসার, মিলন, মান, মাথুর, ভাবসম্মিলন প্রভৃতির পদরচনায় তিনি অনবদ্য ছিলেন।

মিথিলারাজ শিবসিংহের সুহৃদ এই কবি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ, স্মৃতি-শাস্ত্র-সংহিতায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। কবি জয়দেবের ভাবাদর্শ, রচনারীতি, সংস্কৃত কবিতা এবং ভাগবতের লীলাকাহিনির প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। এছাড়া তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে 'শৈবসর্বস্বহার', 'বিভাসাগর', 'দানবাক্যাবলী', প্রভৃতি। বারংবার মুসলিম আক্রমণে বিপর্যস্ত মিথিলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের রাজ-অর্পিত দায়িত্ব বিদ্যাপতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কর্ণধার ও শৈব বংশোদ্ভূত হলেও শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতের প্রতি তাঁর সমদর্শিতার পরিচয় মেলে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব-মতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল বলে তাঁকে পঞ্চোপাসক হিন্দু (শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য) বলেই গণ্য করতে হবে।' বিদ্যাপতি মৈথিলি ভাষায় বৈষ্ণবপদ রচনা করলেও তাঁর রচনায় বহু বাংলা শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই মৈথিলি-বাংলার মিশ্রণে গড়া ভাষাই হল ব্রজবুলি। পরবর্তীকালের বহু কবি এই কৃত্রিমভাষা ব্রজবুলিকে পদরচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। পূর্ব-ভারতের শীর্ষস্থানীয় এই কবির ভাবধারার সুযোগ্য অনুসৃতি চৈতন্য পরবর্তীকালের বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনায় লক্ষ করা যায়। তাই বাংলায় বহু পদকারের রচনায় বিদ্যাপতির রচনার প্রভাব থাকলেও তাঁকেই 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ব্রজবুলি ভাষা প্রসঙ্গে :

অন্ত্য-মধ্য বাংলা ভাষায় বাংলা-মৈথিল-অবহট্‌ঠ মিশিয়ে একটি বিশেষ ভাষা পাওয়া গিয়েছিল। মিথিলার কবি উমাপতি ওঝার গীতিনাট্য 'পারিজাতহরণে' এর প্রথম লিখিত নমুনা পাওয়া যায়। এই ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিদ্যাপতিকেই মনে করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'ব্রজবুলি' আর 'ব্রজভাষা' এক নয়। ব্রজভাষা মথুরার ভাষা। আর ব্রজবুলি হল একটি মিশ্র, কৃত্রিম ভাষা। ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত মিথিলায়, বাংলায়, ওড়িশায় এবং আসামে ব্রজবুলির চর্চা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তারা ক্রমাগত এ ভাষায় পদরচনা করেছেন। এই ভাষার ধ্বনিমাধুর্য এবং পদাবলির প্রতি বাঙালির চির-আকর্ষণের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর সাহিত্যিক জীবনের গোড়ার দিকে 'ভানুসিংহের পদাবলী' লেখেন।

নমুনা : 'হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।।' (বিদ্যাপতি)

জ্ঞানদাস :

বৈষ্ণব পদাবলি রচয়িতা জ্ঞানদাস ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বর্ধমান জেলার কাঁদড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কবি চণ্ডীদাসের কাব্যধারার উত্তরসূরি এই কবি অনুরাগ ও 'আক্ষেপানুরাগ'-এর পদে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর

রচিত পাঁচশোর বেশি পদে ভাবের গভীরতা, ঘটনা সংস্থান সৃষ্টির মৌলিকতা যেমন বিস্ময়কর, তেমনই যথাযথ অলংকরণ ও মণ্ডনকলাও ঈর্ষণীয়। চৈতন্যোত্তর যুগের নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পদকর্তা হিসেবে বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় তাঁর বাংলায় রচিত পদগুলিতে পাওয়া যায়। বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা পর্যায়ের বহু পদ তিনি ব্রজবুলি ভাষাতে রচনা করলেও তা বাংলায় রচিত পদগুলির মতো রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। রচিত পদগুলির লিরিকধর্মীতার অর্থাৎ গভীর অনুভূতির আকুতিকে সংহত ও তীব্র আকারে প্রকাশ করার বৈশিষ্ট্যে তিনি অনন্য। রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতিকে তিনি কাব্যভাষায় যথার্থ লিরিকধর্মী করে তুলেছেন যা সকলের কাছেই পরম আস্বাদ্য হয়েছে।

গোবিন্দদাস কবিরাজ :

চৈতন্য-পরবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ (জন্ম আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, দেহাবসান সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে) সাধক এবং ভক্ত রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের অন্যতম শিষ্য ছিলেন এবং আপন কবিত্ব শক্তির গুণে খেতুরীর মহোৎসবে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্রের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন। সুবৃহৎ বৈষ্ণব সংকলনগ্রন্থ 'পদকল্পতরু'তে তাঁর অজস্র পদ সংকলিত হয়েছে। পদ রচনা ছাড়াও তিনি 'সঙ্গীতমাধব' নামে একটি নাটক এবং 'কর্ণামৃত' নামক একটি কাব্য রচনা করেন। রূপদক্ষ শিল্পী গোবিন্দদাস কবিরাজ 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত হয়েছেন। ব্রজবুলিতে পদরচনার পরিপাট্যে, অলংকারের প্রয়োগ নৈপুণ্যে, ছন্দকুশলতায়, চিত্রসৃষ্টি ও সংগীতময়তায়, ভাষার মাধুর্য ও রহস্যময়তায়, তিনি বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছেন। শ্রীরাধার সখী বা মঞ্জরীভাবে অনুগত সাধনা শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্য, তার অনুসরণ গোবিন্দদাসের পদে লক্ষ করা যায়। এছাড়া রাধাকৃষ্ণের 'অষ্টকালীয় লীলা' বর্ণনার পরিকল্পনার পথিকৃৎ রূপে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। বৈষ্ণব পদাবলির বিবিধ রসপর্যায়ে—(গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ, অভিসার, রসোদ্‌গার, প্রার্থনা প্রভৃতি) তাঁর সৃষ্টির অনন্য স্বাক্ষর রয়েছে।

বলরাম দাস :

বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পরেই বলরামদাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নামে একাধিক পদকর্তার সন্ধান পাওয়া গেলেও, এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম হলেন নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরাম দাস, তিনি ষোড়শ শতকের শেষদিকে কৃষ্ণনগরের কাছে দোগাছিয়া গ্রামে আবির্ভূত হন। বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থে ইনি 'সংগীতকারক', 'সংগীতপ্রবীণ' ইত্যাদি নামে পরিচায়িত হয়েছেন। 'পদকল্পতরু'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস কবিরাজের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 'ভক্তিরত্নাকর' অনুসারে তাঁর উপাধি 'কবিপতি'। সহজ, সরল ভাষায় ব্রজবুলি ও বাংলায় রসোদ্‌গার, রূপানুরাগ, বাৎসল্যরসের পদ রচনায় তিনি অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণ ও মা যশোদার স্নেহব্যাকুল পদগুলিতে তাঁর স্বত:স্ফূর্ত হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে মুসলিম কবিরাও গৌরচন্দ্রিকা এবং রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ রচনার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠেন। চৈতন্য প্রচারিত প্রেমধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কবিরা গোষ্ঠলীলা, পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, মিলন, বিরহ, খণ্ডিতা, দানলীলা, হোলিলীলা প্রভৃতি বিষয়ে পদ রচনা করেন। এছাড়াও সুফি সাধকেরা তাঁদের রচনায় জীবাত্মা-পরমাত্মার কথা প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণের অবতারণা করেছেন। বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে বাংলার

কয়েকজন মুসলিম কবি হলেন, অয়াহিদ, সৈয়দ আকবর আলি, সৈয়দ আলাওল, উন্মর আলি, কবীর শেখ, গরীব খাঁ, লালন ফকির, লাল মামুদ, সৈয়দ মর্তুজা প্রমুখ।

বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাব :

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬ খ্রি:-১৫৩৩ খ্রি:) বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। হিন্দু-অহিন্দু, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ না করে তিনি তাঁর 'ভক্তিধর্ম' প্রচার করেছিলেন। জনসাধারণের জন্য যে শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন তা চিরন্তন, সর্বজনীন আদর্শের অনুগত। তাঁর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং নাম সংকীর্তনের উপর। আত্মমর্যাদাহীন বাংলার মানুষ তাঁর দীক্ষায় আত্মমর্যাদা ফিরে পেয়েছিল। তিনিই ঘোষণা করে গিয়েছিলেন যে, সব মানুষই আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হতে পারে। সেই বিশ্বাস থেকেই ধর্মে, দার্শনিক চিন্তায়, সাহিত্যে, সংগীতে বাঙালি তার উৎকর্ষের পরিচয় দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

বৈষ্ণব পদাবলি ও বৈষ্ণব জীবনীসাহিত্য চৈতন্য আবির্ভাবের ফলে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁরই প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম এক দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীকালের পদাবলি সাহিত্যের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিল। তাঁকে অবলম্বন করেই প্রথম বাংলা সাহিত্যে জীবনী সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটে। তাঁর পুণ্য জীবনকে নিয়ে সংস্কৃত ও বাংলায় প্রচুর জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তাঁর পরবর্তীকালের বৈষ্ণবসাহিত্য তো বটেই, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং লোকসাহিত্যও তাঁর ভাবাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। শাক্ত পদাবলি সাহিত্যের ও বাউলগানের ভক্তিধারাও বহুলাংশে চৈতন্য প্রভাবিত।

হিংসা-দ্বেষ-কলুষতাময় ক্লেদাক্ত সমাজে প্রেমের আদর্শের প্রভাবে মানুষ বেঁচে থাকার নতুন পথের সন্ধান খুঁজে নিয়েছিল। নানা বৈষম্য, বিভেদ, অনাচার, সংস্কার, মোহ ঘুচিয়ে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বলা যায়, চৈতন্যদেব বাংলায় এক নবজাগরণের অগ্রপথিক। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই লিখেছেন—'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া'।

মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষায় রচিত বৈষ্ণবপদাবলি ও জীবনীসাহিত্যে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর লীলাকথারই প্রকাশ বৈষ্ণব পদাবলির 'গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ'গুলিতে। তাঁর প্রভাবেই রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদ রচনার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি। তাঁর জীবন-নির্ভর কাব্যগুলির আগে বাংলায় কোনো জীবনীকাব্য ছিল না। সেক্ষেত্রে, জীবনীসাহিত্য রচনার উৎস হিসেবে তিনি রয়েছেন। পরবর্তীকালে অদ্বৈত আচার্য, তাঁর স্ত্রী সীতাদেবী, চৈতন্য-অনুচর নিত্যানন্দ প্রমুখের জীবনীকাব্য রচিত হয়, যেগুলিতে তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। চৈতন্য-পরবর্তী মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও তাঁর পুণ্য জীবনাদর্শের ছায়াপাত ঘটেছে। মুদ্রিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি পাঠের সুবাদে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতেও বহু লেখক শ্রীচৈতন্যকে বিষয় করে কাব্য-কাহিনি রচনা করেছেন যার মধ্যে নবীনচন্দ্র সেনের 'অমৃতাভ' কাব্য, শিশিরকুমার ঘোষের গদ্যজীবনীগ্রন্থ 'অমিয়-নিমাই চরিত', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শ্রীচৈতন্যলীলা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন বৈষ্ণবতত্ত্ব গ্রন্থে, যাত্রাগানে, পাঁচালিতে, কবিগানে তাঁর প্রভাব লক্ষা করা যায়। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন সনাতন, রূপ ও শ্রীজীব গোস্বামী, তাঁরই নির্দেশে, যা পরবর্তীকালের সাহিত্য ও সমাজকে পথ দেখিয়েছে। তাঁর প্রচারিত মানবপ্রেমের সুউচ্চ আদর্শ, 'চন্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণ' (হরিভক্ত চণ্ডাল হরিভক্তিহীন

দ্বিজের থেকে শ্রেষ্ঠ)-র মতো উদ্ধৃতি, আচারসর্বস্ব, জাত-পাতের কলুষতায় দীর্ণ জাতিকে নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে।

সারা ভারতে কবীর, নানক, দাদূ, রজ্জব, নয়সি, মেহ্‌টা, মীরাবাঈ, শঙ্করদেব প্রমুখ বহু সন্তের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা সামাজিক অনাচার এবং শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধে উদার মানবধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও বাংলার সামাজিক জীবনে সেই সুমহান আদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক।

প্রাক-চৈতন্য, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর পদাবলির তুলনা :

কালের দিক থেকে বৈষ্ণব পদাবলির ধারাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— প্রাক্‌চৈতন্য, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলি। বাংলার বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ প্রধানত পঞ্চদশ শতকে এবং তার বিস্তার প্রায় সপ্তদশ শতক পর্যন্ত। বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের নানান উত্থান পতনের মতোই বৈষ্ণব সাহিত্য এবং ইতিহাসও বিবর্তনের পথরেখা ধরে এগিয়েছে। দশম-দ্বাদশ শতকে বিকশিত পুরাণ-নির্ভর বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখের রচনায় লক্ষ করা যায়। আবার, চৈতন্য আবির্ভাবের পর গৌরবঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম যে নতুনত্ব লাভ করে, তার আবেশে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদাবলি বিচিত্রমুখী ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। আর সে কারণেই, কালের পার্থক্যই শুধু নয়, প্রাক্‌চৈতন্য, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলি সাহিত্যের মধ্যে আদর্শগত ও মর্জিগত পার্থক্যও লক্ষণীয়।

১. চৈতন্যপূর্ব যুগে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখের রচনায় বিশেষ সাম্প্রদায়িক আদর্শগত প্রেরণা ছিল না। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের রচনায় চৈতন্যপ্রভাবে বিশেষ ধর্মকেন্দ্রিক পটভূমিকায় রাধাকৃষ্ণলীলা রূপায়িত ও আস্বাদিত হতে শুরু করে।

২. চৈতন্য বিষয়ক পদাবলি 'গৌরচন্দ্রিকা' ও 'গৌরাঙ্গ বিষয়কপদ' চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলিতেই দৃষ্টিগোচর হল।

৩. বৈষ্ণবধর্ম সুনির্দিষ্ট তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা ছাড়া চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির পরিপূর্ণ রসাস্বাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৪. প্রাক্-চৈতন্য যুগের পদাবলিতে ভক্ত কবির 'মুক্তিবাঞ্ছা'ই যেখানে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেখানে চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলিতে ঈশ্বরের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি এবং গোপীদের অনুগত হয়ে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবার সুযোগলাভ প্রার্থনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠল। কবিরা আর লীলাশুক নন, গোপীভাবে ভাবিত।

৫. প্রাক্-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণ-বিষ্ণু-বাসুদেব প্রায় অভিন্ন ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে উৎস হিসেবে শ্রীমদ্ভাগত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, কৃষ্ণকথামৃত, ব্রহ্মসংহিতা আদৃত ও স্বীকৃত হয়েছিল। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব ধর্মে যে ভক্তিবাদ তা 'বৈধী ভক্তি—বিধিবিধান ও শাস্ত্রগ্রন্থের নির্দেশে যে ভক্তির জাগরণ তাই বৈধীভক্তি। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের ভক্তিবাদ হল 'রাগানুগা' ভক্তিবাদ।

প্রাক্-চৈতন্য যুগে কৃষ্ণের মাধুর্যভাবের সঙ্গে যে ঐশ্বর্যভাবের মিশ্রণ ছিল, চৈতন্যোত্তর যুগে সেই ঐশ্বর্যভাব তিরোহিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থে পরিণত হল।

৬. প্রাক্-চৈতন্য যুগে রাধা ও চন্দ্রাবলী ছিলেন অভিন্না। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে রাধা নায়িকা এবং চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা হয়ে উঠলেন। রাধা এখানে শুধু নায়িকা নন,—তিনি 'মহাভাবস্বরূপিনী'।

৭. চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলিতে চৈতন্যের ভগবদ্সত্তার রূপায়ণ লক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠল।

চৈতন্য প্রচারিত ভক্তিধর্মের প্রচার পরবর্তী সাহিত্যের ধারায় ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। সুপ্রাচীনকাল থেকে সাপ, বাঘ, কুমির প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীকে মানুষ ভয় করে এসেছে এবং আত্মরক্ষার জন্য পূজার্চনাও করেছে। সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার কথা ও কাহিনি তথা মনসামঙ্গল কাব্য বাংলা, আসাম, বিহারের কোনো কোনো অঞ্চলে সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। প্রাক্চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের মনসামঙ্গলের কবিরা একই কাহিনিকে অবলম্বন করে গতানুগতিক কাব্য রচনা করলেও চৈতন্য পরবর্তী যুগের কাব্যকাহিনিতে ভক্তিবাদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। রূপগতভাবে না হলেও, শক্তিকাব্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব ভাবগত পরিবর্তন এনেছে। মনসামঙ্গল কাব্যের মনসা, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী চৈতন্যোত্তর কাব্যে তাদের নির্দয়, নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপ হারিয়ে কোমলহৃদয়া হয়ে উঠেছেন, যা বৈষ্ণবীয় সহিষ্ণুতারই আদর্শের প্রতিফলন। কাব্যে সম্প্রদায়গত গোঁড়ামির দিকটিও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে, যা চৈতন্যদেবের সমন্বয়ী ও সহনশীল মনোভাবেরই সম্প্রসারণ। এমনকি, ষোড়শ শতকের চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে 'বিষ্ণুপদ' লক্ষ করা যায়। অনেকের মঙ্গলকাব্যের বন্দনা অংশে পরবর্তীকালে 'চৈতন্য বন্দনা'ও দেখা যায়। এছাড়া, বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রভাবেই মঙ্গলকাব্যগুলির প্রথাগত রূপ ভেঙে ক্রমশ শাক্ত পদ গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। শাক্ত পদাবলির বাৎসল্যরসের পদে, আগমনী বিজয়া গানে বৈষ্ণব পদাবলির কোমলতা ও স্নিগ্ধতার ছায়া এসে পড়েছে। ভাগবত অনুবাদের ধারাতেও প্রাক্-চৈতন্যযুগে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপই প্রস্ফুটিত, চৈতন্য সমকালে বা চৈতন্যোত্তর যুগে শ্রীকৃষ্ণের সখাসখীদের নাম থেকে শুরু করে নানা ঘটনার সন্নিবেশে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-বীরত্বের পাশাপাশি মধুর রূপটিও ফুটে উঠেছে।

চৈতন্যজীবনী সাহিত্য :

চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের আদি গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী, পরে তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত মুরারি গুপ্ত রচিত ৭৮ সর্গে বিভক্ত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' (মুরারি গুপ্তের কড়চা)। চৈতন্য-অনুচর শিবানন্দের পুত্র পরমানন্দ সেন (কবিকর্ণপুর) রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃতম্' সংস্কৃতে রচিত উল্লেখযোগ্য জীবনী মহাকাব্য। প্রাচীন নাট্যকার কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের আদর্শে কবিকর্ণপুর রচিত দশ অঙ্কে সমাপ্ত নাটক 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'-এ সমগ্র চৈতন্য জীবনী বর্ণিত হয়েছে। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় চৈতন্য-পরিকর ও ভক্ত শিষ্যদের পরিচয় রয়েছে। কাশীধাম নিবাসী চৈতন্য-ভক্ত প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' একটি উল্লেখযোগ্য চৈতন্যস্তোত্রকাব্য। এছাড়া বৃন্দাবনের গোস্বামীরা মহাপ্রভুকে অবলম্বন করে অনেক স্তবস্তোত্র লেখেন। শ্রীচৈতন্য জীবনকাহিনি নির্ভর সংস্কৃত জীবনী-কাব্য-নাটকগুলির অধিকাংশই তাঁর পার্ষদ পরিকরদের রচিত হওয়ায় এগুলির তথ্যগত মূল্য অপরিসীম। এই সংস্কৃত রচনাগুলির মধ্য দিয়ে অবাঙালি সমাজেও চৈতন্য মহিমা ব্যাপক প্রচার লাভ করে।

বৈষ্ণব আচার্যদের চরিত সাহিত্য :

চৈতন্যদেবের জীবন কাহিনি অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যে চরিতসাহিত্য রচনার যে ধারা গড়ে ওঠে, তারই অনুসৃতিতে মহাপ্রভুর পার্ষদ, তাঁর শিষ্য, বৈষ্ণব মহান্তদের জীবনকাহিনি নিয়েও জীবনী লেখা হয়েছিল। এ সকল চরিতাখ্যান থেকে তাঁদের জীবনে ঘটনাবলির সঙ্গে পরিচিতির পাশাপাশি বৈষ্ণব পদকর্তাদের সময়কাল, বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস, চৈতন্যলীলা কাহিনি—প্রভৃতিও জানা যায়।

ঈশান নাগর—অদ্বৈত প্রকাশ। শ্যামদাস আচার্য—অদ্বৈত মঙ্গল। হরিচরণ দাস—অদ্বৈত মঙ্গল। নরহরি দাস—অদ্বৈত বিলাস। বিষ্ণুদাস আচার্য—সীতাগুণ কদম্ব। লোকনাথ দাস—সীতাচরিত্র। নিত্যানন্দ দাস—প্রেমবিলাস। যদুনন্দন দাস—কর্ণানন্দ। রাজবল্লভ—বংশীবিলাস / মুরলীবিলাস। গুরুচরণ দাস—প্রেমামৃত। গোপীবল্লভ দাস—রসিকমঙ্গল। মনোহরদাস—অনুরাগবল্লী। নরহরি চক্রবর্তী—ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবপদকর্তা

প্রাক্-চৈতন্যযুগ : জয়দেব, চণ্ডীদাস (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা), চণ্ডীদাস (পদাবলি সাহিত্য রচয়িতা) বিদ্যাপতি, গুণরাজ খান প্রমুখ

চৈতন্য সমসাময়িক যুগ : রায় রামানন্দ, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামানন্দ বসু, যদুনন্দন, বংশীদাস, পরমানন্দ গুপ্ত, মাধাব দাস, যদু কবিচন্দ্র, গোবিন্দ আচার্য, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন প্রমুখ

চৈতন্যোত্তর যুগ : কবিরঞ্জন, রায়শেখর (কবিশেখর), জ্ঞানদাস, লোচনদাস, গোকুলানন্দ, উদ্ধবদাস, নরোত্তম দাস, শ্যামানন্দ দাস, গোবিন্দদাস কবিরাজ, বলরাম দাস, রাধাবল্লভ দাস, ঘনশ্যাম দাস, জগদানন্দ, মনোহর দাস, রাধামোহন ঠাকুর, যাদবেন্দ্র, দেবকীনন্দন, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর, গদাধর দাস, কবিবল্লভ, নসির মামুদ, সৈয়দ মর্তুজা, কুমুদানন্দ, নৃসিংহ কবিরাজ, প্রসাদ দাস, দিব্যসিংহ, বলরাম কবিরাজ, যদুনন্দন দাস, গৌরদাস, গোপাল দাস, মনোহর দাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, দীনবন্ধু দাস, কমলাকান্ত দাস, যদুনাথ দাস, কানাই খুটিয়া, নিমানন্দ দাস, নটবর দাস, গৌরসুন্দর দাস, বৈষ্ণব দাস, উদ্ধব দাস, কানুরাম দাস, অনন্ত দাস, বৃন্দাবন দাস, শ্রীনিবাস আচার্য, বীর হাম্বির, বসন্ত রায়, বল্লভ দাস প্রমুখ।

বৈষ্ণব গ্রন্থ

দুর্লভসার—লোচন দাস—ষোড়শ শতাব্দী, রসকদম্ব—কবিবল্লভ—ষোড়শ শতাব্দী, চতুষ্কাণ্ড পরিমিতি—দ্বিজ ঘনশ্যাম—সপ্তদশ শতাব্দী, গোবিন্দমঙ্গল—কবিচন্দ্র—সপ্তদশ শতাব্দী, হরিবংশ—ভবানন্দ, সপ্তদশ শতাব্দী, কৃষ্ণমঙ্গল—ভবানীদাস ঘোষ—সপ্তদশ শতাব্দী, গোবিন্দবিজয়—অভিরাম দত্ত—সপ্তদশ শতাব্দী, প্রেমবিলাস—নিত্যানন্দ দাস—সপ্তদশ শতাব্দী।

● **কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও গোস্বামীগণ :** শ্রীচৈতন্য, সনাতন গোস্বামী। রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

বৈষ্ণব সঙ্কলন ও অন্যান্য

সপ্তদশ শতাব্দী : রামগোপাল দাস—রাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী, নিত্যানন্দ দাস—প্রেমবিলাস, নন্দকিশোর দাস—রসপুষ্পকলিকা, পীতাম্বর—রসমঞ্জরী, মনোহর দাস—দিনমণি চন্দ্রোদয়।

অষ্টাদশ শতাব্দী : বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, নরহরি চক্রবর্তী—গীতচন্দ্রোদয়, রাধামোহন ঠাকুর—পদামৃত সমুদ্র, দীনবন্ধু দাস—সঙ্কীর্তনামৃত, রাধামুকুন্দ দাস—মুকুন্দানন্দ, কমলাকান্ত—পদরত্নাকর, গোকুলানন্দ সেন—পদকল্পতরু।

চৈতন্যজীবনীকাব্য (বাংলা)

বৃন্দাবনদাস—চৈতন্যভাগবত (ষোড়শ শতাব্দী), লোচন দাস—চৈতন্যমঙ্গল (ষোড়শ শতাব্দী), কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (ষোড়শ শতাব্দী), জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল (ষোড়শ শতাব্দী), চূড়ামণি দাস—গৌরাঙ্গবিজয় (ষোড়শ শতাব্দী), গোবিন্দ দাসের কড়চা (অপ্রামানিক), প্রেমদাস—চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী (অষ্টাদশ শতাব্দী) ভগীরথ বন্ধু—চৈতন্য সংহিতা, (সংস্কৃত)—মুরারি গুপ্ত—'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত', স্বরূপ দামোদরের কড়চা, কবিকর্ণপুর পরমানন্দ দাস—চৈতন্য চরিতামৃত, 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

বাংলায় রচিত চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলির মধ্যে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', গোবিন্দদাসের 'কড়চা', চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্য রচনার জন্য 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' অভিধায় সম্মানিত হয়েছেন। তিনি চৈতন্যভক্ত শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্কন্যা নারায়নীর পুত্র। তাঁরই নির্দেশে কবি কাব্যনাম 'চৈতন্যমঙ্গল' বদলে শ্রীচৈতন্যভাগবত' রাখেন, কেননা প্রায় সমসময়ে লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। অন্য মতানুসারে, চৈতন্যভাগবতে শ্রীমদ্ভাগবতের লীলা বিন্যাসের অনুসরণ লক্ষ করে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা কাব্যের এমন নামকরণ করেন। তিনটি খণ্ডে, একান্নটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই বিপুলায়তন জীবনী কাব্যে চৈতন্য জীবনের শেষ পর্যায়ের কথা বিশদে কবি লেখেননি। নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈতপ্রভুর থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, মুরারিগুপ্তের কড়চার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, ভাগবতকে অনুসরণ করে কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেবের বাল্য ও কৈশোরলীলার প্রাঞ্জল বর্ণনার পাশাপাশি চৈতন্য ধর্মসম্প্রদায়, চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তির কথা সুললিত ভঙ্গিমায় পরিবেশিত হয়েছে। তাই শুধু কাব্য হিসেবে নয়, ঐতিহাসিক দলিল হিসেবেও চৈতন্যভাগবতের মূল্য অপরিসীম।

শ্রীখণ্ড গ্রামের বিখ্যাত চৈতন্য অনুচর নরহরি সরকারের সুযোগ্য শিষ্য লোচন দাস ১৫৫০-৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত—'সূত্রখণ্ড', 'আদিখণ্ড', 'মধ্যখণ্ড' এবং 'শেষখণ্ড'। এটি গেয় কাব্য, অনেকটা মঙ্গলকাব্যের রীতিতে রচিত। জনসাধারণের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রচিত এই কাব্যে শ্রীচৈতন্যের জীবনের নানান কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, যাদের প্রামাণিকতার বিষয়ে সংশয় রয়েছে। তাঁর কাব্যেও মুরারিগুপ্তের কড়চার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এছাড়া লোকশ্রুতিকে তিনি কাব্যনির্মাণে বড়ো ভূমিকা দিয়েছেন।

বর্ধমান নিবাসী, চৈতন্যভক্ত সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র জয়ানন্দ রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে চৈতন্যজীবন কথার পাশাপাশি তৎকালীন বাংলাদেশের পরিচয় মেলে। মঙ্গলকাব্যের রচনারীতির অনুসারী, জনসাধারণের জন্য, গানের রীতিতে রচিত এই কাব্যটি নয়টি খন্ডে বিভক্ত। জনতার মনোরঞ্জনের জন্য কবি বৈষ্ণব কাব্য রচনা করতে গিয়ে আদ্যাশক্তির বর্ণনা বা কালীমূর্তির বন্দনা করেছেন। তাঁর কাব্যে নবদ্বীপের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রসঙ্গ ইতিহাস সমর্থিত।

বর্ধমান নিবাসী বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে বৃন্দাবনে যান এবং বৈষ্ণব আচার্যদের সান্নিধ্যে ভক্তিশাস্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি বৃন্দাবনের আচার্যদের অনুরোধে অশক্ত শরীরে চৈতন্যদেবের

জীবনের অন্ত্যখণ্ড বিস্তারিত আকারে বর্ণনার সংকল্প করেন। বৃন্দাবনদাসের রচনায় সংক্ষেপিত বা অনালোকিত চৈতন্যজীবনের নানা অধ্যায়কেই তিনি তাঁর কাব্যে রূপায়িত করেছেন। তিনটি খণ্ডে (আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড), বাষট্টিটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই কাব্যে বৈষ্ণবদর্শন, ভক্তিশাস্ত্র ও চৈতন্যতত্ত্বের নিগূঢ় বর্ণনা রয়েছে। কাব্যে দর্শনের গভীর আলোচনার সুবাদেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বিনয়, জ্ঞানের সঙ্গে প্রেম, মননের সঙ্গে হৃদয়ানুরাগ মিশে গেছে।

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিমভারত ভ্রমণের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসেবে 'গোবিন্দদাসের কড়চা'র (প্রকাশকাল—১৮৯৫) ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃত। এই গোবিন্দদাসের পরিচয় নিয়ে সংশয় থাকলেও তাঁর কাব্যে তৎকালীন সমাজের চিত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থটি 'ভুবনমঙ্গল' নামেও পরিচিত। কাব্যের শুধু আদিখণ্ডটিই লভ্য, তাও তথ্যগত অসঙ্গতিপূর্ণ। জীবনীসাহিত্য রচনার ধারা পরবর্তীকালেও অনুসৃত হতে দেখা যায়। চৈতন্যদেবের অনুচর পরিকরদের জীবনীতে, বৈষ্ণব আচার্যের জীবনীতেও তাঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

আরাকান রাজসভার কাব্যচর্চা :

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে চট্টগ্রামের রোসাঙ্গ রাজসভার বিপুল অবদান রয়েছে। রোসাঙ্গের রাজবংশ মগ এবং তাঁদের মাতৃভাষা আরাকান। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশ ও আরাকানের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্রপাত হয়, তা পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনায় হোসেন শাহ যখন চট্টগ্রাম জয় করেন, তখন আরও গভীর হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চট্টগ্রাম বঙ্গসংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

চৈতন্যপ্রভাব ও সুফি পিরদের প্রভাবে এই অঞ্চলে কাব্য-সঙ্গীত চর্চা, অনুশীলন চলতে থাকে। চট্টগ্রাম ও নিম্নবঙ্গ অঞ্চলের শিক্ষিত মুসলিমেরা রাজসভায় উপস্থিত হলে তাঁদেরই আগ্রহে গৌড় দরবারের অনুকরণে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতার সূত্রপাত হয়। আরাকানের সাহায্যে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের প্রচলিত আরব্য উপন্যাস জাতীয় গল্প, রূপকথা, লৌকিক কাহিনি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থিত হয়। এদের প্রভাবে সপ্তদশ শতাব্দীতেও আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি গৃহীত হয়েছিল। এসময়ে বহু লোকগীতি, প্রণয়কাব্যে চৈতন্য প্রভাবমুক্ত সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দীতে কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ার পাশাপাশি নব্য স্মার্ত চেতনার প্রতিষ্ঠা লক্ষ করা যায়। এ সময়ে বহু মুসলিম কবি আরবি-ফারসি লোককথার সাহায্যে সাধারণ মানুষের কথা সাহিত্যে নিয়ে এলেন লোকগাথামূলক প্রণয়কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে। আরাকান রাজসভায় মুসলিম কবিদের এসব রচনাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) অনুবাদ সাহিত্য—আরবি-ফারসি লোককথা কাব্য, গল্প অবলম্বনে রচিত (২) রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ বা পদাবলি সাহিত্য, (৩) ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ ও তান্ত্রিক যোগ বিষয়ক নিবন্ধ (৪) বিদ্যাসুন্দর কাব্য। মূলত অনুবাদ গ্রন্থ হলেও সাহিত্যে এদের ভূমিকা কম নয়। এই কাব্যবিভাগগুলির অন্যতম প্রধান কবিরা হলেন যথাক্রমে দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল, মোহাম্মদ খান, সৈয়দ সুলতান, সাবিরিদ খান।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি উল্লেখযোগ্যতা দাবী করলেও সেই শতাব্দীর শেষদিকে আরাকানের রাজনৈতিক অস্থিরতায় বাঙালি মুসলিমেরা ক্ষমতাচ্যুত হলে বাংলা সংস্কৃতির পূর্ব সমাদর আর থাকেনি। তবু চট্টগ্রামের শিক্ষিত মুসলিমেরা সাহিত্যচর্চা ছেড়ে দেননি। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ রাঢ়, ভুরশিট-মান্দারণ প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙালি মুসলিমেরা এক বিশেষ সাহিত্য সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সিলেটের পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে সুলতানদের অধিকার বিস্তৃত হলে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে

ইসলামি বাংলার সাহিত্য---বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে---জঙ্গনামা---হেয়াৎ মামুদ, নসরুল্লা খান, আরিফ, গরিবুল্লা। ● রসুলবিজয়—সাবিরিদ খান, জৈনুদ্দিন, শেখ চান্দ। ● পদাবলি—সৈয়দ মুর্তজা, আলীরাজা। ● গাজীমঙ্গল—আবদুল গফুর, সৈয়দ হালু মিঞা, জৈনুদ্দীন, ফয়জুল্লা। ● পিরগাথা বা সত্যনারায়ণ পাঁচালি—আরিফ, ফৈজুল্লা। ● রোমান্টিক কাব্য-কবিতা—মহম্মদ কবীর, সৈয়দ হামজা, শাহ মহম্মদ সগীর, সাকের মামুদ, সেরাদোতুল্লা, আবদুল রহমান, দৌলত উজীর। ● বিবিধ—শেখ রাজ, সেখ সাদী, সৈয়দ মর্তুজা।

বাঙালি মুসলিমদের সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃজিত হয়। আরাকান ও চট্টগ্রামে মুসলিম অধিকার অবলুপ্ত হওয়ার পরেও সিলেট অঞ্চল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইসলামি সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে স্বাধীন নবাবি আমল শুরু হওয়ার আগে থেকেই বাঙালি মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বাংলা শিক্ষার প্রসার হতে থাকে। সে সময়ে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্য ছিল ধর্ম, ঘর, গৃহস্থালির কাজে, সমাজে ব্যবহৃত ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যাপক প্রচলন তখনও ছিল যা আজও বর্তমান। ইংরেজ আমল শুরু হলে কলকাতার মজদুর মুসলিমদের পাঠ্যগ্রন্থে যখন আরবি-ফারসির সঙ্গে বাংলা ও হিন্দির মিশ্রণ নিবিড় হয়ে উঠলে 'ইসলামি বাংলা' তৈরি হল।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও শাক্ত পদাবলি :

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের পর (ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু) বাংলার নবাবি রাজত্বেও কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার শিথিলতার প্রভাব অলক্ষণীয় থাকল না। নবাবদের বিলাসব্যসন মত্ততা, ষড়যন্ত্র, ভূস্বামীদের শোষণ, বর্গির হাঙ্গামা, অত্যাচার, পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের আক্রমণ—বাঙালিদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এই পরিস্থিতিতে মানুষ এমন এক দেবতার কল্পনা করেছিল, যিনি মুহূর্তে মানুষকে পরিপূর্ণতায় ভাস্বর করে দিতে পারেন, আবার মুহূর্তে জীর্ণ সৃষ্টিকে ধ্বংস করে নতুন প্রাণের সম্ভাবনা গড়ে দিতে পারেন। বাঙালির দুঃখ চিত্রের কথা ও দুঃখ মুক্তির সুর শাক্ত গানগুলিতে পরম আকুলতায় ফুটে উঠেছে।

বাঙালির মাতৃভাবানুরাগের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে এই গানগুলিতে। পল্লীনির্ভর বাঙালির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের গভীর সুর এই গানগুলিতে ছত্রে ছত্রে মর্মরিত হয়ে উঠেছে। এই শাক্ত-সঙ্গীতের পথিকৃৎ সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন, যিনি 'কবিরঞ্জন' নামে প্রসিদ্ধ। খ্যাতনামা এই শক্তিসাধক, কবি ও গায়কের জন্ম আনুমানিক ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগণার হালিশহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে। পিতা রামরাম সেন। খুব কম বয়সেই তাঁর মধ্যে কবিত্বশক্তি ও ঈশ্বরভক্তি বিকশিত হয়। অবসর পেলেই শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করে খাতায় লিখে রাখতেন। তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাঁর গানগুলি 'রামপ্রসাদী সঙ্গীত'

নামে পরিচিত এবং সঙ্গীতগুলির সুর বা গীতিভঙ্গি বাংলার লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেছিলেন। 'কালীকীর্তন' নামে তাঁর একটি ছোটো বইও রয়েছে।

তাঁর আগে এমন ধরনের মাতৃগীতি বাংলা সাহিত্যে ছিল না। সহজ সরল ভাষায় ভক্ত প্রাণের আকুতি গানগুলির সম্পদ। তন্ত্রের গূঢ় তত্ত্বকথা গানগুলিতে থাকলেও তা দুর্বোধ্য ও নীরস হয়ে পড়েনি। রামপ্রসাদের অনুকরণে বহু কবি শাক্তসঙ্গীত রচনা করেছেন। শাক্ত গানের বিভিন্ন পর্যায়—যেমন বাল্যলীলা, আগমনী, বিজয়া, জগজ্জননীর রূপ, মা কি ও কেমন, ভক্তের আকুতি, মনোদীক্ষা, মাতৃপূজা, সাধন শক্তি, নাম-মহিমা ইত্যাদি। শাক্ত পদাবলির কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, এন্টনী সাহেব, কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা), গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দাশরথি রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, রাম বসু, রূপচাঁদ পক্ষী, হরিনাথ মজুমদার প্রমুখ।

খ্যাতনামা শ্যামাসঙ্গীতকার কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (আনুমানিক ১৭৭২-১৮২১ খ্রি:) তাঁর গভীর ভক্তি ও আন্তরিকতাসমৃদ্ধ গানের জন্য বাংলা শাক্তসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে 'আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে', 'তুমি যে আমার নয়নের নয়ন', 'মজিল মোর মন ভ্রমরা' ইত্যাদি। 'সাধকরঞ্জন' নামে তাঁর একটি বিখ্যাত তান্ত্রিক কবিতা গ্রন্থ রয়েছে।

বাউল সম্প্রদায় ও বাউল গান, মুর্শিদি গান

'বাউল' শব্দের উৎপত্তি সম্ভবত 'বাতুল' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'উন্মাদ' বা 'বায়ুগ্রস্ত'। ঈশ্বরের প্রেমে উন্মাদ শাস্ত্রভারমুক্ত বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব আনুমানিক ষোড়শ শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের শুরুতে আর তার বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে অষ্টাদশ শতকে এবং তারও পরে।

'বাউল' বলতে কখনো বিশেষ এক শ্রেণির অধ্যাত্মমূলক পল্লিগীতিকে বোঝায়, আবার কখনো বা এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়কে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী ফকিরের রূপে এই বাউলদের দেখা যায়। বাউলগান এই ধর্মসম্প্রদায়েরই গান, যা বাংলা লোকসাহিত্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই গান কখনো স্বরচিত কখনো বা ভক্ত পরম্পরায় প্রাপ্ত। অত্যন্ত প্রাচীন সাধনাধারায় এই সাধকেরা তাঁদের যাবতীয় সাধনপদ্ধতি রূপকের আড়ালে গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, যে গান নানা বাদ্যযন্ত্র যেমন-একতারা, খঞ্জনি, ডুগি, খমক ইত্যাদি সহযোগে গাওয়া হয়ে থাকে। তালবদ্ধ এবং ছন্দোপ্রধান গানের সঙ্গে থাকে নৃত্য, গায়কের পায়ে বাজে ঘুঙুর। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এবং বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে 'বাউল' শব্দের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রচলিত ধর্মসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত বাউলেরা স্বভাবতই প্রতিমাপূজা, ব্রত-নিয়ম, উপবাস, তীর্থযাত্রায় বিশ্বাস করেন না। ধর্মসাধনায় এঁরা উল্টা সাধনের পক্ষপাতী; যোগসাধনার ক্ষেত্রে নি:শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু নিয়ন্ত্রণ করে উল্টো পথে প্রেরণ তাঁদের অবশ্য আচরণীয়, প্রধান কৃত্য। অন্য অনেক গুহ্যসাধন পদ্ধতির মতো বাউলগোষ্ঠীর মধ্যেও গুরু বা মুর্শিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর নির্দেশেই শিষ্য প্রকৃত সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি করে থাকেন। তিনিই অনেক সময় ভগবানের সঙ্গে তুলিত হয়েছেন। 'ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড' তত্ত্বে বিশ্বাসী বাউলের দৃষ্টিতে মানুষের দেহেই পরমদেবতার বাস। এই পরমদেবতা বা 'মনের মানুষ'ই তাঁদের

সাধ্যবস্তু, অন্যত্র যাঁর অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়। 'মনের মানুষ' অনন্ত, পরম সত্য, আবার ব্যক্তিগত প্রেমেরও আধার। অসীমকে সীমার মধ্যে অনুভব করিবার প্রয়াস এবং সীমাবদ্ধ জীবনে অসীমের ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শলাভের ফলে বিস্ময়—বাউলদের গানে এই ভাবটি বারবার প্রকাশ পাইয়াছে।' (ভারতকোষ, পঞ্চম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষৎ) 'মনের মানুষ'কে এঁরা 'সাঁই', 'দীন দরদী সাঁই', 'অচিন পাখি', 'গরজী' ইত্যাদি অভিধাতেও অভিহিত করেছেন।

বাউলগানে গভীর ঈশ্বর অনুভূতির কথা রয়েছে, রয়েছে ভগবানের প্রতি অপার নির্ভরশীলতার কথা। লোকশিক্ষামূলক এই গানগুলি বাংলাদেশে সমাজ-বৈষম্য, জাতিভেদ প্রথা দূর করতে বহুলাংশে সক্ষম হয়েছে। বাউলগানের প্রসিদ্ধ সাধক শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন লালন শাহ ফকির (যিনি আনুমানিক ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গান রচনা করেছিলেন), পদ্মলোচন গোঁসাই, যাদুবিন্দু, ফকির পাঞ্চশাহ, হাউড়ে গোঁসাই, গোঁসাই গোপাল, এরফান্ শাহ্, পাগলা কানাই প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাউলগানের গভীর সংযোগ ছিল। আধুনিককালে তিনিই প্রথম বাউল গান সংগ্রহ করেন। বাউল সম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন ধারার প্রবর্তক ছিলেন জগমোহন, যাঁর অনুগামীরা 'জগমোহনী সম্প্রদায়' নামে পরিচিত। গুরু আউলচাঁদ একতারা বাজিয়ে বাউল গানের প্রচলন করেন। মূলত তাঁর সময় থেকেই গুরুপরম্পরাবদ্ধ বাউল সাধনার সুস্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়।

মুসলিম লোকসমাজে বাউলের অনুরূপ সহজ সাধনার যে পন্থা, তাকেই মুর্শিদি বা মারিফতি ধারা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাউল সাধনার মতো এখানেও শাস্ত্রাচার বর্জন করা হয়েছে। ইসলামি সুফি-ভজন-পদ্ধতি দ্বারা মুর্শিদি মারিফতিকে প্রভাবিত হতে দেখা যায়। 'মারিফত' শব্দের অর্থ 'পন্থা'। তাঁদের সাধনাও গুরুমুখী। তাঁদের গানে গুরুগম্য সাধনপন্থার কথাই অনুভববেদ্য করে প্রকাশ করা হয়েছে।

নাথ সাহিত্য :

মঙ্গলকাব্য ছাড়া 'নাথ সাহিত্য' নামে পরিচিত আরেক শ্রেণির কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলাদেশে সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান শিব-উপাসক এক যোগী সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত ধর্মই হল নাথধর্ম। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কালক্রমে স্তিমিত হয়ে এলে তার সঙ্গে শৈবধর্মের মিশ্রণের ফলেই এই নাথধর্মের উৎপত্তি। নাথ ধর্মসম্প্রদায়ের যোগ-মাহাত্ম্যই নাথ সাহিত্যের বিষয়, কীভাবে যোগের শক্তিতে দুঃখ বিপদ অতিক্রম করা যায়, জয় করা যায় মৃত্যুকে পর্যন্ত—নাথসাহিত্যে সে কথাই বর্ণিত হয়েছে। এই নাথসাহিত্যের দুটি ভাগ। সেগুলি হল (১) শিষ্য গোরক্ষনাথ কীভাবে গুরু মীননাথকে উদ্ধার করলেন সেই কাহিনি অর্থাৎ সংসারের মায়ায় আবদ্ধ মীননাথকে যোগী করে তোলার কাহিনি আর (২) রানি ময়নামতী আর তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনি। যে আলাদা ছড়া-পাঁচালির আকারে মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনি রয়েছে, তার নাম 'গোরক্ষবিজয় বা 'মীন-চেতন; আর, যে কাহিনিতে রানি ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তা 'ময়নামতীর গান' বা 'গোপীচন্দ্রের গান' নামে পরিচিত। সুপ্রাচীন কাল থেকে নানা প্রক্ষেপের মধ্য দিয়ে এসব কাহিনির মূল রূপটি বর্তমানে বহুল-পরিবর্তিত, এমনকি, এর বহু পুঁথিতে চৈতন্য প্রভাবের স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। এই নাথসাহিত্য—'গোরক্ষবিজয়' আর 'গোপীচন্দ্রের গান' গ্রাম্য কবিদের রচনা। যে কারণে এতে না আছে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর, না আছে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের প্রভাব। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষা-রীতিই নাথসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। তবুও এতে ধর্মতত্ত্ব, দার্শনিকতার সঙ্গে কবিত্বের স্ফূরণও লক্ষ করা যায়। করুণ রসাত্মক গোপীচন্দ্রে গানে প্রাচীন বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রের সহজ রূপায়ণ ঘটেছে, সামাজিক রীতিনীতি,

অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় রয়েছে, গ্রাম্য ছড়া-প্রবাদ-প্রকৃতির বিবরণও এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গানগুলিতে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব নানাভাবে এসেছে। এসেছে অতিপ্রাকৃত তথা অলৌকিকতার স্পর্শ। বাংলার বাইরে গানগুলির প্রচারের উদ্দেশ্যে এগুলিকে মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, ওড়িয়া—প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদও করা হয়েছিল। বহু কবি 'গোরক্ষবিজয়' এবং 'গোপীচন্দ্রের গান' রচনা করেছেন। অষ্টাদশ শতকের আগে লেখা মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনির কোনো পুথি পাওয়া যায়নি। গোরক্ষবিজয়ের প্রাচীনতম কবিদের মধ্যে রয়েছেন ভীমসেন রায়, শ্যামদাস সেন, শেখ ফয়জুল্লা প্রমুখ।

ময়নামতীর গানের প্রাপ্ত পুথির মধ্যে কোনোটি সপ্তদশ শতকের আগে রচিত নয়। এ কাহিনির উল্লেখযোগ্য কবি হলেন-দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস, সুকুর মামুদ প্রমুখ।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা :

ময়মনসিংহের অধিবাসী চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯-১৯৪৬)-র প্রচেষ্টায় সংগৃহীত ও 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' দেখে আকৃষ্ট হয়ে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৮৬-১৯৩৯) 'ময়মনসিংহ গীতিকা' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এরপর আরো কয়েকটি খণ্ড 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। সমগ্র গীতিকা সংকলনই 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রচলিত। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল আগে ময়মনসিংহে উদ্ভূত এর কাহিনিগুলির ভাষারও বিবর্তন ঘটেছে, তাই সুনিশ্চিত করে এর উদ্ভবকাল নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। কাহিনিগুলিতে বৈচিত্র্যময়, সরল, স্বত:স্ফূর্ত, আন্তরিকতাপূর্ণ, সম্প্রীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ গ্রামজীবনের অনবদ্য ছবি ধরা পরেছে। আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিকতার স্পর্শরহিত সমাজজীবনের এই ছবি মূলত ধর্মনির্ভর মধ্যযুগীয় কাব্যধারা থেকে স্বতন্ত্র। গীতিকবিতার এক বিশিষ্ট ভঙ্গি পূর্ববঙ্গ গীতিকায় লক্ষ করা যায়। দ্বিজ কানাই, নয়নচাঁদ ঘোষ, দ্বিজ ঈশান, রঘুসুত, চন্দ্রাবতী, ফকির ফৈজু, মনসুর বয়াতি প্রমুখের রচনায় গীতিকা-সাহিত্য উজ্জ্বল। কবিরা তাঁদের রচনায় তৎকালীন সমাজ ইতিহাসের যেমন প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, পুরাণ-দর্শন-ধর্মতত্ত্বের অনুবর্তনও ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'ময়মনসিংহ গীতিকা বাঙ্গালার পল্লীহৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বত: উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা।' নানা ইতিকথা অবলম্বনে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের কথা কবিত্বময় ও সুসংহত আকারে গীতিকাগুলিতে উৎসারিত হয়েছে। এর বিভিন্ন পালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—আঁধা বধুঁ', 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'কমলা', 'কঙ্ক ও লীলা' 'দস্যু কেনারাম' প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ ধর্মসাধনা তথা ঈশ্বর-উপাসনাকে ভিত্তি করে। তাই সাধন-পদ্ধতির বৈচিত্র্যের প্রতিফলন সাহিত্যে অনিবার্যভাবেই এসেছে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করলে তাতে বাংলাদেশে ধর্মসাধনার বহু বিচিত্র প্রকাশকে অনায়াসে সুচিহ্নিত করা যায়। যেমন— তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, নাথধর্ম, সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বাউল সম্প্রদায় প্রভৃতি। এছাড়াও অসংখ্য লৌকিক দেব-দেবীর উদ্ভবও সে সময়ে ঘটেছে। এইসব ধর্মসাধন-পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে আধুনিক যুগের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সাহিত্য রচিত হয়েছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধদের চর্যাপদ, শৈব ও শাক্তদের অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শিবায়বন, শাক্তগীতি, বৈষ্ণবদের পদাবলি, কৃষ্ণমঙ্গল, চরিতকাব্য, নাথপন্থীদের গোরক্ষবিজয়, সহজিয়াদের সাধনাসংগীত প্রভৃতি মূলত ধর্মনির্ভর মধ্যযুগের সাহিত্যে একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে। সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী রচনা বলতে ছিল কিছু প্রণয় কাহিনি-নির্ভর আখ্যান, ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং অন্যান্য লোকসংগীত। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠান রাজত্বের অবসানে বাঙালির রাষ্ট্রনৈতিক

অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। মোগল যুগে এদেশে এক নতুন জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। হোসেন-শাহী বংশের অবনতির সময় থেকে বহির্বাণিজ্য বাঙালির হাতছাড়া হতে থাকে এবং বিদেশি বণিকদের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। তাই, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সাধারণ বাঙালি ভূমি-উপজীবী হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশি বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্ম করে অল্প কিছু সংখ্যক লোক বেশ লাভবান হল এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল। সমাজের উচ্চস্তরের এই অন্ত:সারশূন্য আড়ম্বর ও বিলাস ব্যসনের চিত্র ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল রাজশক্তির পতনের সময়কালে বাংলাদেশসহ অন্যান্য প্রদেশের নবাবদের মধ্যেও স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের ফলে তাদের বিলাসী উচ্ছৃঙ্খলতায় এবং অক্ষম শাসনে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বর্গির হাঙ্গামা সমাজকে অস্থির ও সন্ত্রস্ত করে তুলল। পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য শক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধি ও আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। অবশেষে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার পরাজয়ে ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনাধীন হয়ে পড়ে। যুদ্ধবিধ্বস্ত শিথিল সমাজজীবনে উন্নত সাহিত্যচর্চা ছিল কল্পনাতীত। অবক্ষয়ের সেই যুগে নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের (১৭১০-১৮৮৩ খ্রি:) পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতচন্দ্র রায় রামপ্রসাদ সেনের মতো কবিরা কাব্যরচনা করেছেন। এই সময়পর্বে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য কবিদের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ও শিবায়নের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এই সময়ের কিছু বৈষ্ণব কবিতা, চরিত কাব্যগ্রন্থ, বৈষ্ণব নিবন্ধ-পদসংকলন, রামায়ণ-মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ, বিদ্যাসুন্দরকাব্য, সত্যনারায়ণ পাঁচালি, শৈবযোগী সম্প্রদায়ের ছড়া ও গাথা, নীতিকথা, ঐতিহাসিক গাথা, গণিতের আর্যা, ইসলামি বাংলায় রচিত আরবি-ফারসি উপাখ্যান-আশ্রয়ী কিস্‌সার সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া, ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনে বিদেশি ধর্মপ্রচারক ও বণিকেরা বাংলা শব্দকোষ সংকলন করেন এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লেখেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ইংরেজি শিক্ষার সূচনা ও প্রসারের ফলে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির সংস্কৃতির পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে।

পাশ্চাত্য অভিঘাতে দেশবাসীর চিন্তা-চেতনায় অভূতপূর্ব আলোড়ন তৈরি হয়, তাঁদের আধুনিক যুগের উপযোগী মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠে। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই পরিবর্তিত পরিমার্জিত ভাবনার প্রতিফলন কীভাবে সাহিত্যে এসেছে, ধর্মীয় আবেগ তথা ভক্তির পরিবর্তে যুক্তি এবং আত্মশক্তির উদ্বোধন কীভাবে ঘটেছে, মানবচিন্তা, মানববোধ, মর্ত্যচিন্তা কীভাবে সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে আমরা তারই সন্ধান করব।

ভাষা
(প্রথম পর্যায়)

প্রথম অধ্যায়

বিশ্বের ভাষা ও পরিবার

সারা পৃথিবীতে কতগুলো ভাষা আছে, নির্দিষ্টভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, হাজার তিনেক ভাষা ও সেসব ভাষার অসংখ্য বৈচিত্র্য ছড়িয়ে আছে পৃথিবী জুড়ে। তবে বেশির ভাগ ভাষারই ব্যবহারকারীর সংখ্যা দশ লক্ষ থেকে কয়েকশোর মধ্যে। এতগুলো ভাষার মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি না, সে নিয়ে ষোড়শ শতকেই রোমান ক্যাথলিক মিশনারিরা লক্ষ করেছিলেন; পরবর্তীকালে জার্মান পণ্ডিত শুলৎস এবং ফরাসি ভাষাবিদ ক্যারদ্যুও বলেছিলেন যে সংস্কৃতের সঙ্গে ইউরোপীয় কয়েকটি ভাষার সাদৃশ্য আছে। ১৭৮৬ সালে কলকাতার রয়্যাল সোসাইটির অধিবেশনে উইলিয়ম জোন্‌স তাঁর বক্তৃতায় সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন ও জার্মানিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে গভীর মিলের কথা বলেন।

এইভাবে ভাষাগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে ভাষাগুলির অতীত ইতিহাস পুনর্গঠন করে গোত্রনির্ণয় করা হয়। পৃথিবীর এতগুলো ভাষাকে কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতিতে বর্গীকরণ করা হয়। এই পদ্ধতিগুলি হল—১. ভাষার রূপতত্ত্ব বা আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ, ২. গোত্র বা বংশানুযায়ী বিভাগ, ৩. মহাদেশ অনুযায়ী বিভাগ, ৪. দেশভিত্তিক বিভাগ, ৫. ধর্মীয় শ্রেণিবিভাগ এবং ৬. কালগত শ্রেণিবিভাগ। এই ছয়রকম পদ্ধতির মধ্যে মহাদেশ বা দেশভিত্তিক সমস্যা হল যে একই ভাষা বিভিন্ন দেশে, এমনকি মহাদেশে ছড়িয়ে থাকতে পারে। ভাষা যেহেতু সময়ের সঙ্গে পালটায়, তাই নির্দিষ্ট কালপর্বে কোনো ভাষার বর্গীকরণ সম্ভব নয়। সম্ভব নয় 'ধর্ম'কে ভিত্তি করে বর্গীকরণ, কারণ একটি ভাষা বহু ধর্মের মানুষ ব্যবহার করে। বাস্তবে এমন কোনো ভাষা নেই যা শুধুমাত্র ধর্মের সঙ্গেই জড়িত।

ভাষার রূপতত্ত্ব বা আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ :

ভাষার মধ্যে বাক্য ও শব্দের বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী যে শ্রেণিবিভাগ করা হয় তাকেই রূপতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ বলা যেতে পারে। এই ধরনের বিশ্লেষণের ফলে বিভিন্ন ভাষার সাংগঠনিক অবয়বটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা আমাদের ভাষা থেকে জেনেছি যে শব্দের সঙ্গে জুড়ে থাকে উপসর্গ, প্রত্যয় বা বিভক্তি এবং বাক্যের মধ্যে ক্রিয়া এবং অন্যান্য শব্দগুলো পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক ভাষা আছে যেসব ভাষায় শব্দের সঙ্গে কোনো উপসর্গ-প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্ত থাকে না। বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান দেখে কর্তা, কর্ম ইত্যাদি নিরূপণ করা হয়। এই ধরনের ভাষা হলো চিনা ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা, ভারতীয় ভোটচিনা ভাষা। এই শ্রেণিবিভাগের নাম অনন্বয়ী বা অসমবায়ী (Isolating/Positional)। আবার অন্যদিকে যদি পদ গঠিত হয় বিভক্তি বা প্রত্যয়ের সাহায্যে এবং শব্দের উপাদানগুলিকে আলাদা করলেও স্বতন্ত্র অর্থ বজায় থাকে এবং স্বাধীনভাবে যে-কোনো পদগঠনে ব্যবহারও করা যায়, তাহলে এই ধরনটিকে মুক্তান্বয়ী (Agglutinating) বর্গ বলা হয়। তুর্কি ভাষা এই শ্রেণির উদাহরণ। এছাড়াও আফ্রিকার সোয়াহিলি-র নামও করা যায়। উপসর্গ-অনুসর্গ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে মুক্তান্বয়ী বর্গকে কয়েকটি উপবর্গে ভাগ করা যায়। আফ্রিকার বান্টু ভাষাগোষ্ঠী, উরাল, আলতাই, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষা এইসব শ্রেণির অন্তর্গত। আবার এমন

ভাষাও আছে যেখানে বাক্যের বাইরে শব্দের কোনো স্বাধীন সত্তাই নেই, শুধু কিছু অসম্পূর্ণ ভাবের বাহক মাত্র। এক্ষেত্রে শব্দ বা পদ নয়, বাক্যই হল বাগ্‌ধারার নিম্নতম অংশ। যেমন, 'aulisariartorsuarpok' (সে তাড়াতাড়ি মাছ ধরতে যাচ্ছে)। aulisar = 'মাছ ধরা' + peartor = 'কাজে নিযুক্ত হওয়া' + (pinne) suarpok = 'সে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে'। এই এস্কিমো ভাষা যে শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, তাকে বলা হয় অত্যন্বয়ী (Incorporating) বর্গ।

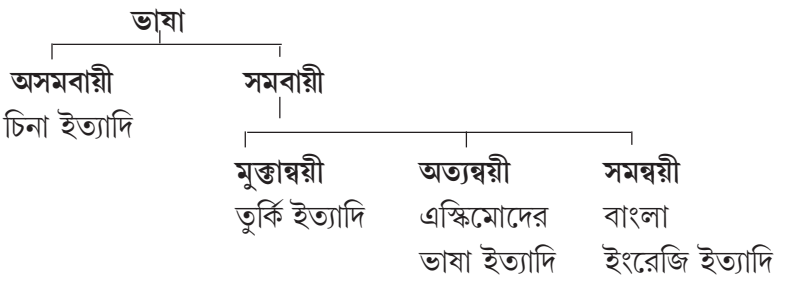

আবার সংস্কৃত, বাংলা, লাতিন, ইংরেজি, আরবি প্রভৃতি বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ প্রধান ভাষাতে দেখা যায় যে প্রত্যয়-বিভক্তি, উপসর্গ প্রভৃতি সম্পর্কজ্ঞাপক চিহ্নগুলি এমনভাবে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় যে আলাদা অস্তিত্ব থাকে না। এই ধরনটিকে বলা হয় সমন্বয়ী (Inflectional/Synthetic) বর্গ।

গোত্র বা বংশানুযায়ী বিভাগ :

বর্তমান পৃথিবীর ভাষাগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি ভাষায় এমন কিছু সাদৃশ্য আছে, যা থেকে ভাষাবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে সেইসব ভাষাগুলি অতীতে কোনো একটি ভাষা থেকেই এসেছে। অতীতের সেই ভাষাগুলির কথা মাথায় রেখে একেকটি ভাষাবংশের নামকরণ করা হয়। একই বংশজাত ভাষাগুলিকে বলা হয় সমগোত্রজ (Cognate) ভাষা।

এরকম প্রায় ২৫/২৬টি ভাষা পরিবারে বর্গীভূত হয়েছে পৃথিবীর বেশিরভাগ ভাষাই। যে ভাষাগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি, সেগুলিকে 'অগোষ্ঠীভূত ভাষা' বলা হয়। যাই হোক, যেসব ভাষাবংশ ছড়িয়ে আছে পৃথিবী জুড়ে, সেগুলির মধ্যে প্রধান বংশগুলি হল : ১. ইন্দো-ইউরোপীয়, ২. সেমীয়-হামীয় ৩. বান্টু ৪. ফিনো-উগ্রীয় বা উরালীয় ৫. তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু বা আলতাইক ৬. ককেশীয় ৭. দ্রাবিড় ৮. অস্ট্রিক ৯. ভোট-চিনীয় ১০. প্রাচীন এশীয় ১১. এসকিমো, ১২. আমেরিকার আদিম ভাষাসমূহ ইত্যাদি।

এই বংশগুলির মধ্যে বৃহত্তম ইন্দো-ইউরোপীয়* ভাষাবংশ। ইউরোপের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে পুবে ভারত পর্যন্ত যতগুলি দেশ, তার বেশিরভাগ ভাষাই এই ইন্দো-ইউরোপীয় জাত। ইতালীয়, গ্রিক, তিউনিশীয়, কেলতীয়, তোখারীয়, আলবেনীয়, বালতো-স্লাভীয়, আরমেনীয় এবং ইন্দো-ইরানীয়— মোট নটি ভাষাগোষ্ঠী এর অন্তর্ভুক্ত।

---

* ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার পাশাপাশি আরেকটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়, যার নাম হিট্টি, বা হিট্টাইট। এই দুই শাখার পূর্ববর্তী নাম ইন্দো-হিট্টি। কিন্তু হিট্টাইটের তেমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি, তাই এ বংশের নাম ইন্দো-ইউরোপীয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুরঃকণ্ঠ্যস্পৃষ্ট ধ্বনি পরবর্তী রূপান্তরের উপর ভিত্তি করে এই বংশের ভাষাগুলিকে দুটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে : কেন্তুম্ ও সতম্।

এই বংশের নাম 'ইন্দো-ইউরোপীয়' থেকে এ কথা মনে হতে পারে যে ইউরোপ ও ভারতের মধ্যেই এই বংশের ভাষাগুলি সীমাবদ্ধ, কিন্তু বাস্তবে আফ্রিকা, আমেরিকা এবং এশিয়া মহাদেশেরও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে এ বংশের ভাষাগুলি। ইউরোপের ঐতিহ্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য গ্রিক ভাষা; হোমারের দুটি মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডিসি এই ভাষাতেই রচিত। ক্রিট দ্বীপে প্রাপ্ত গ্রিক ভাষার নিদর্শনটি প্রায় ১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। ইতালীয় শাখার প্রধান ভাষা ল্যাটিন যা রোম সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির নিদর্শন। ইতালীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ফরাসি ভাষা ফ্রান্স ছাড়াও বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড ও কানাডায় প্রচলিত। স্প্যানিশ বলা হয় স্পেন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য ও উত্তর আমেরিকায়। এছাড়াও ইতালিয়ান, পর্তুগিজ ইত্যাদি ভাষা ইতালীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তিউনিশীয় বা জার্মানিক শাখা থেকে এসেছে ইউরোপের বেশ কয়েকটি প্রধান ভাষা। জার্মানিক শাখার উত্তর জার্মানিক উপশাখা থেকে এসেছে সুইডেনের ভাষা সুইডিশ; পশ্চিম জার্মানিক থেকে ডাচ্, ফ্লেমিশ, জার্মান এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা ইংরেজি ভাষা। কেলতিক ভাষাগুলির মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে সমৃদ্ধ আয়ারল্যান্ডের ভাষা আইরিশ। বালতো-শ্লাভিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলি হল লিথুয়ানিয়ার ভাষা, বুলগেরিয়ার বুলগেরীয়, চেক, শ্লোভাক, পোলিশ ও রুশভাষা। এশিয়া মাইনর ও ককেশাস অঞ্চলে প্রচলিত আরমেনীয় এবং মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত তোখারীয়। ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়—একটি শাখা 'ইরানীয় আর্য' হিসেবে ইরানে প্রবেশ করে, অন্যটি 'ভারতীয় আর্য' নামে চলে আসে ভারতে।

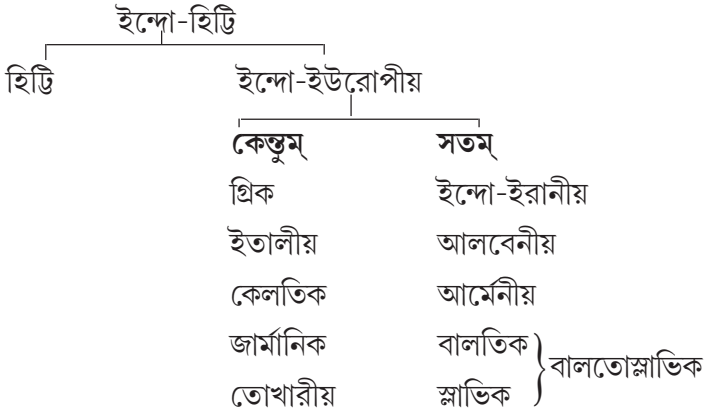

ইরানীয় শাখাটি বিস্তারলাভ করে প্রায় সমগ্র প্রাচীন পারস্য জুড়ে—এলম আর মেসোপটেমিয়ার পুব দিক থেকে ব্যাকট্রিয়া পর্যন্ত। ইরানীয় শাখা থেকে ক্রমে জন্ম নেয় দুটি প্রাচীন ভাষা—আবেস্তীয় এবং প্রাচীন পারসিক। জরথুস্ট্রীয় মতাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ্ আবেস্তা'র ভাষা আবেস্তীয় ভাষার উদাহরণ। ইরানীয় শাখারও প্রাচীনতম নিদর্শন এই 'জেন্দ্ আবেস্তা'। প্রাচীন পারসিক থেকে মধ্যযুগে পহ্লবী ভাষা ও তা থেকে আধুনিক ফারসি ভাষার জন্ম হয়। এই ইরানীয় বংশের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক সদস্য হল, আফগানিস্তানের পুশ্তু আর বেলুচিস্তানের বেলুচি।

ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের যে শাখাটি ভারতে প্রবেশ করে 'ভারতীয় আর্য' নামে, এবং যে শাখা থেকে কালক্রমে জন্ম নেয় বর্তমান ভারতের প্রধান প্রধান ভাষা এমনকি বাংলাও, সেই ভারতীয় আর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা করব 'ভারতের ভাষাপরিবার ও বাংলাভাষা' অধ্যায়ে।

সেমীয়-হামীয় ভাষাবংশের দুটি উল্লেখযোগ্য ভাষা—হিব্রু ও আরবি। সেমীয় থেকে উদ্ভুত হিব্রু ভাষায় রচিত বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট। ইজরায়েল দেশের সরকারি ভাষা আধুনিক হিব্রু। আরবি ভাষাও ছড়িয়ে পড়েছে আরব থেকে উত্তর আফ্রিকা এবং পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে। হামীয় শাখার ঐতিহ্যপূর্ণ মিশরীয় ভাষা এখন লুপ্ত। তবে উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়া ও সাহারা অঞ্চলে তমশেক্, কাবিল ভাষা ইত্যাদি এবং ইথিওপিয়া ও সোমালিল্যান্ডে হামীয় শাখার সন্ততিরা রয়ে গেছে।

সেমীয়-হামীয় ভাষাবংশের বাইরে আফ্রিকার সব ভাষাগোষ্ঠীকে 'বান্টু' নামে অভিহিত করা হলেও মূলত দুটি ভাষাগোষ্ঠী দেখা যায়, নাইজার-কঙ্গো পরিবার এবং চারিনিল পরিবার। 'নাইজার-কঙ্গো' পরিবারের প্রচুর সংখ্যক ভাষার মধ্যে সোয়াহিলি, কঙ্গো, নিয়াঞ্জা, লুবা, জুলু ভাষা উল্লেখযোগ্য। নীল নদীর উত্তর দিকে চারিনিল পরিবারের দিন্কা, মাসাই, মোরু, নুবা ভাষাগুলি প্রচলিত। এছাড়াও আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে পিগমিদের ভাষাগুলি হটেনটট্-বুশ্ম্যান বংশের অন্তর্ভুক্ত।

ইউরোপে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের মতো রয়ে গেছে ফিনো-উগ্রীয় ভাষাবংশ। হাঙ্গেরির ভাষা মজর বা হাঙ্গেরীয়, ফিনল্যান্ডের ভাষা ফিনিস, এস্তোনিয়ার ভাষা এস্তোনীয়, সাইবেরিয়ার মরু অঞ্চলে সাময়েদ, অব উগ্রিক ভাষা ফিনো-উগ্রীয় বা উরাল ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত। রাশিয়ার পার্বত্য অঞ্চল ককেশাস অঞ্চলের বেশ কয়েকটি ভাষা ককেশীয় বংশের, যার মধ্যে জর্জীয় ভাষা উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকা মহাদেশে এত ভাষা ও তার বৈচিত্র্য, যে ভাষাতাত্ত্বিকেরা স্পষ্টতই কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেননি। আমরা প্রথমে উত্তর আমেরিকার কথায় আসি। উত্তর আমেরিকার প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ মায়া ও আজতেক সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে পাওয়া গেছে প্রচুর লিখিত উপাদান। এখনও আমেরিকার কোনো কোনো অঞ্চলে পাওয়া যায় এই মায়া ভাষা। আর আজকের সভ্যতার ভাষা উটো আজতেক বংশের। এছাড়া আলগনকিয়াক (উত্তর আমেরিকার পূর্ব অংশে), ইরোকুইস আথাবাস্কান, হাইডা, সিয়োস্ক, আলজিক ইত্যাদি।

দক্ষিণ আমেরিকায় মায়া ও আজতেক সভ্যতার মতো ছিল আরেকটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা, ইনকা। ইনকারা যে 'কিচুয়া' ভাষা ব্যবহার করত, তা ইনকা সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকার আরেকটি বিখ্যাত ভাষাবংশ আরাওয়াক—এই বংশের ভাষাগুলি ছড়িয়ে পড়ে অ্যানটিলিশ দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত। এছাড়া ক্যারিব, তুপি-গুয়ারানি, তাকানান ইত্যাদি ভাষাগোষ্ঠীর কথা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এস্কিমো-আলেউট পরিবার উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা উভয় মহাদেশেই প্রচলিত।

এই এস্কিমো-আলেউট অবশ্য প্রধানত দেখতে পাওয়া যায় উত্তর মেরুর সীমান্ত অঞ্চলে।

অবর্গীভূত ভাষা :

এতগুলি ভাষা পরিবারের যে কথা বলা হল, এর বাইরেও কিন্তু রয়ে গেছে অনেকগুলি ভাষা। এইসব ভাষাকে কোনো সূত্রেই বর্গীভূত করা সম্ভব হয়নি। কারণ এই ভাষাগুলির মধ্যে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার সাদৃশ্য পাওয়া যায়নি, বা কিছু পাওয়া গেলেও এমন কোনো ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ বা সূত্র স্থাপন করা যায়নি, যার মাধ্যমে বংশ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এই ভাষাগুলিকে তাই অবর্গীভূত বা অশ্রেণিবদ্ধ ভাষা বা Unclassified Language বলে। জাপানি, কোরীয়, বাস্ক ইত্যাদি হল অবর্গীভূত ভাষার উদাহরণ। জাপানি ভাষা এবং কোরীয় ভাষাকে অনেকে আলতাই গোষ্ঠীভুক্ত করতে চেয়েছেন। আলতাই গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য ভাষার সঙ্গে এই দুই ভাষার

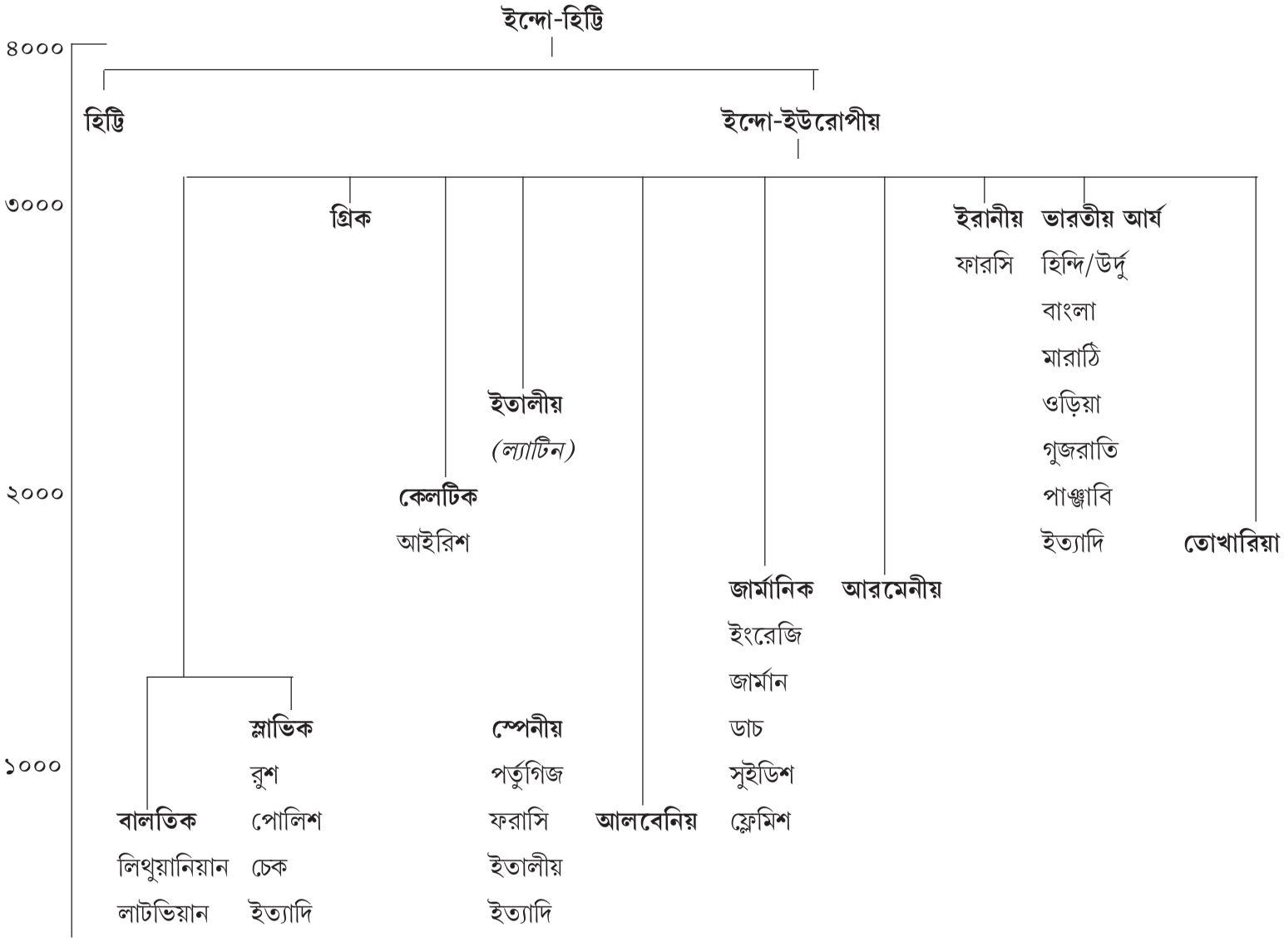
ইন্দো-হিট্টি
৪০০০
হিট্টি
ইন্দো-ইউরোপীয়
৩০০০
গ্রিক
ইরানীয়
ফারসি
ভারতীয় আর্য
হিন্দি/উর্দু
বাংলা
মারাঠি
ওড়িয়া
গুজরাতি
পাঞ্জাবি
ইত্যাদি
ইতালীয়
(ল্যাটিন)
কেলটিক
আইরিশ
২০০০
তোখারিয়া
জার্মানিক
ইংরেজি
জার্মান
ডাচ
সুইডিশ
ফ্লেমিশ
আরমেনীয়
স্লাভিক
রুশ
পোলিশ
চেক
ইত্যাদি
স্পেনীয়
পর্তুগিজ
ফরাসি
ইতালীয়
ইত্যাদি
১০০০
বালতিক
লিথুয়ানিয়ান
লাটভিয়ান
আলবেনিয়

সাদৃশ্য যেমন আছে, বৈসাদৃশ্যও তেমনি অনেক। তাই এই অভিমত গ্রহণ করা যায় না। জাপানি ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলেও তাতে চিনা সংস্কৃতি, ভাষা ও লিপির প্রভাব লক্ষ করা যায়। কোরীয় ভাষার ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী মোঙ্গল-মাঞ্চু ভাষার প্রভাব আছে এবং কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের পর সেখানেও চিনা ভাষার প্রভাব পড়ে। পিরেনিজ পর্বতমালার পশ্চিমে ফ্রান্স ও স্পেনে বাস্ক ভাষা প্রচলিত। ফিনো-উগ্রীয় ভাষাবংশের সঙ্গে আপাতসাদৃশ্য থাকলেও কোনো নির্দিষ্ট ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ভারতীয় উপমহাদেশে কয়েকটি অবর্গীভূত ভাষা পাওয়া যায়। ভাষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেছেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বুরুশাস্‌কি বা খজুনা, আন্দামানে প্রচলিত আন্দামানি, মায়ানমারের করেন্ ও মন্ এই ধরনের ভাষা।

এতক্ষণ যত ভাষার কথা বলা হল, বর্গীভূতই হোক বা অবর্গীভূত, এ সবই স্বাভাবিক ভাষা। কিন্তু পৃথিবীর নানা স্থানে এমন ভাষারও সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলিকে ঠিক স্বাভাবিক ভাষা বলা যায় না। এই অস্বাভাবিক ভাষাগুলির জন্ম স্বাভাবিক ভাষারই মিশ্রণে। এই অস্বাভাবিক ভাষার উদাহরণ হল মিশ্র ভাষা এবং কৃত্রিম ভাষা।

মিশ্র ভাষা :

নানা কারণে একাধিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ যদি কোনো এক বিশেষ অঞ্চলে এসে জড়ো হয়, তখন সেই দুই বা তার বেশি ভাষার মধ্যে মিশ্রণ ঘটে, এবং এক মিশ্র ভাষার জন্ম হয়। এই মিশ্র ভাষায় একাধিক ভাষার ভাষিক উপাদান পাশাপাশি বজায় থাকে, তবে উন্নত ভাষার প্রাধান্য দেখা দিতে পারে। এই ধরনের ভাষায় ব্যাকরণের কোনো সুষ্ঠু নিয়ম বজায় থাকে না। কোনো একটি ভাষার নিয়ম সরাসরি ব্যবহৃত হয়। শব্দের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। মিশ্র ভাষার শব্দভাণ্ডার সীমিত এবং এই ভাষাগুলি সাধারণত কথ্যরূপেই বেশি ব্যবহৃত হয়, লিখিত সাহিত্যের বিকাশের সম্ভাবনা কম থাকে।

ভাষাবিজ্ঞানীরা এই মিশ্র ভাষার ক্ষেত্রে দুটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেন: ১. পিজিন (Pidgin) ও ২. ক্রেওল (Creole)। পিজিন প্রধানত ইউরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশ বিস্তারের ফল। 'পিজিন ইংলিশের পিজিন শব্দটি এসেছে ইংরেজি বিজ্‌নেস শব্দের চিনীয় উচ্চারণ থেকে।'* আসলে ব্যাবসার কারণেই দুটি ভাষা কাছাকাছি আসে এবং মিশে যায়। এর ফলে পিজিন দীর্ঘস্থায়ী নয়। যেখানে ইংরেজরা ব্যাবসার জন্য গেছে, সেখানে 'পিজিন ইংলিশ'-এর উদ্ভব হয়েছে, তেমনি ফরাসিরা গেলে সেখানে জন্ম নিয়েছে 'ফ্রেঞ্চ পিজিন'।

পিজিন সবসময়ই সংযোগ-সংস্পর্শের ফলে উদ্ভূত ভাষা, কখনোই মাতৃভাষা নয়। কাছাকাছি-আসা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পিজিন ভাষাটি লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন ভিয়েতনামে ব্যবহৃত ফরাসি-পিজিন লোপ পেয়েছে, লোপ পেয়েছে পিজিন-ইংরেজিও। কিন্তু কোনো পিজিন যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে কোনো গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পরিণত হয় তখন তা হয়ে যায় ক্রেওল। সেক্ষেত্রে পিজিনের সীমিত শব্দভাণ্ডার ক্রমশ সুগঠিত হয়, তৈরি হয় নির্দিষ্ট ব্যাকরণ। গড়ে ওঠার এই প্রক্রিয়াকে বলে Creolization। ক্রেওল পিজিন থেকেই তৈরি হয়, ক্রেওল পিজিনেরই পরিণতি বা বিকাশ।

প্রাচীন মিশ্র ভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিচ-লা-মার, পিজিন-ইংরেজি, মরিশাস ক্রেওল এবং চিনুক। এর মধ্যে পিজিন-ইংরেজি-র কথা আগেই বলেছি। চিনের উপকূল বন্দরে, জাপানে পিজিন-ইংরেজির প্রচলন ছিল।

* অনিমেষ কান্তি পাল, ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা, প্রজ্ঞাবিকাশ

বিচ-লা-মার হল ইংরেজি ভাষার সঙ্গে স্পেনীয় ও পর্তুগিজ ভাষার মিশ্রণ। বিচ-লা-মার ব্যবহৃত হত পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। ভারত মহাসাগরের মরিশাস দ্বীপে ভাষা-মিশ্রণের দারুণ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। প্রথমে এই দ্বীপটি ফরাসিদের অধিকারে আসে। পরে শ্রমিক হিসেবে আসে মাদাগাসকার দ্বীপের মানুষ। প্রধানত ফরাসি ভাষার সঙ্গে মিশে যায় মাদাগাসকার ভাষা। এরপরে আখচাষের জন্য আসে ভারত থেকে প্রচুর শ্রমিক। ফরাসি ও মাদাগাসকারি ভাষার মিশ্রণে তৈরি হয়েছিল মরিশাস ক্রেওল। পরে মরিশাস ক্রেওলে ঢুকে পড়ে অন্য ভাষার শব্দ। অষ্টাদশ শতকে উত্তর আমেরিকার ওরেগন অঞ্চলে জন্ম হয়েছিল চিনুক-এর। কয়েকটি আদিম আমেরিকার ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ফরাসি এবং ইংরেজি শব্দ।

কৃত্রিম ভাষা :

সারা পৃথিবীতে প্রচলিত এতগুলি ভাষা সমস্ত মানুষের পক্ষে মনের ভাব আদানপ্রদানের পরিপন্থী। সেইজন্য এক জায়গার মানুষ পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গেলে তাকে শিখতে হয় মাতৃভাষা ছাড়াও বেশ কয়েকটি ভাষা। ভাষার এই বিভিন্নতার জন্যই রয়ে গেছে মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ, মানসিক দূরত্ব। এই নিয়ে একটি গল্প আছে বাইবেলে। মানুষ এমন একটি মিনার তৈরি করেছিল যা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছিল দেবতাদের বাসভূমি স্বর্গকে। এতে দেবতারা বিপন্নবোধ করেন এবং এমন একটি কৌশল তাঁরা নেন যাতে এই মিনার তৈরি ভেস্তে যায়। একদিন দেখা গেল যাঁরা মিনার তৈরি করেছিলেন তাঁরা কেউই একে অপরের ভাষা বুঝতে পারছেন না। শেষপর্যন্ত সত্যিই ভেস্তে গেল মিনার তৈরি। এই গল্প থেকে বোঝা যায় ভাষার পার্থক্যে কীভাবে বিচ্ছিন্নতা নেমে আসে মানুষের মধ্যে। এই বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে ঐক্যের সন্ধানেই কৃত্রিম ভাষা তৈরির কথা বলেছিলেন দার্শনিক রেনে দেকার্ত, ফ্রান্সিস বেকন, জন উইলকিন্স। উনিশ শতকে যোহান মার্টিন শ্লেইয়ার 'ভোলাপুক' নামে একটি কৃত্রিম ভাষা তৈরি করেন। শ্লেইয়ারের এই বিশ্বভাষা নির্মাণের কথা মাথায় আসে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। একজন জার্মান কৃষকের ছেলে আমেরিকায় চলে যায় এবং সেখানে জীবিকানির্বাহ করতে থাকে। এদিকে এই কৃষক হঠাৎই পড়ে যায় চরম অর্থসংকটে। সে যতই ছেলেকে চিঠি লেখে, ছেলের থেকে কিন্তু কোনো উত্তর আসে না। আসলে আমেরিকার ডাকবিভাগের লোকেরা জার্মান কৃষকের লেখা পড়তে পারে না, বুঝতে পারে না। ফলে কোনো চিঠিই পৌঁছায়নি তার ছেলের কাছে। এই ঘটনা শুনে শ্লেইয়ারের মনে হয়, এমন এক বিশ্বজনীন বর্ণমালা প্রয়োজন যা সমস্ত পৃথিবীতে ব্যবহারযোগ্য হবে।

১৮৮৭ সালে পোল্যান্ডের চক্ষুচিকিৎসক এল. এল. জামেনহফ আরেকটি কৃত্রিম ভাষা তৈরি করেন। রুশ ভাষায় তিনি যে প্রস্তাবটি লেখেন সেখানে তিনি ব্যবহার করেন ছদ্মনাম Doktoro Esperanto,যার অর্থ Doctor Hopeful। এই নাম থেকেই তাঁর প্রস্তাবিত বিশ্বভাষার নাম হয় এসপেরান্তো।

বর্তমান পৃথিবীতে কুড়ি লক্ষ মানুষ এই ভাষায় কথা বলতে পারে, যার মধ্যে প্রায় এক হাজার লোকের মাতৃভাষা এসপেরান্তো। জামেনহফ প্রধানত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির উপর ভিত্তি করেই এই এসপেরান্তো ভাষা গড়ে তোলেন। ধ্বনির ক্ষেত্রে স্লাভ এবং রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রে রোমান ও জার্মানিক ভাষাগুলির প্রভাব পড়েছে। এসপেরান্তোর সুবিধে হল এর শব্দগুলি উচ্চারিত হয় উচ্চারণ অনুযায়ী। এর ব্যাকরণও সহজ, মাত্র ১৬টি সূত্রের মাধ্যমে এই ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব। এই ভাষায় ২৩টি ব্যঞ্জনধ্বনি, ৫টি স্বরধ্বনি, ২টি অর্ধস্বর এবং ৬টি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে। ৯২১টি শব্দমূলের সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয়/বিভক্তি যোগ করে শব্দ তৈরি হয়। এ ভাষায় শব্দসংখ্যা ৬০০০-এরও বেশি।

কয়েকটি এসপেরান্তো শব্দ উদাহরণ হিসেবে নীচে দেওয়া হল—

English	**Esperanto**
Hello	Saluton
Yes	Jes
No	Ne
Good morning	Bonan matenon
Good night	Bonan nokton
Please	Bonvolu
What is your name?	Kio estas via nomo?
I love you	Mi amas vin
Thank you	Dankon

এসপেরান্তো-কে সংস্কার করতে চেয়ে আরও বেশ কয়েকটি কৃত্রিম বিশ্বভাষার জন্ম হয়েছিল, যেমন Ido, Occidental, Novial, Interglosa (পরবর্তীকালে যা Glosa), Interlingua ইত্যাদি। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ওটো ইয়েসপারসন-এর চিন্তার ফসল Novial, যেটি আবার গড়ে উঠেছিল Esperanto, Ido ও Occidntal-এর নানান বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণে। কিন্তু এ ভাষাগুলি কোনোটাই ছাপ ফেলতে পারেনি জনমানসে এবং দ্রুতই হারিয়ে গেছে।

এই রকম ভাষা ব্যবহার না করেও মানুষ নানাভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে। মাথা নাড়িয়ে 'হ্যাঁ' বা 'না' তো আমরা প্রায়ই বলে থাকি। কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে কেবলমাত্র চোখের সাহায্যেও এভাবে ভাষা চালাচালি সম্ভব। মাথা, হাত, চোখ প্রভৃতি অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে এই যে ভাষা ব্যবহার, একে ভাষাতাত্ত্বিকেরা নাম দিয়েছেন Para Language। এই ধরনের ভাষাকে নির্ভর করেই মূলত মূক ও বধির মানুষদের জন্য তৈরি হলো এক বিশেষ সাংকেতিক ভাষা Sign Language। ১৭৭৫ সালে ফরাসি শিক্ষাবিদ Abbe′ Charles Michel de I'Epe′e প্রথম এই ধরনের ভাষা উদ্ভাবন করেন। এরপর Thomas Gallandet, Laurent Clerc, Richard Paget, Pierre Gorman প্রমুখ শিক্ষাবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রচেষ্টায় বর্তমানে Sign Language বিশ্বজুড়ে একটি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। যখন কোনো সাংকেতিক ভাষা বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠে তখন কথ্যভাষার মতোই তার মধ্যেও নানা ভাষাবৈচিত্র্য তৈরি হতে পারে, এমনকি নতুন সাংকেতিক ভাষাও তৈরি হতে পারে। শুধু তাই নয়, কথ্য ও লিখিত ভাষার প্রভাবও পড়তে পারে এই ভাষায়, এমনকি তৈরি হতে পারে পিজিনও।

Sign Language-গুলির মধ্যে অন্যতম Paget-Gorman পদ্ধতি। প্রায় ৩,০০০ সংকেত-সমন্বিত এই ভাষায় 'ক্রিয়া', 'পশু', 'রং', 'আধার', 'খাদ্য' প্রভৃতি কতগুলি মৌলিক বিষয়ভিত্তিক কিছু সংকেত রয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলির বিভিন্ন শব্দ বোঝানোর জন্য সেই বিশেষ মৌলিক সংকেতটির সঙ্গে আরও একটি চিহ্ন জুড়ে শব্দটি বোঝানো সম্ভব। যেমন, 'নীল'-শব্দটি বোঝাতে একটি হাতে 'রং'-সূচক সংকেতটি দেখিয়ে অন্য হাতে আকাশ চিহ্নিত করে বোঝানো হয় নীল রং।

British

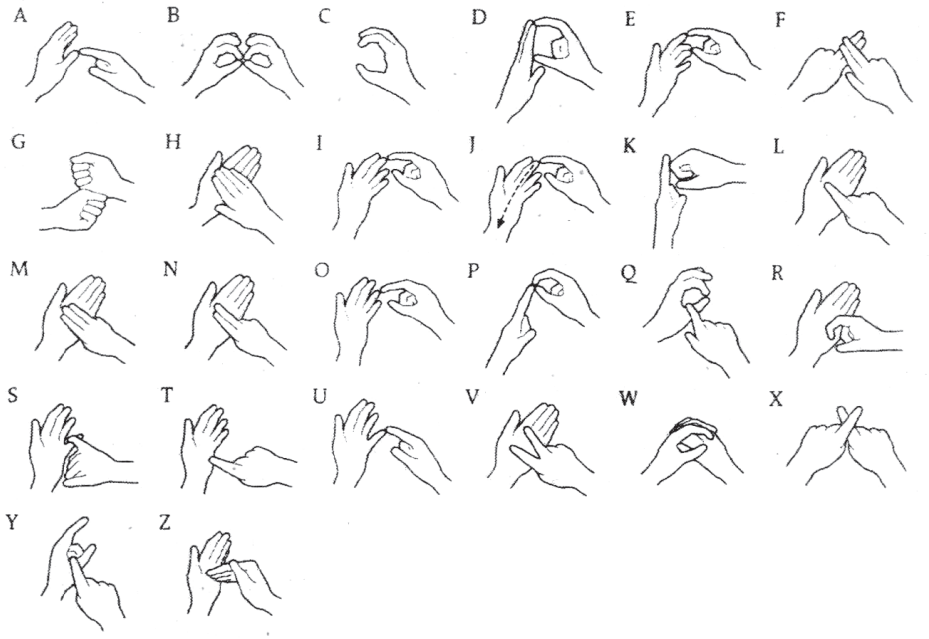

American

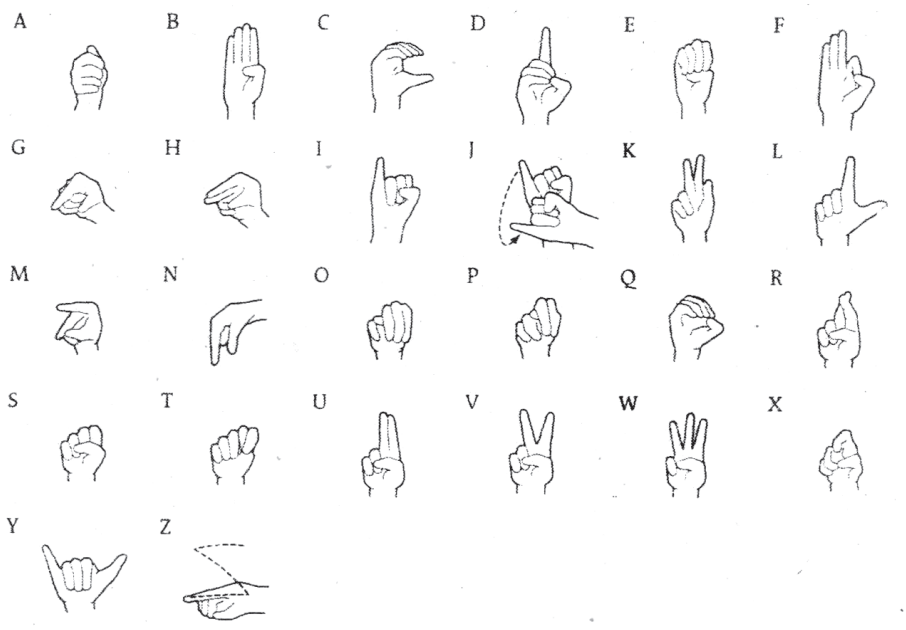

* কৃতজ্ঞতা : ডেভিড ক্রিস্টালের 'হাউ দ্য ল্যাংগুয়েজ ওয়ার্কস্

উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে 'আমের-ইন্দ' নামের একটি এই ধরনের ভাষা দীর্ঘকাল ধরেই প্রচলিত ছিল। Madge Skelly এই পদ্ধতিটিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই পদ্ধতিকে সাধারণভাবে বলা হয় 'hand-talk' বা হাত দিয়ে কথা বলা পদ্ধতি।

তবে এ ধরনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় হল আঙুল দিয়ে বানান করে শব্দ বোঝানোর পদ্ধতি। একে ইংরাজিতে বলে finger spelling বা Dactylology। এই পদ্ধতিতে সাধারণ বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণের জন্য একটি করে পৃথক চিহ্ন বা হাতের মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। ব্রিটিশরা এক্ষেত্রে দুটি হাত ব্যবহার করেন, আমেরিকান বা সুইডিশ পদ্ধতিতে আবার একটি হাতই ব্যবহার করা হয়। এর সুবিধে অনেক।

Paget-Gorman পদ্ধতিতে অনেক শব্দই বোঝানো যায় না। স্থান বা নারীপুরুষ বোঝানো সম্ভব হলেও 'বেলপাহাড়ি' বা 'সুচিত্রা সেন' শব্দ দুটি এই পদ্ধতিতে বোঝানো যাবে না। finger spelling পদ্ধতিতে কিন্তু তা সহজেই বোঝানো যেতে পারে। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান পদ্ধতির তুলনামূলক দুটি ছবি থেকে বিষয়টি সবজেই বুঝতে পারবে। তবে এ পদ্ধতির সমস্যা হল, নিরক্ষর মানুষ বা শিশুরা এ ভাষা বুঝবে না। এই সমস্যা দূর করতে Rochester পদ্ধতিতে এখন মৌখিক ভাষা এবং আঙুল দিয়ে বানান করা—একই সঙ্গে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের ভাষাপরিবার ও বাংলা ভাষা

ভাষাগত দিক থেকে ভারত সম্বন্ধে দুটি অভিধা খুব প্রচলিত—এক, 'ভারত ভাষার অরণ্য' এবং দুই, 'ভারত চার ভাষাবংশের দেশ'।

ভারত যে ভাষার অরণ্য এ কথা উঠে এসেছিল বিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে ইংরেজদের করা 'ভাষাসমীক্ষা'র ফলাফলের নিরিখে। Linguistic Survey of India 1903-1928 অনুসারে ভারতে '১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি উপভাষা' প্রচলিত ছিল। এই গুরুতর কাজের মূল সম্পাদক ছিলেন জর্জ গ্রিয়ার্সন। এ কথা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত যে এই সমীক্ষা পদ্ধতিগতভাবে ত্রুটিমুক্ত ছিল না, কিন্তু তাই বলে সেই সমীক্ষাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ১৯৬১ সালের জনসমীক্ষাতেও দেখা যাচ্ছে মাতৃভাষার সংখ্যা প্রায় ১৬৫২টি।

এর মধ্যে অবর্গীভূত ভাষার সংখ্যা ৫৩০টি এবং অভারতীয় সংখ্যা ১০৩টি। বাকি সব ভাষাগুলি আসলে চারটি ভাষাবংশের অন্তর্গত। ইন্দো-ইউরোপীয়, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচিনা।

'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' অংশে বলা হয়েছে নৃতাত্ত্বিকদের মতে ভারতীয় জনসমূহের প্রাচীনতম স্তর নিগ্রোবটু বা নেগ্রিটো। এঁদের কিছু বংশধরদের সন্ধান মেলে দক্ষিণ ভারতে, পূর্ব ভারতের অঙ্গামি নাগা ও আন্দামানের কয়েকটি জনজাতির মধ্যে। নৃবিজ্ঞানে মাপজোকের যে পদ্ধতি আছে তাতে হয়তো নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জনগোষ্ঠীর হদিশ পাওয়া গেছে, কিন্তু ভাষার দিক থেকে এরকম কোনো চিহ্ন এ দেশে পাওয়া যায় না (কেবল 'বাদুড়' শব্দটিতে পণ্ডিতেরা কিছু সেরূপ চিহ্ন দেখতে পান।—ভারতের ভাষা, গোপাল হালদার)।

অস্ট্রিক ভাষাবংশ :

এরপরেই এসে থাকবে Proto-Australoid বা প্রত্ন-অস্ত্রালরা। এঁদের ভাষার নাম 'অস্ট্রিক'। বর্তমান ভারতের প্রায় ৬৫টি ভাষা এই ভাষাবংশজাত। কিন্তু সংখ্যা দিয়ে এই বংশের গুরুত্ব বিচার করলে ভুল হবে, কারণ এই ভাষাবর্গের গুরুত্ব ও গৌরব প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনত্বের এক দৃঢ়মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অস্ট্রিক ভাষাবংশ ভারতের প্রাচীনতম ভাষাগোষ্ঠী। প্রাচীনতম বলেই এবং বর্তমানে বিচ্ছিন্ন হলেও সারা ভারত জুড়েই অস্ট্রিক ভাষাবংশের বংশধরেরা ছড়িয়ে আছে। 'অস্ট্রিক' ভাষাবংশের বংশলতিকাটি হল—

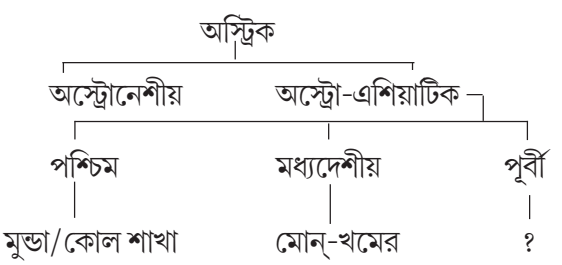

অস্ট্রিক ভাষা শুধু ভারতেই নয়, এর বিস্তার ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশেও। অস্ট্রিক ভাষার দুটি শাখা—১. অস্ট্রোনেশীয় এবং ২. অস্ট্রো-এশিয়াটিক। অস্ট্রোনেশীয় শাখাটিই মূলত ছড়িয়ে গেছে ভারতের বাইরে। যেমন—(ক)

ইন্দোনেশিয়ার নানা ভাষা, এর মধ্যে 'মালয়' প্রধান। (খ) মেলানেশীয় ভাষাগোষ্ঠী, যেগুলি দেখা যায় ফিজি প্রভৃতি দ্বীপে। (গ) ক্যারোলাইন প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের ভাষা যেগুলি মাইক্রোনেশিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং (ঘ) পলিনেশীয় ভাষা, যার মধ্যে সামোয়া, তাহিতি, হাওয়াই দ্বীপের আদিবাসীদের ভাষা।

ভারতের প্রচলিত অস্ট্রিক শাখাটি হল অস্ট্রো-এশিয়াটিক। ভারতের বাইরে উপরিউক্ত ভাষাগুলির সঙ্গে অর্থাৎ অস্ট্রোনেশীয় শাখার সঙ্গে অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখার ভাষাগুলির মধ্যে সার্ধম্য প্রথম তুলে ধরেন Eather W. Sehmidt।

অস্ট্রো-এশিয়াটিকের যে তিনটি ধারা ভারতে প্রচলিত বলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, (অর্থাৎ ক. পশ্চিমা, খ. মধ্যদেশীয় এবং গ. পূর্বী) তার মধ্যে পূর্বী ধারাটির অস্তিত্ব সংশয়ের ঊর্দ্ধে নয়। তাই আমরা অন্য দুটি ধারা নিয়ে এখানে আলোচনা করব।

অস্ট্রো-এশিয়াটিকের পশ্চিমা ধারাটি বৃহত্তম, প্রায় ৫৮টি ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত। শবর, কোরকু, খাড়িয়া, সাঁওতালি, মুন্ডারি, হো, ভূমিজ প্রভৃতি পশ্চিমা শাখার উল্লেখযোগ্য ভাষা; ওড়িয়া আর অন্ধ্রপ্রদেশে শবর/শোরা; মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে কোরকু; বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশে খাড়িয়া; বিহার পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় সাঁওতালি, মুন্ডারি; বিহার আর ওড়িশায় ভূমিজ, হো ভাষাভাষীর মানুষ দেখা যায়। এই ভাষাগুলির মধ্যেঅন্যতম প্রধান ভাষা হল সাঁওতালি/সান্তালি, এই ভাষার প্রায় দশ রকম ভাষাবৈচিত্র্যও দেখা যায়। সাঁওতালি ভাষার প্রধান কেন্দ্রস্থল সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুর। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে ঝাড়খণ্ড ও বিহারের পর এর প্রাধান্য পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায়। নরওয়ের মিশনারি পি.ও. বোর্ডিং-এর চেষ্টায় সাঁওতালি লোককথা ও পুরাণ সংকলিত হয়েছে। সাঁওতালি ভাষা লেখা হত বাংলা অথবা রোমক লিপিতে। বর্তমানে সাঁওতালি লিপি 'অলচিকি' গড়ে উঠেছে এবং এই লিপির উদ্ভাবক রঘুনাথ মুর্মু। মুন্ডারি ভাষাও মিশনারিদের উদ্যোগে ভাষাতাত্ত্বিক মর্যাদা লাভ করেছে। ফাদার হফম্যানের সম্পাদনায় ১৩ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে 'মুন্ডারি এনসাইক্লোপিডিয়া'।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই অস্ট্রিক ও আর্য ভাষার পারস্পরিক যোগাযোগের কারণে বেশ কিছু মুন্ডা শব্দ সংস্কৃত ভাষায় এসে যায়। পরবর্তীকালে এরকম কিছু শব্দ বাংলায়ও এসেছে। যেমন—কদলী, অলাবু, তাম্বুল ইত্যাদি। আবার 'দেশি' এবং 'অজ্ঞাতমূল' বলে চিহ্নিত বেশ কিছু শব্দ সরাসরি বাংলা ভাষার মধ্যেও গৃহীত হয়েছে। খোকা, খড়, ডাঙা, চিংড়ি, তোতলা প্রভৃতি এর উদাহরণ; এমনকি 'রত্ন' শব্দের ক্ষেত্রেও মূলে মুন্ডা প্রভাব আছে বলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন।

অস্ট্রো-এশিয়াটিকের আরেকটি শাখা মোন্-খমের, যার মধ্যে ৭টি ভাষা অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খাসি ভাষা। উত্তর-পূর্ব ভারতে খাসি-জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলে এই ভাষাভাষী মানুষের বাস। খাসি আগে লেখা হত বাংলা হরফে, এখন লেখা হয় রোমক লিপিতে। ভারতে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভোট-বর্মী ভাষাগুলির মধ্যে অস্ট্রো-এশিয়াটিক খাসি ভাষার অবস্থান নিঃসন্দেহে ভাষাবিজ্ঞানীদের কৌতুহল জাগায়। খাসি ভাষা ছাড়াও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নিকোবরি ভাষা মোন্-খমের শাখার অন্তর্ভুক্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা।

দ্রাবিড় ভাষাবংশ :

ভাষাভাষীর সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম হল দ্রাবিড় ভাষাবংশ। প্রত্ন-অস্ত্রালদের পর ভূমধ্যীয় জনগোষ্ঠী (Mediterranean) ভারতে প্রবেশ করে, যাদের ভাষার নাম দ্রাবিড়। বর্তমানে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে এঁদের একচ্ছত্র বিস্তার। কিন্তু প্রাক-আর্যযুগে এঁরা যে নাগরিক সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন, যার ধ্বংসাবশেষ হল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো, তা ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেই। আর্যদের আগমনের ফলে উত্তর ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এসে হাজির হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যে বর্তমানে দ্রাবিড় ভাষাই প্রধান, এ পরিবারের কিছু গৌণ ভাষা পূর্ব ও মধ্যভারতে প্রচলিত।

দ্রাবিড় ভাষাবংশের ভাষাগুলি যেভাবে বিভিন্ন শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হয়ে ভারতে রয়ে গেছে নীচের ছকের মাধ্যমে তা দেখানো হল ঃ

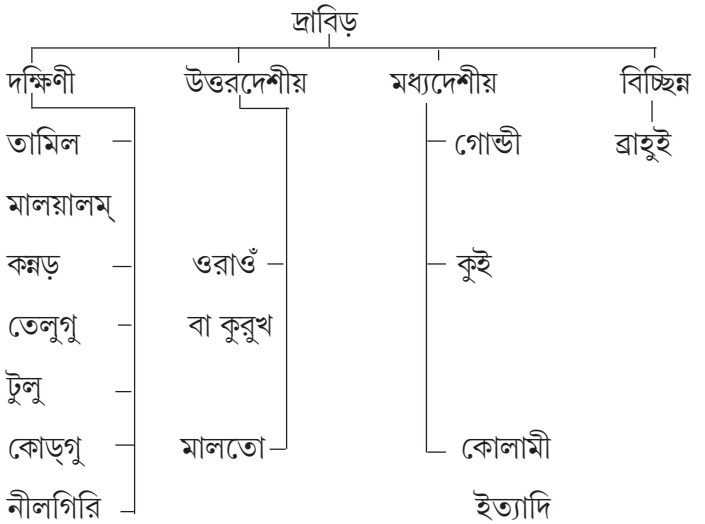

অনুমান করা হয় যে আর্যদের তাড়া খেয়ে দ্রাবিড়রা যখন দক্ষিণ দিকে চলে আসছিল, তখন একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিম দিকে চলে যায়। বর্তমানে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে 'ব্রাহুই' ভাষার চিহ্ন মেলে। এ ভাষার চিহ্ন ধরেই এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয় যে সিন্ধুসভ্যতা আসলে দ্রাবিড়ীয় সভ্যতাই।

একেবারে দক্ষিণে যে শাখাটি চলে এসেছিল, এমনকি হাজির হয়েছিল একেবারে সিংহলে, সেই দক্ষিণী শাখাটিই দ্রাবিড় ভাষাবংশের প্রধানতম শাখা। 'তামিল', 'তেলুগু' তামিলজাত 'মালয়ালম্', 'কন্নড়' দক্ষিণী শাখার উল্লেখযোগ্য ভাষার নিদর্শন। এছাড়াও নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চলে 'টোডা' ও 'কোটা' অতি অল্পসংখ্যক আদিবাসীর ভাষা, 'টুলু' মহীশূর এবং 'কেড্‌গু'ও মহীশূর ও মহীশূরের অন্তর্গত কুর্গ অঞ্চলের ভাষা।

'কুরখ' বা 'ওরাওঁ' এবং 'মালতো' বা 'মালপাহাড়ি' ভাষা উত্তরদেশীয় শাখার দুটি প্রধান ভাষা। বিহার-ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশের সীমান্ত অঞ্চলে ওরাওঁ ভাষা ব্যবহার করা হয়। বাংলা-ঝাড়খণ্ডের সীমান্ত রাজমহল পাহাড় সংলগ্ন অঞ্চলে মালতো বা মালপাহাড়ি ভাষা প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গেও ওরাওঁ ভাষায় কথা বলে এমন মানুষের

সংখ্যা যথেষ্ট।

মধ্যদেশীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত ভাষার সংখ্যা প্রায় সাতটি: গোণ্ডী, কোন্দ, কুই, খোন্দ, পরজি ইত্যাদি। গোণ্ডী ভাষা গোন্দ জনজাতির ভাষা হলেও মধ্যভারতের অনেকটা জুড়ে এর ব্যবহার এবং সর্বত্র অবিমিশ্রও থাকেনি। বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও মহারাষ্ট্রে এ ভাষা প্রচলিত। কুই, কোন্দ, খোন্দ এ সবগুলি ভাষাই দেখা যায় ওড়িশায়। এছাড়া 'খোন্দ' অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এমনকি আসামে, 'পরজি' ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় প্রচলিত।

ভারতে দ্রাবিড় ভাষাবংশের অন্তর্গত এতগুলি ভাষার মধ্যে প্রধান ভাষা চারটি: তামিল, মালয়ালাম্, তেলুগু এবং কন্নড়।

তামিলনাড়ু, কেরালা ও মহীশূরের বেশ কিছু অংশে তামিল ভাষা প্রচলিত। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ৬ কোটি ৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮১৪ জন তামিল ভাষা বলেন, বর্তমানে তামিল প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত (ক) সাহিত্যিক তামিল ও (খ) কথ্য তামিল। কথ্য তামিলের অঞ্চল অনুযায়ী অনেকগুলি ভাষা-বৈচিত্র দেখা যায়, যেমন (১) কন্যাকুমারী অঞ্চলের তামিল (২) তিরুনেলভেলি ও রামনাদ জেলা (৩) মাদুরাই ও ত্রিচি (৪) কোয়েম্বাটুর জেলা (৫) তাঞ্জোর ও দক্ষিণ আরকোট জেলা (৬) চেন্নাই শহর ও চেঙ্গলপেট (৭) উত্তর আরকোট জেলা ইত্যাদি। 'তামিল ভাষার ক্ষেত্রে সামাজিক উপভাষার বিভেদও ভাষাতাত্ত্বিকের কৌতূহল উদ্রেক করে। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, এমনকি ভাষাতাত্ত্বিক অবয়ব-গঠনেও ব্রাহ্মণ এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের ভাষার আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায়।'* তামিলের নিজস্ব লিপিটি প্রাচীন ব্রাহ্মীর দক্ষিণদেশীয় বিভেদ 'গ্রন্থিলিপি' থেকে বিবর্তিত। তামিল ভাষায় ব্যবহৃত স্বরবর্ণের সংখ্যা ১২টি (a, ā, i, ī u, ū, e, ē, o, ō, ai, au) এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ১৮টি। মহাপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ নেই। তামিল লিপিতে যুক্তব্যঞ্জনের কোনো ব্যবহার নেই।

মালয়ালম্ ভাষা সম্ভবত খ্রিস্টীয় ৯ম শতকে প্রাচীন তামিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং ত্রয়োদশ শতকে এর স্বাধীন আত্মপ্রকাশ ঘটে। কেরল ও লাক্ষাদ্বীপের প্রধান ভাষা। শংকরাচার্য কেরলের অধিবাসী হওয়ায় দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে মালয়ালামেই সংস্কৃত প্রভাব বেশি। মালয়ালাম্ ভাষার ঐতিহাসিক পর্বে বিবর্তনের তিনটি সুস্পষ্ট রীতি চোখে পড়ে—১. সংস্কৃতানুগ ২, তামিল প্রভাবপুষ্ট ৩. তামিল প্রভাববর্জিত খাঁটি মালয়ালম্। মালয়ালমের লিপি অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার মতোই ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত এবং এই ভাষায় যাবতীয় সংস্কৃত বর্ণমালা প্রচলিত। ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী ভারতে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩৯২ জন মালয়ালম্ ভাষায় কথা বলে।

কন্নড় ভাষা কর্ণাটক রাজ্যের প্রধান ভাষা হলেও কর্ণাটক রাজ্যের কাছাকাছি অন্যান্য রাজ্যের অংশগুলিতেও (যেমন মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র এবং কেরল) প্রচলিত। ২০০১-এর জনগণনা অনুসারে ভারতে কন্নড় বলেন প্রায়

---

* পরেশচন্দ্র মজুমদার, আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে, দে'জ

৩ কোটি ৭৯ লক্ষ ২৪ হাজার ১১ জন। কন্নড় ভাষা তামিল থেকে উদ্ভূত; প্রাচীনতম দ্রাবিড়ীয় শিলালিপি (৪০০ খ্রি,) কন্নড় ভাষাতেই লেখা হয়েছিল। সাহিত্যের ভাষা ও উচ্চবর্গের শিক্ষিতদের কন্নড় ভাষার সঙ্গে প্রচলিত কন্নড় ভাষার প্রভেদ বিরাট। কথ্যভাষার মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের শ্রেণিগত ও আঞ্চলিক বিভেদ। অঞ্চলভেদে অনেকগুলি ভাষা-বৈচিত্র্য দেখা যায়, যেমন-মহীশূর, চিত্রদুর্গা, ধারওয়ার, উত্তর কানাড়া, দক্ষিণ কানাড়া, হাসান, বেল্লারি, গুলবর্গা ইত্যাদি। এর মধ্যে মহীশূর এবং ধারওয়ার অঞ্চলে যে ভাষার রূপটি প্রচলিত, পৃথকভাবে এ দুটি রূপই আদর্শ ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। কন্নড় লিপি প্রতিবেশী তেলুগুর অনুরূপ। তামিল ভাষার সঙ্গে কন্নড়ের যোগ খুব বেশি হলেও লিপির ক্ষেত্রে যোগ তেলুগুর সঙ্গেই বেশি।

ভাষাভাষীর সংখ্যার দিক থেকে ভাষাবংশের মধ্যে ভারতে প্রথম স্থান তেলুগু ভাষার। ২০০১ সালের জনগণনায় দেখা গেছে ভারতে প্রায় ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ২ হাজার ৮৭৬ জন তেলুগু ভাষায় কথা বলে। তেলুগু ভাষার প্রচলনস্থান প্রধানত অন্ধ্রপ্রদেশ। জাতিবাচক 'অন্ধ্র' শব্দটি ভাষা অর্থেও ব্যবহৃত হত। পরে ভাষার নাম দাঁড়াল 'তেলেঙ্গ' এবং এই 'তেলেঙ্গ' থেকেই 'তেলুগু' শব্দটি এসেছে। তেলুগু ভাষার বৈচিত্র্য আঞ্চলিক ভেদে চার রকমের—শ্রীকাকুলম ও বিশাখাপত্তনম জেলা (উত্তরদেশীয়); কৃষ্ণ, গুন্টুর ও গোদাবরী জেলা (মধ্যদেশীয়); তেলেঙ্গানা জেলাগুলি অর্থাৎ আদিলাবাদ, করিমনগর, ওয়ারাঙ্গল, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি (পশ্চিমা); কোরমু, অন্তপুরম্, নেলোর ইত্যাদি (দক্ষিণদেশীয়)। এর মধ্যে মধ্যদেশীয় বৈচিত্র্যটি আদর্শ ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। তেলুগু লিপি কন্নড় লিপির সঙ্গে অভিন্ন। ব্রাহ্মী লিপির সন্ততি পল্লব লিপি থেকে খ্রিস্টীয় ১০০০ অব্দে তেলুগু লিপি বিশিষ্টতা অর্জন করে।

বৈদিক যুগ থেকেই দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্যদের মিশ্রণ শুরু হয়েছিল বলে ভাষার দিক থেকে পারস্পরিক প্রভাবের স্বরূপ অনেকটাই চিহ্নিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের বেশ কিছু শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে, যেমন ময়ূর, খাল, বিল ইত্যাদি; সংস্কৃত ভাষাতেও অণু, গণ, পুষ্প, পূজা, তন্ডুল প্রভৃতি শব্দ এসেছে এবং সেগুলি বর্তমানে তৎসম শব্দ হিসেবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত। বাংলায় পিলে, উলু, খাল, গুঁড়ি, জেলা প্রভৃতি শব্দ দ্রাবিড়জাত। ভারতীয় ধ্বনিমালায় মূর্ধণ্যধ্বনি প্রবর্তনের মূলেও যে দ্রাবিড় ভাষা, তা অনেক ভাষাতাত্ত্বিকই মনে করেন কারণ সুইডিশ ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মূর্ধণ্যধ্বনি নেই।

ভোটচিনা ভাষাবংশ :

নৃতাত্ত্বিকরা অনেকাংশেই নিশ্চিত যে ভারতে আর্য আগমনের আগেই মঙ্গোলয়েডরা ভারতে প্রবেশ করেন। মঙ্গোলয়েডরা যে ভাষায় কথা বলতেন তাঁদের সেই ভাষাকে ভোটচিনা বলা হয়। এই ভোটচিনার প্রধান দুটি শাখা—(১) তাইচিনা ও (২) ভোটধর্মী। আরও একটি শাখার কথা পাওয়া যায়, যার নাম য়েনিসি (yenissi)। এর সঙ্গে ভারতের কোনো সম্পর্ক নেই। ভোটধর্মী শাখা ভারতবর্ষের হিমালয় অঞ্চলে প্রচলিত। ভোটধর্মী শাখার অন্তর্গত ভোটিয়া ভাষার কেন্দ্র লাসা হলেও এই ভাষার নানান বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায় কাশ্মীরের লাদাখ, হিমাচলপ্রদেশের লাউল ও স্পিতি জেলায়। পূর্ব হিমালয়ের সিকিম ভোটিয়ারা, ভূটানিরা, শেরপা ও কাগ্‌তেরা যে ভাষায় কথা বলে সেগুলি সবই এই ভাষাবংশের অন্তর্গত।

ভোটধর্মী শাখাভুক্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বা 'নেফামণ্ডলে বা অরুণাচল প্রদেশ এবং আসামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় ২৪টিরও বেশি ভাষা পাওয়া যায়, যার মধ্যে প্রধান হল আকা, আবর, দফলা, মিসমি এবং মিরি।

আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মণিপুর এইসব অঞ্চলে যে ভাষাগুলি দেখতে পাওয়া যায়, তার প্রধানত চারটি ভাগ—

১. বোরো বা বোডো :— এই শ্রেণিভুক্ত প্রায় ২২টি ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাছারি, রাভা, কোচ, গারো ও মেচদের ভাষা, ত্রিপুরা রাজ্যের টিপ্‌রা ইত্যাদি।

২. নাগা :— প্রধানত নাগাল্যান্ড ও মণিপুর, কিছুটা অরুণাচল প্রদেশ ও আসামে এই শাখার ভাষাগুলি ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে প্রধান হল—আও, অঙ্গামি, সেমা, তঙ্গখুল, লোথা ইত্যাদি।

৩. কুকিচিন :— আসামের লুসাই পার্বত্য অঞ্চল, মণিপুর এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এই শাখার যে ভাষাগুলি প্রচলিত তার মধ্যে প্রধান ঐতিহ্যবাহী মণিপুরের মেইতেই ভাষা। এছাড়াও, লুসাই বা মিজো এবং কুকি ভাষাও উল্লেখযোগ্য।

৪. বর্মি :— যদিও বর্মি ব্রহ্মদেশের ভাষা তবে, চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলের মোঘ ও ম্রু এই শাখার অন্তর্গত।

তাইচিনা বর্গের শ্যামীয় শাখার মধ্যে খামতি উত্তর-পূর্ব আসাম ও অরুণাচল প্রদেশের প্রান্তীয় অঞ্চলে প্রচলিত। খ্রিস্টীয় ১৩০০ থেকে ১৮০০ শতক পর্যন্ত আহোম ভাষা আসামে প্রচলিত ছিল (আহোম থেকেই আসাম শব্দের উৎপত্তি)।

ভারতীয় আর্য ভাষাবংশ ও বাংলা ভাষার উদ্ভব :

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যতটা দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে, ভোটচিনা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের মিশ্রণ অতি অল্প। ভাষাতাত্ত্বিকেরা যে কয়েকটি শব্দে এই মিশ্রণের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হল কীচক, তসর, তোয়া, সিন্দুর, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় এই ভাষাবংশ থেকে বেশ কিছু শব্দ চলে এসেছে। যেমন, বর্মী ভাষা থেকে লুঙ্গি, চিনা ভাষা থেকে চা, লিচু প্রভৃতি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর যে শাখাটি ভারতে প্রবেশ করে সেই শাখার নাম ভারতীয়-আর্য। খ্রিস্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এই শাখার অনুপ্রবেশ এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৩ হাজার বছরেরও বেশি সময় জুড়ে এই ভারতীয় আর্য ভাষা নানা রূপে ভারতের নানা অংশে ছড়িয়ে আছে।

এই সাড়ে তিন হাজার বছরের ভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাসকে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo Aryan, OIA), মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo Aryan, MIA) এবং নব্য ভারতীয় আর্য বা (New Indo Aryan, NIA)। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম নমুনা ঋক্‌বেদ। ঋক্‌বেদ পরবর্তী তিনটি বেদও এই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষারই নিদর্শন বলে সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অনেক সময় বৈদিক ভাষা বলেও অভিহিত করা হয়। যদিও, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যে আছে দুটি পর্যায়— (১) বৈদিক ভাষা ও সাহিত্য এবং (২) সংস্কৃত। সুতরাং এ কথা মনে রাখা উচিত যে বেদ সংস্কৃত

ভাষায় লেখা নয়। সংস্কৃতকে বলা যেতে পারে বৈদিক ভাষারই বিবর্তিত ও ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ। আসলে যে-কোনো ভাষারই থাকে যেমন একদিকে লেখা ভাষা, অন্যদিকে থাকে আঞ্চলিক কথ্য বা লৌকিক ভাষা। এক্ষেত্রে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার কিছু আঞ্চলিক ও লৌকিক রূপ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছিল। যখন লৌকিক ভাষার মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে সৃষ্টি হল ব্যাকরণে ও প্রয়োগে বিশৃঙ্খলা, তখন তাকে নিয়মবদ্ধ করে শিষ্ট লেখ্য ভাষায় পরিণত করেছিলেন পাণিনি। পাণিনি পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ। কারণ, যেভাবে তিনি একটি বহু শাখায়িত ও জটিল ভাষাকে বিশ্লেষণ করেছেন, এবং পরিণত করেছেন শিষ্ট ভাষায় তা এককথায় অতুলনীয়। এই পুরো কাজটি তিনি আটটি অধ্যায়ে ব্যাখ্যা ও বিবৃত করেছিলেন বলে তাঁর ব্যাকরণের নাম 'অষ্টাধ্যায়ী'।

অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, বিশাখদত্ত, শূদ্রক প্রমুখ কবি ও নাট্যকারদের রচনায় এই ভাষার নিদর্শন আছে। সংস্কৃত ছিল প্রধানত শিক্ষিত লোকের ভাব বিনিময়ের ভাষা বা সাহিত্যের ভাষা। ক্রমেই বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের ভাষা থেকে দূরে সরে সাহিত্যের ভাষারূপে প্রতিষ্ঠালাভ করলেও সাধারণ মানুষের মুখে সংস্কৃতের আর-একটি রূপ সমান্তরাল গতিতে তৈরি হচ্ছিল। যে ভাষা বৈদিক ঐতিহ্যাশ্রয়ী কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ভাষা নয়, অথবা ব্যাকরণের কঠিন নিয়মকে মান্যতা দিয়ে সে ভাষা চলছিল না। বরং; তদানীন্তন সমাজের দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠীর সংযোগের ফলে এই ভাষার নমনীয়তা গিয়েছিল বেড়ে। এর নাম আমরা দিতে পারি লৌকিক বা কথ্য সংস্কৃত এবং ধীরে ধীরে এভাবেই কথ্য সংস্কৃতের ক্রমবিবর্তনের ফলেই সাধারণের মুখের ভাষা হয়ে দাঁড়ায় প্রাকৃত ভাষা।

এই প্রাকৃত শব্দটির উদ্ভবের মধ্যে দুটি দিক আছে। একটি হল প্রাকৃত শব্দটি 'প্রকৃতি' থেকে জাত। প্রকৃতি শব্দের অর্থ হল মূল উপাদান। অর্থাৎ, এই যে প্রাকৃত ভাষা তার মূল উপাদান বৈদিক সংস্কৃত ভাষা। এই যে প্রাকৃত ভাষা তার মূল উপাদান বৈদিক সংস্কৃত ভাষা থেকে যেহেতু এই নতুন ভাষাটি এল তাই তার নাম হল প্রাকৃত। আবার অন্য অর্থে যেহেতু শিক্ষিত লোকের থেকে সরে গিয়ে সাধারণ মানুষের ভাষারূপে এর উদ্ভব, তাই জনগণের ব্যবহৃত ভাষা বা প্রাকৃত জনের ভাষা বলে এর নাম প্রাকৃত ভাষা। সময়ের দিক থেকে ৬০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পর্বের প্রধান ভাষা হল প্রাকৃত ভাষা, আর এই পর্বটির নাম মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাকে যেমন 'সংস্কৃত' আখ্যা দিলে ভুল হয়, তেমনি মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাকে শুধু 'প্রাকৃত' বললেও সেই একই ভুল হয়। যাই হোক মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন অশোকের শিলালিপি। এছাড়াও এ পর্বে হীনযানপন্থী বৌদ্ধদের ব্যবহৃত সংস্কৃত এবং পালি ভাষা দেখা দিল। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা অবলম্বনে শিলালিপিগুলি লেখা হয়েছিল বলে একদিকে প্রাকৃত যেমন ছিল জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত মুখের ভাষা, অন্যদিকে ধর্মসাহিত্যের ভাষা হিসেবে ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃত ও পালি।

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম স্তরের একটি ভাষারূপ হল পালি। হীনযানী বৌদ্ধরা বুদ্ধদেবের বাণী যে ভাষায় প্রচার করেছিলেন তা-ই পালি ভাষা। পালি কোনো বিশেষ অঞ্চলের কথ্যভাষা ছিল না। মার্জিত সাহিত্যিক ভাষা হিসেবেই পালির উদ্ভব। কিন্তু কোনও প্রাকৃত ভাষার আধারে পালি ভাষা গড়ে উঠেছিল, তা বিতর্কিত

একটি বিষয়। বুদ্ধদেব যেহেতু মগধের লোক ছিলেন, সুতরাং অনেকে আন্দাজ করেছেন যে মাগধী প্রাকৃত থেকেই পালির জন্ম। আবার অনেকে অর্ধমাগধী থেকে, 'গিরনার প্রশস্তি'র ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্যহেতু উজ্জয়িনীর ভাষারূপে, দক্ষিণ-পশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যার মিলনে পালির উৎপত্তি বলে মনে করেন। সুকুমার সেন মনে করেন যে 'পালি' নামটি সিংহলি বৌদ্ধ পণ্ডিত বুদ্ধঘোষের দেওয়া। বুদ্ধদেব যে ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করেন সেই ভাষাটিকেই বলা যেতে পারে পালির প্রাথমিক রূপ। পালি ভাষা হল সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মাঝামাঝি একটি স্তর।

পালি ভাষায় রচিত নিদর্শনগুলির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলি, বিশেষত 'ত্রিপিটক' এবং বুদ্ধের জীবনকাহিনি নিয়ে লেখা 'জাতকের গল্প' উল্লেখযোগ্য। 'সুত্তনিপাত' ও 'থেরগাথা' পালিভাষায় লেখা উৎকৃষ্ট কবিতা সংকলন।

মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার ব্যাপ্তি প্রায় দেড় হাজার বছর এবং এই দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে স্বাভাবিক নিয়মে এই পর্বের আর্য ভাষার নানা স্থানিক বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে থাকে। যেমন ১০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত, পৈশাচী প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃত এবং অর্ধমাগধী প্রাকৃত—এই আঞ্চলিক রূপ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত আদর্শ প্রাকৃত হিসেবে নাটকে বা কাব্য কবিতায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য রচনার নিদর্শন হিসেবে হালের গাহাসত্তসঈ, প্রবরসেনের সেতুবন্ধ, বাকপতি রাজের গউড়বহো-র কথা বলতে পারি। এই সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলির মধ্যে শৌরসেনী সবচেয়ে প্রাচীনতাধর্মী, পশ্চিম ভারতের মথুরা, দিল্লি, মিরাট অঞ্চলে এর প্রচলন ছিল। সংস্কৃত নাটকে শিক্ষিত রমণী, রাজপুরুষের সংলাপে শৌরসেনী প্রাকৃত ব্যবহৃত হত। পৈশাচী প্রাকৃতের উৎস সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম ভারত হলেও পরবর্তীকালে মধ্যভারতেও এর প্রচলন হয়। পৈশাচী প্রাকৃতের সাহিত্যিক নিদর্শন খুব বেশি নেই। মাগধী প্রাকৃতের নামের মধ্যে মগধের উল্লেখ থাকায় মনে হয় এ ভাষা পূর্ব ভারতে প্রচলিত ছিল। এর প্রাচীনতম নিদর্শন আছে সুতনুক প্রত্নলিপিতে। অর্ধমাগধীর ব্যবহার জৈন ধর্মসাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে অনেকে 'জৈন প্রাকৃত' বলেন এবং এই কারণে এর কোনো ভৌগোলিক সীমারেখাও ছিল না। কিন্তু তবু এর উৎস হিসেবে লখনউ, অবধ এই অঞ্চলকে মনে করা হয়।

এর পরবর্তীকালের স্তরকে অপভ্রংশের স্তর বলা হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে সবকটি প্রাকৃতেরই পরবর্তী পরিণতি হল অপভ্রংশ; অর্থাৎ শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে শৌরসেনী অপভ্রংশ, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ ইত্যাদি। আবার অপভ্রংশের পরবর্তী স্তরের নাম অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ। যদিও অনেক ভাষাবিজ্ঞানী এই অবহট্‌ঠকে আলাদা করতে চাননি। অবহট্‌ঠকে অপভ্রংশেরই অন্তর্গত করে দেখতে চেয়েছেন। তবে এই পর্যায়ে এসেই শেষ হল মধ্যভারতীয় আর্যভাষার কাল।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিস্তার ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা বলতে কোনো একটা ভাষা বোঝায় না। বরং মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার শেষতম স্তরে যে নানান আঞ্চলিক রূপ ফুটে উঠেছিল, নবম শতকে সেখান থেকেই ক্রমে জন্ম নিল আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি। পৈশাচী প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিল সিন্ধি, পশ্চিমা ও পূর্বী পাঞ্জাবি। সিন্ধি ভাষা ভারতে কচ্ছ অঞ্চলে প্রচলিত, লিপি কোথাও আরবি-ফারসি, কোথাও লণ্ডা। পূর্বী পাঞ্জাবি পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লি অঞ্চলে প্রচলিত। শিখদের মূল ধর্মীয় গ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহিব' এই পূর্বী পাঞ্জাবি ভাষায় গুরমুখী লিপিতে লেখা। পশ্চিমা পাঞ্জাবি

পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাষা, এর আরেক নাম লহন্দী। মহারাষ্ট্রী, প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে এসেছে মারাঠী ও কোঙ্কনী। মারাঠী প্রচলিত মহারাষ্ট্রে, কোঙ্কনী গোয়ায়। মারাঠী আর কোঙ্কনী দক্ষিণ ভারতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আর্য ভাষা।

শৌরসেনী প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিয়েছে নেপালি, কুমায়নি আর গাড়োয়ালী। হিমালয়ের কোলে পাহাড়ি গ্রামগুলোয় এই ভাষাগুলি প্রচলিত। মধ্য ভারতের কথ্য হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা, কনৌজী, বুন্দেলী ও বন্দারু এই পাঁচ ভাষারও উদ্ভব শৌরসেনী প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে। ব্রজভাষা মথুরা, আলিগড়, আগ্রা অঞ্চলে, কনৌজী মথুরার পূর্বদিকে দোয়াব অঞ্চলে, বুন্দেলী মধ্যভারতে বুন্দেলখণ্ড ও বন্দারু হরিয়ানার ভাষা। এই পাঁচটি ভাষাকে একসঙ্গে পশ্চিমা হিন্দি বলা হয়। মান্য হিন্দি বলতে যে ভাষাটি, সেটি এই পশ্চিমা হিন্দির অন্তর্গত একটি কথ্য হিন্দুস্থানীর মার্জিত আর্দশায়িত রূপ। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান কবিরা আরবি-ফারসি শব্দবহুল এক নবরূপায়িত হিন্দি ভাষার চর্চা করেছিলেন, সেটিই পরে উর্দু ভাষারূপে স্বীকৃত হয়। এসব ছাড়াও গুজরাতি ও রাজস্থানি ভাষা দুটিও এসেছে শৌরসেনী প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে।

অর্ধমাগধী প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে তিনটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার আবির্ভাব ঘটে। অবধী, বাঘেলী ও ছত্তিশগড়ী। এই তিনটিকে একত্রে পূর্বী হিন্দিও বলা হয়।

মাগধী প্রাকৃত-অপভ্রংশ আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের মাতৃভাষা ও প্রতিবেশী ভাষাগুলি এসেছে এখান থেকেই। মাগধী ভাষাগুলি দুটি শাখায় বিভক্ত—পূর্বী ও পশ্চিমা। পশ্চিমা শাখা থেকে এসেছে বেনারস, রোহতাস, সাসারাম প্রভৃতি অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা, ভোজপুরি, পাটনা, গয়া, মুঙ্গের, হাজারিবাগের ভাষা মগহী এবং ভাগলপুর-মজফ্‌ফরপুর অঞ্চলের মৈথিলি ভাষা। আর পূর্বী শাখা থেকে এসেছে আসাম আর ওড়িশার অহমিয়া ও ওড়িয়া ভাষা এবং অবশ্যই বাংলা ভাষা যা পশ্চিমবাংলা, ঝাড়খণ্ড-বিহার-আসামের কিছু অংশে এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রচলিত। আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দকে যদি বাংলা ভাষার জন্মসাল ধরি, তাহলে আজ বাংলাভাষার বয়স হাজার বছরের কিছু বেশি।

সাধারণভাবে চর্যাপদের ভাষাকেই ধরা হয় বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা। সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে অষ্টম শতকের আগে বৌদ্ধ বজ্রযানী ও নাথপন্থী সিদ্ধাচার্যরা যে কড়চা ও ছড়াজাতীয় রচনা লিখেছিলেন, তাতে বাংলা ভাষার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। চর্যাপদের ভাষাই যে প্রাচীন বাংলাভাষার রূপ সেকথা প্রতিষ্ঠা করতে ভাষাতাত্ত্বিক লড়াই বাঁধে। কারণ চর্যার ভাষার উপর দাবি ছিল অনেকগুলি ভাষার, যেমন মৈথিলি, ওড়িয়া, হিন্দি বা অসমিয়ার। এই দাবি যে গ্রহণীয় নয় তা নিয়ে সংশয় না থাকলেও এই ভাষাগুলির প্রাচীন রূপের সঙ্গেও মিল ছিল প্রচুর, কারণ এই ভাষাগুলো বাংলারই সগোত্র, উৎসগতভাবে এক।

বাংলাভাষার জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত, এই দীর্ঘ সময়ে তার যে বিবর্তনপথ তাকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা **কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন :**

১ম পর্যায় : প্রাচীন বাংলা (আধুনিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ)

২য় পর্যায় : মধ্য বাংলা

আদি-মধ্য বাংলা (আনুমানিক ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)

অন্ত্য-মধ্য বাংলা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ)

৩য় পর্যায় : আধুনিক বাংলা (আনুমানিক ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত)

প্রাচীন বাংলার প্রধান নিদর্শন যে চর্যাপদ তা আগেই বলেছি। এছাড়াও 'অমরকোষের' সর্বানন্দ রচিত টীকায় প্রদত্ত চারশোর বেশি প্রতিশব্দে, ধর্মদাস রচিত 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডল' বইয়ে কয়েকটি কবিতায় এবং 'সেক-শুভোদয়া'য় উদ্ধৃত গানে ও ছড়ায় প্রাচীন বাংলার চিহ্ন রক্ষিত আছে।

আদি-মধ্য বাংলার নিদর্শন হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে ধরা হয়। আদি-মধ্য বাংলার বিস্তৃতিকাল যেহেতু ১৩৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, তাই এই দেড়শো বছর ব্যাপী সময়ের একটিমাত্র নিদর্শন ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে এক অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। এই অস্বস্তির কারণ এই যে, ধরে নিতে হবে, এই দীর্ঘ সময়ে আর কোনো সাহিত্যিক রচনা সম্ভব হয়নি। এই সময়কে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলে অভিহিত করার মধ্যে অতিসরলীকরণের একটা প্রবণতা আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় এবং কয়েকটি মঙ্গলকাব্যকে এর কাছাকাছি সময়ের রচনা বলে ধরা হলেও এগুলির ভাষা পরবর্তীকালে এত বেশি পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল যে এগুলিকে আর প্রামাণিক নিদর্শন হিসেবে হাজির করা যায় না।

চর্যাপদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার অনেকটাই ফারাক চোখে পড়ে। এমনকি, চর্যার ভাষাকে আমাদের আধুনিক বাংলাভাষার তুলনায় যতটা দূরের মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা কিন্তু ততটা অপরিচয়ের দূরত্বে অনাত্মীয়ের মতো নয়।

যেমন—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে।

আধুনিক বাংলা রূপান্তর—

বড়াই, কালিন্দী নদীর কূলে কে সে বাঁশি বাজায়,

বড়াই, গোষ্ঠ-গোকুলে কে সে বাঁশি বাজায়।

১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই আড়াইশো বছরের বাংলা ভাষার ধরনটিকে আমরা অন্ত্য-মধ্য বাংলা বলতে পারি। এই সময়ের সাহিত্যিক নিদর্শন প্রচুর। বৈষ্ণব পদাবলি, চৈতন্যজীবনী, মঙ্গলকাব্যসমূহ, আরাকান রাজসভাশ্রিত সাহিত্য, গীতিকা, নাথসাহিত্য—প্রভৃতি পর্যাপ্ত সাহিত্যিক নিদর্শন এ সময়ে পাওয়া যায়। এ সময়ের বাংলা যেন অনেকটাই আমাদের বাংলার মতো। সে কারণেই এসব সাহিত্যের নানান পংক্তি আমাদের ভাষাতেও ব্যবহৃত হয় প্রবাদ-প্রবচনরূপে, যেমন—'শিশু কান্দে ওদনের তরে', 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে', 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়' ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার আধুনিক কাল বলতে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে আজ পর্যন্ত সময়কে ধরা হয়। অন্ত্য-মধ্য স্তরের ভাষার সঙ্গে আধুনিক বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড়ো ফারাক সৃষ্টি হয়েছে গদ্যরীতির ব্যবহারে। অন্ত্য-মধ্যযুগে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল না এমন নয়, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতিতেই গদ্যের প্রয়োগ সীমিত ছিল। আধুনিক যুগেই প্রতিষ্ঠিত হল সাহিত্যিক গদ্য। আবার, এ ঘটনার পাশাপাশি আধুনিক বাংলাতেই মুখের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষা পৃথক হয়ে যায়। লেখার ভাষার সাহিত্যিক রূপটি 'সাধুভাষা' নামে পরিচিত হয়। অন্যদিকে, স্বরসংগতির প্রবণতা প্রবলভাবে দেখা দেওয়ায় তা মুখের ভাষা এবং চলিতভাষায় স্থায়ী জায়গা করে নেয়।

এই বিবর্তনপথেই ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলা ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্যগুলি। এর ফলে একই ভাষার নানান রূপ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এইভাবেই ভাষা বহতা নদীর মতো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপ বদল করতে করতে এগিয়ে চলে। আজকের ভাষাও পালটে যাবে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। তখন শুরু হবে বাংলা ভাষার আরেক অধ্যায়।

সংস্কৃত ভাষাকে অনেকেই মনে করেন বাংলা ভাষার জননী। কিন্তু এ মত কি গ্রহণযোগ্য? এ মত কি সরলীকরণের ঝোঁকে উঠে আসা? এ মত কি নিজেদের 'আর্য' ভাবার মতো উন্নাসিক মানসিকতার ফসল? এই প্রশ্নগুলি জড়িয়ে আছে সংস্কৃত ও বাংলার সম্পর্কের মধ্যে।

উনিশ শতকের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যাঁরা বাংলা ভাষাচর্চা করতেন, তাঁরা মনে করেছিলেন যে সংস্কৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব। এই ধারণা অনুযায়ী সে-সময়ে যতগুলি বাংলা ব্যাকরণ বই লেখা হয়েছিল সেগুলি আসলে সংস্কৃত ব্যাকরণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।' বাংলা ভাষা আসলে সংস্কৃত ভাষারই সন্তান—সন্দেহ নেই, এ মানসিকতাই কাজ করেছে এক্ষেত্রে। এঁরা মনে করেন প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার শেষপর্বের ভাষা সংস্কৃত, তাই সংস্কৃত ভাষার বিবর্তনসূত্রে মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃত-অপভ্রংশ এবং সেখান থেকেই নব্যভারতীয় আর্য ভাষারূপে বাংলা ভাষার জন্ম। এই মতকে আরও জোরদার করেছে বাংলা ভাষার ব্যাকরণে ও শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃতের গভীর প্রভাব।

কিন্তু সূক্ষ্ম ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে দুটি দিক থেকে বলা যায় যে সংস্কৃত বাংলা ভাষার জননীস্বরূপা নয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীন মার্জিত সাহিত্যিক রূপ বৈদিক সাহিত্য এবং অর্বাচীন মার্জিত সাহিত্যিক রূপ ধ্রুপদী সংস্কৃত। এই ধ্রুপদী বা লৌকিক সংস্কৃত বিবর্তিত হয়নি, এর কথ্যরূপটি থেকেই এসেছে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার স্তর। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত বৈদিক ভাষা তিনটি ধারায় বিবর্তিত হয়—সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি। এই প্রাকৃত থেকেই দীর্ঘ বিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার সৃষ্টি। আসলে প্রাকৃত ছাড়া সংস্কৃত ও পালি দুটিই সাহিত্যিক ভাষা, ফলে এই দুই ভাষার বিবর্তনের সম্ভাবনাও কম।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে-ভাবে এই বিষয়টি দেখিয়েছেন তা হল—

সুতরাং, প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে মধ্য ভারতীয় আর্যের মাগধী প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ,

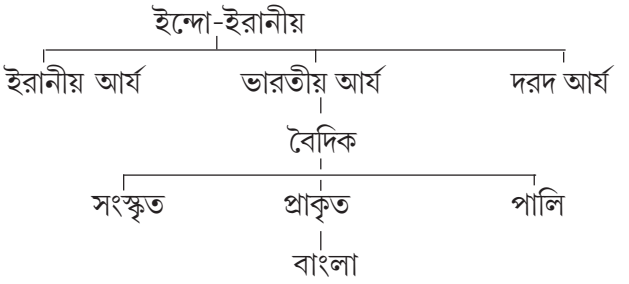

মাগধী অপভ্রংশ থেকে অবহট্‌ঠ এবং তা থেকে বাংলার জন্ম। এখন এই পরম্পরায় মাগধী অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠের কোনো নিদর্শন পাওয়া না গেলেও এবং অনুমিত হলেও এই স্তরপরম্পরা যুক্তিগ্রাহ্য। সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেন অনুসরণে বলা যায় মাগধী অপভ্রংশ বাংলা ভাষার জননী। সংস্কৃতর সঙ্গে বাংলার যোগ বহুদূরবর্তী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায় সংস্কৃত বাংলা ভাষার 'অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধ পিতামহী।'

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা ভাষার কুলজী' এবং 'দ্রাবিড়' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার সঙ্গে একমাত্র আর্য ভাষারই সম্পর্ক আছে এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অনার্য ভাষাগুলি অর্থাৎ দ্রাবিড়, অস্ট্রিক এবং ভোট-চিনীয় ভাষাগুলি আর্যবসতি স্থাপনের আগে প্রচলিত ছিল। ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভবের সময় এইসব ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষার উপাদান বহুল পরিমাণে মিশে গেছে আর্য ভাষার বিবর্তিত রূপের সঙ্গে। বাংলা ভাষায় বেশ কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য যেমন আছে, তেমনি বাংলা শব্দভাণ্ডারে আছে অজস্র অনার্য শব্দ, যাকে আমরা দেশি শব্দ বলে থাকি। এই কারণেই সুনীতিকুমার বলেছেন, বাংলা ভাষা 'অনার্য্য ভাষার ছাঁচে ঢালা আর্য্য ভাষা'।

তৃতীয় অধ্যায়

ভাষাবৈচিত্র্য ও বাংলা ভাষা

ভাষা যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায়, আগের অধ্যায়গুলিতে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে ইন্দো-ইরানীয় হয়ে কীভাবে তিনহাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে আজকের বাংলা এল, সেই বিবর্তনের ধাপগুলো নিয়ে যে চর্চা করা হয় তাকে বলা যেতে পারে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের। কিন্তু ভাষা শুধু সময়ের সঙ্গেই পালটায় না, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেও থাকে একটি ভাষার নানা রূপ। ভাষার ধ্বনি ও রূপ নিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়বৃত্তে এই যে আলোচনা বা চর্চা, একে বলা যেতে পারে এককালীন ভাষাতত্ত্ব।—'যদি মনে করে নিই, একটা মুহূর্তে ভাষা স্থির, তাহলে সেই সময়ের ভাষাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব তার অতীতের কথা না এনেও। যেহেতু ভাষার পরিবর্তন অতি ধীর গতি তাই এমন মুহূর্ত বিশ্লেষণের জন্য বেছে নেওয়া অসমীচীন নয়। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব দ্বিকালীন (diachronic) কাঠামোর মধ্যে কাজ করে। 'ক' কাল থেকে 'খ' কালে, 'খ' কাল থেকে 'গ' কালে কীভাবে ভাষা পরিবর্তিত হচ্ছে তার কথা বলে। কিন্তু এককালীন (Synchronic) ভাষাচর্চাও সম্ভব। এককালীন ভাষাতত্ত্ব বিশেষ একটি কালকে বেছে নেয়, পূর্ববর্তী কালের সঙ্গে সেই কালের সম্পর্ক আবিষ্কার করতে চায় না, সেই বিশেষ কালখণ্ডে ভাষার রূপটির পরিচয় নিতে চায়। নীচের চিত্রটি দেখলে এই দু-ধরনের ভাষাচর্চার পার্থক্য এবং এদের যোগসূত্রটি বোঝা যাবে :

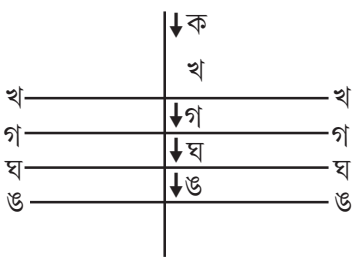

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করছে 'ক' যুগের ভাষা 'খ' যুগে কতটা পরিবর্তিত হল, কোন কোন প্রক্রিয়ায় সেই পরিবর্তনগুলি এল।... এইভাবে ফুটিয়ে তুলতে চাইছে পরিবর্তমান ভাষাকে, একটি বহমান নদীকে'*। এককালীন ভাষাতত্ত্বের আগ্রহ কিন্তু সীমাবদ্ধ থাকে প্রধানত একটি কালখণ্ডে, হতে পারে সেটা 'ক' বা 'খ' বা 'গ'। অর্থাৎ ধরা যাক 'ক' কালে ভাষার রূপ কীরকম ছিল, ধ্বনি কীরকম ছিল এবং 'ক' কালে সেই ভাষারই কত রকম বৈচিত্র্য ছিল। যেমন ধরো, তুমি যে ভাষায় অনর্গল বন্ধুদের মধ্যে কথা বলো, আর যে ভাষায় তুমি কোনো বিষয় নিয়ে অনেকের সামনে বক্তৃতা দাও, এই দুটি ভাষা কি সম্পূর্ণ এক? দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটু কি পরিশীলিত বা মার্জিত হয়ে যায় না তোমার ভাষা? আবার যখন তুমি লেখো কোনো প্রবন্ধ, তখনও কি আবার একটু আলাদা হয়ে যায় না তোমার ভাষা? ধরো তুমি থাকো পুরুলিয়া বা কোচবিহার জেলায়, তোমার কথার সঙ্গে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে থাকা তোমার কোনো বন্ধুর ভাষা কি হুবহু এক? প্রতিক্ষেত্রে দেখবে একই বাংলা ভাষার মধ্যে রয়েছে বাংলা ভাষারই

* শিশির কুমার দাস, ভাষাজিজ্ঞাসা, প্যাপীরাস

নানা রকমফের। আর এটা যে শুধু বাংলা ভাষার ব্যাপার, এরকম একেবারেই নয়। পৃথিবীর সব ভাষার মধ্যেই এটা দেখা যায়। তবে যে ভাষার ভৌগোলিক বিস্তৃতি ও ভাষাভাষীর সংখ্যা বেশি, সেই ভাষার ক্ষেত্রে এই রকমফেরের ধরন ও সংখ্যাও বেশি।

এখন দেখা গেছে কোনো ভাষার যতটা ভৌগোলিক বিস্তার ঘটেছে, নানা অঞ্চলে সে ভাষার রূপ আলাদা হয়ে গেছে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনার মানুষের মুখের ভাষা আর পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মানুষের মুখের ভাষা কিংবা জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের মানুষের মুখের ভাষা আলাদা। সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা বাংলার এই আঞ্চলিক বৈচিত্র্যগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেনঃ রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী। ভাষার এই আঞ্চলিক রূপকে 'উপভাষা' (Dialect) বলা হয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই পাঁচটি প্রধান উপভাষা। রাঢ়ী বলতে ভাগীরথী-হুগলি নদীর আশেপাশে ব্যবহৃত বাংলা; বরেন্দ্রী বলতে মালদা, দিনাজপুর; বঙ্গালী বলতে বাংলাদেশের ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, চট্টগ্রাম ইত্যাদি; কামরূপী হল জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আসামের কাছাড় ইত্যাদি আর ঝাড়খণ্ডী হল পশ্চিমবাংলার পশ্চিমপ্রান্তের ঝাড়খণ্ডের মানভূম-সিংভূম ও ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন পুরুলিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর ইত্যাদি। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে এতগুলি যদি বাংলার ঔপভাষিক অঞ্চল হয়, তাহলে কোন অঞ্চলের ভাষা 'বাংলা'? আসলে যে-কোন ভাষা হল তার নানা উপভাষার একটা বিমূর্ত রূপ। এই সব উপভাষা মিলিয়েই বাংলা ভাষা। এই উপভাষাগুলোর মধ্যে কোনো একটি উপভাষাকে 'Standard' বা মান্য ভাষা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। যেমন বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হয়েছে যে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষাই হল মান্য ভাষা। মান্যচলিত ভাষাও শেষপর্যন্ত অন্যান্য উপভাষাগুলোর মতোই একটি উপভাষামাত্র। মনে রাখতে হবে, এই মান্য বাংলাই একমাত্র বাংলা নয়, বাংলা হল, যত জন মানুষ বাংলা বলে তার একটা সাধারণ রূপ। মান্যচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃত যে উপভাষা তা অন্যান্য উপভাষাগুলির তুলনায় 'উন্নত' নয়, 'অনুন্নত'ও নয়; আসলে প্রত্যেকটি উপভাষার কোনোটাই একে অপরের থেকে 'উন্নত' বা 'অনুন্নত', 'ভালো' কিংবা 'খারাপ' নয়। তাহলে এতগুলো উপভাষার মধ্যে কী করে একটি উপভাষা 'মান্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে? প্রথমেই বলি, এই যোগ্যতা অর্জন নির্ভর করে না কোনো ভাষাগত কারণের উপর, বরং নির্ভর করে ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক কারণের উপর।

বাংলা ভাষার যে অঞ্চলের ভাষিক রূপটি 'মান্য' বলে চিহ্নিত হয়েছে, অতীতের নানা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সেই অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে। ইংরেজ আমলে প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল কলকাতা। এছাড়াও পর্তুগিজরা হুগলিতে, ফরাসিরা চন্দননগরে, ওলন্দাজরা শ্রীরামপুরে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। আবার ভাগীরথী-হুগলি নদীর দুই তীরেই একসময় গড়ে উঠেছিল এক বিশাল শিল্পাঞ্চল। এখনও এ রাজ্যের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা এই অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত। সুতরাং, এ অঞ্চলের কথ্যভাষাই মান্য কথ্যভাষা হয়ে উঠেছে; এর সঙ্গে ভাষাগত কোনো সম্পর্ক নেই।

এখানে dialect continuum বিষয়ে বলা প্রয়োজন? ডায়ালেক্ট কনটিনাম হল এমন অনেক উপভাষার শৃঙ্খল, যেখানে ধরা যাক 'উপভাষা-১' বোধগম্যতার দিক থেকে 'উপভাষা-২'-এর খুব কাছাকাছি, 'উপভাষা-৩'-এর ক্ষেত্রে বোধগম্যতা আগের তুলনায় কম, 'উপভাষা-৪'-এর ক্ষেত্রে বোধগম্যতা আরেকটু কম। এইভাবে হয়তো 'উপভাষা-৮'-এর ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে যারা 'উপভাষা-১'-এ কথা বলে তারা 'উপভাষা-৮' বুঝতে পারছে

না। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যাবে ওড়িশা-সংলগ্ন পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষেরা হয়তো চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষা বুঝতে পারছেন না, যদিও তাঁরা বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন। আবার দেখা যাবে এই ওড়িশা-সংলগ্ন পূর্ব মেদিনীপুরের বাংলায় কথা বলা মানুষটি সহজেই বুঝতে পারেন মেদিনীপুর-সংলগ্ন ওড়িশা অঞ্চলে প্রচলিত কথ্য-ওড়িয়া ভাষার রূপটি। যেহেতু উপভাষা ও ভাষার পৃথক্‌ীকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সূচক 'বোধগম্যতা', মনে হতে পারে ওই বিশেষ অঞ্চলের দুটি উপভাষা (একটি বাংলা ভাষার ও অন্যটি অন্যটি ওড়িয়া ভাষার) একই ভাষার সম্পর্কিত। কীভাবে সেক্ষেত্রে বোঝা যাবে কোনটি কোন ভাষার উপভাষা? দেখা যাবে বাংলা ভাষার মানুষটি ওই বিশেষ ওড়িয়া ভাষার কথ্যরূপটি বুঝতে পারলেও, তাঁর মান্য-ওড়িয়া বুঝতে অসুবিধে হবে, কিন্তু বুঝতে পারবেন মান্য বাংলা। আবার চট্টগ্রামের মানুষটি মেদিনীপুরের ওই মানুষটির কথ্য-বাংলা বুঝতে না পারলেও বুঝতে পারেন মান্য বাংলা।

ভৌগোলিক অঞ্চলের বিভিন্নতার কারণে যেমন সৃষ্টি হয় উপভাষার, তেমনি যে সমাজে আমরা থাকি সেখানেও দেখা যায় ভাষার নানান বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় বিত্তের কারণে, শিক্ষার কারণে, জাত-ধর্ম-বর্ণের কারণে, পেশাগত কারণে ইত্যাদি। প্রথমেই বলি জাত-ধর্ম-বর্ণের যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে খুব একটা প্রকট নয়। যেমন তামিল ভাষায় উচ্চবর্ণ বা ব্রাহ্মণদের কথার সঙ্গে নিম্নবর্ণের ভাষার ফারাক প্রচুর। কিন্তু অন্য কারণগুলো বাংলাভাষাতেও দেখা যায়। যারা লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হয়ে ওঠে, স্কুল-কলেজের ভাষার সংস্পর্শে এসে বদলে যায় তাদের ভাষা। বাড়িতে হয়তো তারা বাড়ির ভাষাতে কথা বলে, কিন্তু বাড়ির বাইরে কথা বলার ক্ষেত্রে চলে আসে মান্য বাংলা বলার ঝোঁক। আসলে 'শ্রেণি'র ধারণাও বদলে যায় দ্রুত। অশিক্ষিত কোনো মানুষের সন্তান শিক্ষিত হয়ে এবং পেশার পরিবর্তন ঘটিয়ে অন্য শ্রেণিতে যেতে পারে এবং এই শ্রেণিগত পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন আসে তার ভাষাতেও। ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় এই ধরনের গবেষণামূলক কাজের সংখ্যাও প্রচুর। এইভাবে সামাজিক স্তরভেদে ভাষার এই বৈচিত্র্যকে বলে সমাজভাষা বা Sociolect। আবার একই শ্রেণিতে থাকা দুটি মানুষের মুখের ভাষাও যে সবসময় এক হবে, তার কোনো মানে নেই। ধরো তোমার স্কুলে যতজন মাস্টারমশাই বা দিদিমণি আছেন, তাঁরা কি সবাই একইরকম ভাবে কথা বলেন? ধরে নিতে পারো যে তাঁরা মোটামুটি একই শ্রেণিভুক্ত এবং কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে একই অঞ্চলের মানুষ। এক ব্যক্তির ভাষার সঙ্গে আর এক ব্যক্তির ভাষার এই যে ফারাক, ব্যক্তির ভাষার মধ্যে এই যে বৈচিত্র্য, তাকে বলা যেতে পারে ব্যক্তিভাষা বা বিভাষা বা ideolect। আসলে 'বাংলা ভাষা' বললে বুঝতে হবে এ সবকটিকেই। স্থান, শ্রেণি বা ব্যক্তিগত নানান ফারাক সত্ত্বেও যে সাধারণরূপ ফুটে ওঠে, তাকেই আমরা 'ভাষা' বলে চিহ্নিত করি। প্রত্যেকটিই একটি জীবিত ভাষার বৈশিষ্ট্য, এগুলির কোনোটাই বেশি গুরুত্বের বা তাচ্ছিল্যের যোগ্য নয়। এমনকি গালাগাল, রকের ভাষা, অপরাধ-জগতের ভাষা, প্রযুক্তির ভাষা, পরিভাষা সবই বৈচিত্র্যের অংশ। একটি মজার কথা বলে শেষ করি: বাংলায় যেমন সম্ভ্রম ও নৈকট্য অর্থে তিনরকম বৈচিত্র্য ব্যবহার করি—তুই, তুমি, আপনি এবং সেই কারণে পালটে যায় ক্রিয়াও। কোরীয় ভাষায় এই অর্থে ৬টি বৈচিত্র্য দেখা যায়।

সুতরাং, একটি ভাষিক অঞ্চলে ও সমাজে একজন মানুষের কথার মধ্যেই থাকে অনেকগুলো স্তর। প্রথমে তিনি নিজেকে, তারপর তাঁর পেশাকে এবং শ্রেণিকে বা এককথায় তাঁর সমাজকে, তারপর তাঁর উপভাষিক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেন এবং শেষপর্যন্ত পৌঁছান মান্য ভাষায়। এই কথার মধ্যে সরলীকরণ হয়তো আছে, কিন্তু যথাযথ ভাষিক অবস্থান নির্ধারণ অত্যন্ত জটিল। নীচে এভাবেই স্তরগুলিকে দেখানো যেতে পারে :

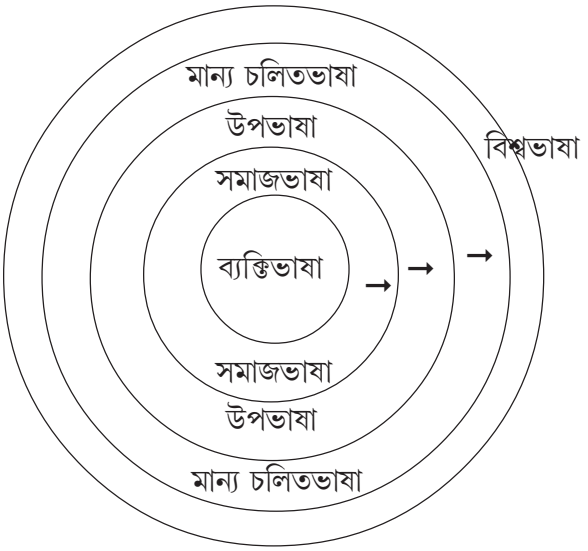

সাধু ও চলিতরীতি :

উপরের এ সবই ঘটে প্রধানত কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে। কিন্তু লেখার ভাষায় কি কোনো বৈচিত্র্য আছে? বাংলা ভাষার লিখিত রূপের দিকে তাকালে সেখানেও আমরা প্রধানত দুটি রূপ দেখতে পাব। একটি সাধু, অন্যটি চলিতরীতি।

এখন খুব একটা দেখা যায় না, কিন্তু উনিশ শতকে লিখিত গদ্যে অধিক সংখ্যক বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ, ক্রিয়া-সর্বনামের দীর্ঘরূপ, সমাসবদ্ধ পদ এবং বাক্যের পদবিন্যাসের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতাসম্পন্ন বিদগ্ধ, গম্ভীর ও সাহিত্যে সীমাবদ্ধ যে ভাষা, তাকেই সাধুভাষা বলা হয়। অন্যদিকে কথ্যভাষার প্রধানত মান্য কথ্যভাষার কাছাকাছি, তদ্ভব শব্দ, ক্রিয়া-সর্বনাম-অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ, দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহারে এবং বাক্যে পদবিন্যাসের কিছুটা শিথিল নিয়মসম্বলিত যে বাংলা ভাষা তাকে আমরা চলিতরীতি বলি।

উনিশ শতকে লিখিত বাংলা ভাষা হিসেবে যখন সাধুরীতির প্রচলন ছিল ব্যাপক, তখন চলিতরীতির ধারাটি ছিল ক্ষীণ। সাধুরীতির রূপটি গড়ে ওঠে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের হাতে; তারপরই রামমোহন রায়ের 'বেদান্তগ্রন্থ'-এ আরও যুক্তিনির্ভর দৃঢ়পিনদ্ধ রূপটি পাওয়া যায় এবং তিনি এই 'সাধুভাষা' কথাটি ব্যবহার করেন। উনিশ শতক জুড়ে বাংলা লেখার ক্ষেত্রে সাধুরীতির এই গৌরবময়তায় পাশে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' আর কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র চলিতরীতির উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। পরে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর 'সবুজপত্র'কে ঘিরে চলিতরীতি ক্রমশই স্থান করে নেয় সাহিত্যের অঙ্গনে। তারপর ক্রমেই সাধুরীতির ধারাটি হয়ে এল ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, চলিতরীতি হলো লিখিত বাংলা ভাষার প্রধান বাহন।

সাধু আর চলিতরীতির প্রধান পার্থক্য সর্বনাম এবং ক্রিয়ার রূপে। এছাড়া আরও কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। নীচে পার্থক্যগুলি সূত্রাকারে দেখানো হল।

চলিতরীতির মূল ভিত্তি মৌখিক ভাষা। এই কারণে চলিতরীতির লিখিত রূপেও অনেক সময় মৌখিক উচ্চারণের সরাসরি প্রভাব দেখা যায়।

সাধু	**চলিত**
কোন, কোনও	কোনো
কর	করো
দেখে	দ্যাখে

বাংলা ভাষার মৌখিক উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ তারতম্য নেই বলে তদ্ভব শব্দে হ্রস্বস্বর ব্যবহারের রীতি চলিতরীতিতে বহুল প্রচলিত।

সাধু	**চলিত**
পাখী	পাখি
রূপা	রুপো

মৌখিক ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্ব্যক্ষরতা বা দ্বিমাত্রিকতা চলিতরীতিতে গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

সাধু	**চলিত**
জানালা	জান্‌লা
রবিবার	রোব্‌বার

দ্বিবচনবাচক শব্দগুলি সাধু ও চলিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সাধু	**চলিত**
ভ্রাতৃদ্বয়	দুই ভাই, ভাই দুটি
পাখী দুটি	পাখি দুটো
মন্দিরদ্বয়	জোড়ামন্দির

একবচনের ক্ষেত্রে সাধুতে-'টি' বা 'খানি' নির্দেশকগুলি যুক্ত হয়, চলিতে নির্দিষ্ট কর্তার সঙ্গে যুক্ত হয় '-টা' বা '-খানা'। বহুবচনে সাধুরীতিতে '-গুলি' নির্দেশক যুক্ত হয়, চলিতে তা হয়ে যায় '-গুলো।'

সাধু	**চলিত**
ছেলেটি	ছেলেটা
বইখানি	বইখানা
গাছগুলি	গাছগুলো

চলিতরীতিতে অনেক সময় মৌখিক ভাষার ঢং-এ বিভিন্ন কারকচিহ্ন তথা বিভক্তি লোপ পেয়ে যায়।

কর্ম : তিনি ছাত্র পড়িয়ে সংসার চালান।

করণ : তারা খুব তাস পেটাচ্ছে।

অপাদান : ট্যাংক-উপচানো জলে সব ভেসে গেল।

অধিকরণ : আমি গাছপাকা আম খুব ভালোবাসি।

সাধুরীতির সর্বনামগুলি (মূলত, প্রথমপুরুষ এবং নির্দেশক) চলিতে সংক্ষিপ্তরূপে ব্যবহৃত হয়।

সাধু	**চলিত**
তাহার/তাঁহার	তারা/তাঁরা
তাহাদের/তাহাদিগের	তাদের/তাদিগের
তাহাদিগকে	তাদেরকে/তাদের
কাহারা	কারা

সাধুরীতি ক্রিয়ারীতির থেকে চলিতভাষার ক্রিয়ারীতির সংক্ষিপ্ততর।

	সাধু	**চলিত**
ঘটমান বর্তমান -	করিতেছে	করছে
	করিতেছ	করছ
	করিতেছিস	করছিস
	করিতেছেন	করছেন
	করিতেছে	করছে
পুরাঘটিত বর্তমান -	করিয়াছি	করেছি
	করিয়াছ	করেছ
	করিয়াছিস	করেছিস
	করিয়াছেন	করেছেন
	করিয়াছে	করেছে
সাধারণ অতীত -	করিলাম	করলাম
	করিলে	করলে
	করিলি	করলি
	করিলেন	করলেন
	করিল	করল/করলে
ঘটমান অতীত -	করিতেছিলাম	করছিলাম/করছিলুম
	করিতেছিলে	করছিলে
	করিতেছিলি	করছিলি
	করিতেছিলেন	করছিলেন

	করিতেছিল	করছিল
পুরাঘটিত অতীত -	করিয়াছিলাম	করেছিলাম/করেছিলুম
	করিয়াছিলে	করেছিলে
	করিয়াছিলেন	করেছিলেন
	করিয়াছিলি	করেছিলি
	করিয়াছিল	করেছিল
সাধারণ ভবিষ্যৎ -	করিব	করব
	করিবে	করবে
	করিবি	করবি
	করিবেন	করবেন
	করিবে	করবে

চলিতরীতিতে সমাস ব্যবহারের প্রবণতা তুলনায় কম। প্রধানত দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ এবং বহুব্রীহি সমাসই সর্বাধিক প্রচলিত।

যেমন- ঠাকুরদেবতা নয়, বাপমাকে শ্রদ্ধা করো। (দ্বন্দ্ব)

সে এমন ভুলোমন যে গাছপাকা আমগুলো ট্রেনে ফেলে এল। (তৎপুরুষ)

নরুণচোখো, চিরুণদাঁতি না হলে যেন জীবন বৃথা! (বহুব্রীহি)

সাধুরীতিতে সচরাচর বাংলা ভাষার কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া পদবিন্যাসের ক্রমটি রক্ষিত হয়। চলিতরীতিতে সবসময় তা মোটেই মেনে চলা হয় না।

যেমন— কিছু বলিনি তো আমি ওকে।

ওকে কেউ দেখতেই পায়নি তা প্রায় বিশ বছর।

সাধু ও চলিতের মধ্যে এই যে এত পার্থক্য দেখানো হল, আজকের লেখ্যবাংলায় এই পার্থক্য মোটামুটি বজায় রাখা হলেও, এ দুই ভাষার মধ্যে বিভেদ কিন্তু অনড়বন্ধ নয়। ক্রিয়া ও সর্বনামের রূপে পার্থক্য বজায় থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক সময়ই এই দুই রীতি মিশে যায়। কবিতার ক্ষেত্রে অবশ্য দুই প্রকার ক্রিয়াও ব্যবহার করেছেন জীবনানন্দ দাশ এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সেক্ষেত্রে কেউ বলেন না যে এখানে মিশে গেছে সাধু-চলিতভাষা। বরং চমৎকৃত হন এর ধ্বনিমাধুর্যে —

(১) কী কথা তাহার সাথে? — তার সাথে! (আকাশলীনা/জীবনানন্দ দাশ)

(২) আমার কাছে এখনও পড়ে আছে
তোমার প্রিয় হারিয়ে যাওয়া চাবি...
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা? (চাবি/শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

উদাহরণ হিসেবে একটি সাধুরীতির নিদর্শন দেওয়া হল—

ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার—অবেণীসম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জোর্তিময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।

কপালকুণ্ডলা/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্রথম পাত্র'জ সংস্করণ ১৯৮৩)

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে সাধরীতির সঙ্গে বিশেষ ধরনের বানানের কোনো সম্পর্ক নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী কালের সাধুরীতিতে কিন্তু বাংলা বানানের বর্তমান রূপটি ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে। তোমরা সারাদিন যত কথা বলো, যত লেখো সবই কিন্তু চলিতে। আমরা কথা বলার সময় একটানা কথা বলি না। থেমে থেমে বলি কারণ একদিকে যেমন শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তেমনি কথার অর্থ পরিস্ফুট করার জন্যও ক্ষণিক বিরাম নিতে হয়। এই বিরাম যদি অনিয়মিত হয় তাহলে তা হয় গদ্য, আর যদি নিয়মিত হয় তাহলে ফুটে ওঠে পদ্যের আমেজ। যে-কোনো ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও আছে পদ্য ও গদ্যের বৈচিত্র্য। তাহলে বাংলা ভাষার সামগ্রিক বৈচিত্র্য যা উঠে এল আমাদের আলোচনায় তা অনেকটা নীচের ছকের মতো:

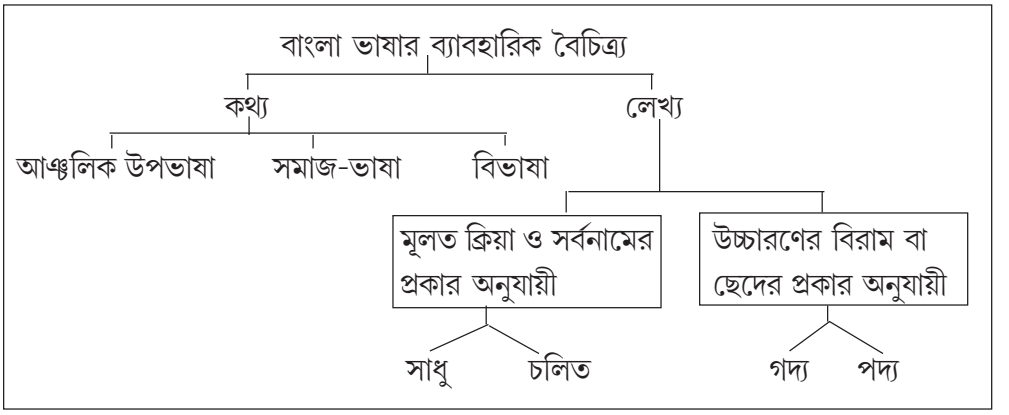

বাঙালির শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
(প্রথম পর্যায়)

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা

ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ধর্মীয় ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন :

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত উনিশ শতকের বাংলায় অনেক নতুন অভিঘাত এলেও, তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত মানুষের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ হওয়ায় জনসাধারণের এক বিপুল অংশকেই তা প্রভাবিত করেনি। কিন্তু তবু, নগরে বসবাসকারী বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে যে আধুনিক নবচেতনা এসেছিল, তা বাঙালিকে প্রচলিত প্রথার বিচার করতে যেমন সাহস জুগিয়েছিল, তেমনই বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে, আত্মসচেতন হয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটাতে তৎপর করে তুলেছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাবে, বহু স্মরণীয় গ্রন্থ রচনায়, সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠায়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে, সাময়িক পত্রের আবির্ভাব ও প্রসারে এই যুগটি বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে। বাংলায় এই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সময়পর্বকেই 'নবজাগরণের কাল' বলা হয়ে থাকে, যার প্রভাব পড়েছিল ভারত জুড়ে। রামমোহন রায়ের সময় (১৭৭৫-১৮৩৩) থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু (১৯৪১) পর্যন্ত সময়কেই সাধারণভাবে নবজাগরণের সময় রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অবশ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন ১৭৫৭ সালে এক গতিশীল জাতির হাতে স্থিতিশীল আর এক জাতির পরাজয়ের মধ্যেই বাংলায় আধুনিকতার অস্ফুট সূত্রপাত ঘটেছে। এরপর ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে হেয়ার সাহেবের শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় আগমন, শ্রীরামপুর মিশনারিদের নানাবিধ উদ্যোগ, রামমোহন রায়ের কলকাতায় এসে বসবাস ও বিচিত্র কর্মোদ্যোগে আত্মনিয়োগ, ১৮১৫-য় 'আত্মীয়সভা' স্থাপন, ১৮১৭য় 'স্কুল-বুক সোসাইটি' স্থাপন, হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠা, ১৮১৮য় স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও সাময়িকপত্রের আবির্ভাব, সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮২৪), জেনারেল অ্যাসেম্বলীজ্ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ, ১৮৩০), মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৫), মতিলাল শীলস্ ফ্রী স্কুল অ্যান্ড কলেজ (১৮৪২), প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৮৫৫), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭), বিদ্যাসাগর কলেজ (১৮৭২), হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় (১৮৭৩), বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় (১৮৭৬), ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স (১৮৭৬), বেথুন কলেজ (১৮৭৯), রিপন কলেজ (১৮৮৪, বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন (১৯০৬, বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১), আশুতোষ কলেজ (১৯১৬), ক্যালকাটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর (১৮৫৬) প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা স্মরণীয় হয়ে আছে। উপনিষদের মূল সূত্রগুলিকে উদ্ধার করে মনীষীগণ সাধারণ মানুষের অন্ধ সংস্কার দূরীকরণে (সতীদাহ, নদীবক্ষে সন্তান বিসর্জন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, জাত-পাত ভেদাভেদ, জাতিগত ঘৃণা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি) সচেষ্ট হলেন। খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, কেননা প্রধানত তাঁদেরই উদ্যোগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এ কাজে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকারও আইন পর্যন্ত প্রণয়ন করে বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা নেন। এই সময়ে বাংলায় এক অভূতপূর্ব বৌদ্ধিক জাগরণ লক্ষ করা যায়। ধর্ম, জাতপাত, সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ে সমাজমানসে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়। সমাজে যৌক্তিকতার প্রসারে ও ধর্মীয় আচার সংস্কারের বিরুদ্ধে 'ইয়ংবেঙ্গল' আন্দোলনের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যার পথপ্রদর্শক ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তাঁর অনুগামী বন্ধু-শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, উমাচরণ বসুর নাম করা যায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (১৮২৮) বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় বিষয় নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনার সভা হিসেবে স্মরণীয়, যেমন স্মরণীয় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত 'পার্থেনন' পত্রিকা, যেখানে তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে, জন্মসূত্রে হিন্দু হলেও শিক্ষায় ও আচার-আচরণে তাঁরা ইউরোপীয় চরিত্রের অনুবর্তী। মূলত ডিরোজিওর প্রভাবেই ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি অনাস্থা, দেবদেবীদের প্রতি অশ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের প্রতি অভক্তি ও খাদ্যখাদ্যে বিচারহীনতা ও বিদেশীয় চালচলনের অনুসরণের প্রবৃত্তি গড়ে ওঠে। অন্যায়, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সোচ্চার বিদ্রোহের কারণেই তাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ব্রাহ্ম-সমাজের অবদানের কথাও এই ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলনের পটভূমিকায় শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্ম নেতাদের প্রচেষ্টায় প্রাচীন বৈদান্তিক এবং ঔপনিষদিক ধর্মের নতুন মূল্যায়নে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামি থেকে মুক্তি ঘটেছিল। তাঁদের একেশ্বরবাদের প্রচার সমাজকে সে সময় আলোড়িত করেছিল। এ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের নাম করা যায়। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত বহু ব্রাহ্ম ব্যক্তিত্বকে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। হিন্দুধর্মের সংস্কার এবং বিকাশসাধনে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁদের শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র পুণ্য আদর্শ আজও 'রামকৃষ্ণমঠ ও মিশন' সারা বিশ্বজুড়ে পালন করে চলেছেন এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহের পর সাহিত্যে নবজাগরণের বিপুল প্রভাব লক্ষ করা যায়। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-পরবর্তীকালীন এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সব মানুষের উপযোগী করে লেখা সমাজ-সমস্যামূলক নানা রচনায়, মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র-প্রমুখ সাহিত্যকারদের কাব্য-কবিতা আখ্যানকাব্য-মহাকাব্য, ঐতিহাসিক কাহিনি, নাটক, সমালোচনা প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে আধুনিকতার রূপ ফুটে উঠল। ঠাকুর-পরিবারের সদস্যেরাও এই সময়পর্বে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। উনিশ শতকে বিজ্ঞানসাধনা ও বিজ্ঞানচর্চার নানা ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ তাঁদের প্রতিভা ও মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

পূর্ববর্তী শতাব্দীর রাজনৈতিক ঘনঘটা, মন্বন্তর প্রভৃতি কবিগান, টপ্পা, যাত্রা, পাঁচালি, ঢপ, কীর্তন, ভক্তিগীতি আর প্রেমগীতিকার যুগে সাহিত্যে সেভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু উনিশ শতকের সূচনাপর্বের গদ্যে, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখের রচনায় সমাজের নানান অসঙ্গতি, ভাঙ্গাচোরা চেহারা ফুটে উঠেছিল। পরবর্তী গদ্যে সেই সমাজ-চেতনারই বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনিবার্য প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি সাংবাদিকসুলভ মনোবৃত্তি তথা যুক্তি তর্কের বাতাবরণ গড়ে উঠল। ছাপাখানার যুগের আধুনিকতা ও গতিশীলতার পূর্ণ সুযোগ সাহিত্য সেসময়ে গ্রহণ করল। মূলত পদ্য ও পুথিবাহিত সাহিত্যের যুগ শেষ হয়ে আধুনিক বাঙালির চিন্তা ভাবনা, জীবনজিজ্ঞাসা, ধ্যানধারণার বাহক গদ্যের প্রতিষ্ঠাই উনিশ শতকের সর্বোত্তম প্রাপ্তি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপর বিদেশি সাহিত্যকারদের (শেক্সপিয়র, বায়রন, স্কট, মিলটন, কাউপার, পোপ, ড্রাইডেন প্রমুখ) রচনা, পাশ্চাত্য মহাকাব্যের প্রভাব অনিবার্যভাবেই এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিলো, একই সঙ্গে মাতৃভাষায় উন্নত সাহিত্যচর্চায়ও সাহিত্যিকেরা ক্রমশ উদ্বুদ্ধ হলেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রের, বহুবিচিত্র সেইসব বিভিন্ন ধারার খোঁজ নেব।

বাংলা সাময়িকপত্রের উদ্ভব ও বিকাশ :

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর দ্বারা বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয়, আর তা ক্রমশ স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সাময়িকপত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ছাপাখানার প্রচলনে সাময়িকপত্রের প্রসার ত্বরান্বিত হল। একাধিক লেখকের নানা লেখার সংকলন সাময়িকপত্র বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছল পাঠ্য পুস্তকের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে। ভাষার শক্তি যেমন বাড়ল, তা ক্রমশ সরল ও সর্বজনবোধ্য হতে লাগল। বিভিন্ন সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা সময়ে আন্দোলনের ঢেউ সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাতেও লক্ষ করা গেছে, তা হয়ে উঠেছে গণমাধ্যম এবং সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার। এছাড়াও বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের পটভূমি হিসেবে সাময়িকপত্র তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। সমালোচনা সাহিত্য প্রকাশেও সাময়িকপত্রের অবদান অপরিসীম। শুধু পাঠক এতে সুযোগ্য নির্দেশনা ও পরামর্শ পান তাই নয়, অনেকক্ষেত্রে লেখকও উৎসাহিত হয়ে পরবর্তী রচনায় মনোনিবেশ করে থাকেন। এমনও ঘটেছে, কোনো কোনো সাময়িকপত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী, যেমন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', তারপরে 'বঙ্গদর্শন', এছাড়া আরও পরে বিংশ শতাব্দীতে 'কল্লোল', 'পরিচয়', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জাতির সমস্ত ভালো-মন্দ, আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন, কল্পনা, হতাশা-প্রাপ্তি, আনন্দ-বেদনার রূপায়ণ সাময়িকপত্রের সূচনা পর্ব থেকেই পত্রপত্রিকার পাতায় প্রতিফলিত হয়ে এসেছে।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে জনক্লার্ক এবং মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'দিগ্‌দর্শন' মাসিক পত্রিকা (এপ্রিল, ১৮১৮) প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাময়িকপত্রের পথচলা শুরু হয়েছিল। অগণিত সাময়িকপত্রে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি, ঝোঁকবদল, বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলনের রেখাপাত ঘটেছে। একই সঙ্গে মানুষের পরিবার, ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে, নক্‌শা জাতীয় রচনায়-কবিতায়-প্রবন্ধে-আখ্যানে ধরা পড়েছে আশা-আকাঙ্ক্ষা মথিত সামাজিক জীবন। শ্রীরামপুর মিশন থেকেই জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদনায় খ্রিষ্টধর্মের মহিমা প্রচারমূলক 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩মে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে হরচন্দ্র রায় এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'বাঙাল গেজেটি' পত্রিকা প্রকাশিত হয় (প্রথম প্রকাশ ১৪মে, ১৮১৮) যদিও তার কোনো নমুনা পাওয়া যায়নি। বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাঙালিদের প্রথম উদ্যোগ হিসাবে 'বাঙাল গেজেটি' স্মরণীয় হয়ে আছে। 'সম্বাদকৌমুদী' ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে ৪ ডিসেম্বর রামমোহন রায়ের উদ্যোগে এবং তারাচাঁদ দত্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সহযোগিতায় ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। একসময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের এই মুখপত্রে ধর্ম, রাষ্ট্র, বিজ্ঞান, ঐশ্বরিকতা, দেশ-বিদেশের খবর, উল্লেখযোগ্য চিঠিপত্র প্রকাশিত হত। রামমোহন রায় ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এই পত্রিকায় ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে গোঁড়া হিন্দুদের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয়। এছাড়াও রঙ্গব্যঙ্গধর্মী, রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের বিবরণমূলক ও সমাজ-সমস্যাসংক্রান্ত বহু লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ১৮২৯ খ্রি: নীলরত্ন হালদারের সম্পাদনায় 'বঙ্গদূত' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ-সাপ্তাহিকটির পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনার দায়িত্ব বিভিন্ন সময়ে রামমোহন

রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ নিয়েছিলেন। সেকালের রাজনীতি ও অর্থনীতির বিষয় সম্পৃক্ত বহু রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে কবি ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় 'সম্বাদ প্রভাকর' (সংবাদ প্রভাকর) প্রকাশিত হয়। ১৮৩২ সালের ২৫ মে'র পর পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৮৩৬ সালে তা পুন: প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক, তারপরে সপ্তাহে তিনবার প্রকাশের পরে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে দৈনিক প্রকাশিত হতে থাকে। এটিই ভারতীয় ভাষায় প্রথম দৈনিক পত্রিকা। এই পত্রিকাতেই প্রথম সংবাদ-পরিবেশনের নিয়ম-কানুন লক্ষ করা যায়। বহু প্রথিতযশা সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই পত্রিকার পাতায়—যেমন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া এই পত্রিকায় ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্তর মতো প্রখ্যাত প্রাচীন কবিদের, বহু কবিগান স্রষ্টা ও গায়কদের জীবনী প্রকাশ ও কাব্যের পর্যালোচনা করা হত। সংবাদ, সাহিত্য, রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম বিষয়ে বহু মননশীল রচনা প্রকাশের পাশাপাশি রঙ্গব্যঙ্গমূলক রচনা প্রকাশ ও 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' আয়োজনের জন্যও পত্রিকাটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৮৩১ সালেই দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ইয়ং বেঙ্গলের মুখপাত্র সাপ্তাহিক 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৮৩৩ সালের প্রথম থেকে এর একটি ইংরাজি সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বহু যুক্তিনির্ভর, আধুনিক রচনা সমাজকে আলোড়িত করেছিল এবং প্রগতিবাদী চিন্তাধারাকে উৎসাহিত করেছিল। ১৮৩১ খ্রি: হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম বাংলা পত্রিকা 'জ্ঞানোদয়' প্রকাশিত হয়। এখানে পুরাবৃত্ত, জীবনচরিত প্রকাশের পাশাপাশি প্রাণিবৃত্তান্ত ও বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। ১৮৩২ খ্রি: প্রকাশিত 'বিজ্ঞান সেবধি' পত্রিকাও বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত থেকেছে। ১৮৩৫ খ্রি: 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রকাশিত হলে বিদ্যাচর্চায় এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার বছর তিনেক পরে ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় এবং অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। বহু বিখ্যাত ব্যক্তি-যেমন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তত্ত্ববোধিনী সভার এই মুখপত্রটিতে ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজনীতি, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে চিন্তাশীল রচনা প্রকাশিত হত। দেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি ইউরোপীয় সংস্কৃতির তথ্যবহুল পরিচয় প্রকাশ এই পত্রিকার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। এই পত্রিকাটি তার বিচিত্রস্বাদী রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির রুচি, আগ্রহ, সৃষ্টিশীলতাকে এক অসামান্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু-প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বিলিতি 'পেনি ম্যাগাজিনে'র আদর্শে বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। প্রকাশের ক্ষেত্রে অনিয়মিত এই পত্রিকাটিতে পুরাবৃত্ত, মনীষীদের জীবনকথা, তীর্থক্ষেত্র-পরিচিতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য সমালোচনা—সবেরই সন্ধান মিলত। নানান ধরনের চিত্রসমৃদ্ধ এই পত্রিকায় মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছেলেবেলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই পত্রিকার স্মৃতি 'জীবনীস্মৃতি' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। জ্ঞানচর্চার সঙ্গে শিল্পগত উৎকর্ষের যে সম্মিলন বিবিধার্থ সংগ্রহে শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২ খ্রি.) পত্রিকায় তারই উজ্জ্বলতর প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এই দুই পত্রিকা প্রকাশের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ১৮৫৮

খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সমাজ সমস্যামূলক রচনার পাশাপাশি কৃষকদের সচেতন করার প্রচেষ্টা, নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রসার—প্রভৃতি বিষয়ে এই পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতেও বাঙালি মনীষার বিচ্ছুরণ ঘটেছে সমাজ-রাজনীতি-শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনায়, বঙ্কিম লিখিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধে ও সাহিত্য সমালোচনায়, ব্যঙ্গনির্ভর কৌতুক রচনায়। এই পত্রিকার লেখকদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পর কিছুকাল সঞ্জীবচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র এই পত্রিকার সম্পাদনা করলে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রহণ করেন। ১৩০৯-১৩১২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনার কালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তীব্রতা ও স্বদেশি আন্দোলনের উন্মাদনা সমাজকে আলোড়িত করেছিল। এই সাময়িক পত্রে সেই যুগলক্ষণের নির্ভরযোগ্য দলিল লিপিবদ্ধ রয়েছে।

'দিগ্‌দর্শন' থেকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা পর্যন্ত সাময়িকপত্রের ধারা পর্যালোচনায় দেখা যায় এ সময়ে মূলত সংবাদ পরিবেশন, তথ্য আহরণ ও তা বিতরণেই সাময়িকপত্রগুলি নিয়োজিত থেকেছে। সমাজ-রাজনীতি-ধর্ম-দর্শন-শিক্ষা সম্পর্কিত যুক্তিনিষ্ঠ ও নীতি-নির্ভর প্রবন্ধ-কবিতাই আলোচ্য কালপর্বে (১৮১৭-১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ) রচিত হয়েছে। গদ্য ক্রমশ তার কাঠিন্য ও নীরসতা বর্জন করে সরস ও সর্বজনবোধ্য হয়ে উঠেছে।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে মূলত ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমরূপে গড়ে ওঠা 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপুল অবদান ছিল। সম্পাদকদের মধ্যে ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। স্বদেশীয় ভাষার আলোচনা, জ্ঞানচর্চা, ভাবস্ফূর্তি-এ সবই ছিল এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য। এই পত্রিকায় প্রকাশিত ছোটোগল্প প্রবন্ধ, কবিতা, রসরচনা, গ্রন্থসমালোচনা, সংবাদ প্রভৃতি বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ) 'সাধনা' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটলে তার প্রথম সম্পাদক হন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদিও এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ২৫ শে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩-এ তাঁর লিখিত একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন—'সাধনা' আমার হাতে কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্যছেদন করবার জন্যে একে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না-একে আমি বরাবর আমার হাতে রেখে দেব।' সাহিত্য, সংগীত, শিল্প, দর্শন, রাজনীতি, কবিতা, গদ্য সবধরনের রচনাই 'সাধনা'য় মুদ্রিত হত। শাস্ত্রীয় আলোচনা থেকে সাময়িক পত্রকে মুক্তি দিয়ে তাকে বুদ্ধিনির্ভর পথে পরিচালিত করার অন্যতম পথিকৃৎ 'সাধনা' পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'দালিয়া', শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উপন্যাস 'কৃতজ্ঞতা' এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ প্রবাসী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা ' প্রবাসী' বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি পত্রিকা। রাজনীতি, সমাজনীতি, সংগীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য বিষয়ে যশস্বী ব্যক্তিবর্গ এই পত্রিকায় লিখতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক। বঙ্গদেশের বাইরে এমন মাসিকপত্র বের করার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে 'প্রবাসী'

স্মরণীয় হয়ে আছে। এই পত্রিকা তার সর্বভারতীয় আবেদনে, প্রবাসী বাঙালির চিন্তার প্রতিফলনে, উচ্চমানের দেশি-বিদেশি চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ছবি মুদ্রণে উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। ১৩২০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (১৯১৩ সালে) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সম্পাদনায় মাসিকপত্র 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি সচিত্র পত্রিকা, যার প্রথম সংখ্যার সূচনা অংশ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর জলধর সেন এর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী প্রমুখ এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ', 'দেবদাস', 'দেনাপাওনা', 'দত্তা' প্রভৃতি উপন্যাস এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের বহু রচনা প্রকাশিত হওয়ায় 'যমুনা' (প্রকাশ-১৯১৩, ধীরেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত) পত্রিকা যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল। এই পত্রিকায় তাঁর 'রামের সুমতি', 'চন্দ্রনাথ', 'নিষ্কৃতি', 'পরিণীতা', 'নারীর মূল্য' প্রকাশিত হয়েছিল। 'নারায়ণ' পত্রিকার (১৯১৪) সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের নাম জড়িত। চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত এই পত্রিকায় তিনি এবং রবীন্দ্রনাথ যুগ্মভাবে একটি প্রবন্ধ লেখেন। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিপিনচন্দ্র পাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ।

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রমথ চৌধুরীর (ছদ্মনাম, বীরবল) সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সবুজপত্র' অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকায় যৌবনের বন্দনা, কৃত্রিমতা ও জড়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছিল। সাধুরীতি ছেড়ে চলিত ভাষা বা মৌখিক ভাষার উপর গুরুত্ব প্রদান এই পত্রিকার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বহু নতুন লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশংকর রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এই পত্রিকায় লিখতেন। রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান' কবিতা, 'অপরিচিতা', 'হৈমন্তী' গল্প, 'ঘরে বাইরে' 'চার অধ্যায়' উপন্যাস, অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছরে এই পত্রিকা প্রকাশের পর, বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের যুবমানসে যখন বঞ্চনা, হতাশা, গ্লানিবোধ ব্যাপ্ত হয়ে আসে, তখন, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে গোকুলচন্দ্র নাগ ও কবি দীনেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে সাময়িকপত্রে আধুনিকতার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সমস্ত ধরনের বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এর প্রতিটি রচনায় ঘোষিত হয়। রবীন্দ্র ভাবাদর্শ থেকে সরে এসে যাঁরা এই পত্রিকায় সাহিত্যসাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক, প্রবোধকুমার সান্যাল, অজিত দত্ত প্রমুখ। বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা', জীবনানন্দ দাশের 'ঝরা পালক' এই পত্রিকায় প্রকাশিত হল। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'শনিবারের চিঠি' সজনীকান্ত দাসের পরিচালনায় এবং যোগানন্দ দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলে কল্লোল বিরোধিতা তার অন্যতম মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে, যাতে প্রধান ভূমিকা নিতেন সজনীকান্ত দাস ও তাঁর অনুরাগীরা। রবীন্দ্র-সমালোচনাতেও 'শনিবারের চিঠি' ব্যাপৃত থেকেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ এই বিরোধিতামূলক সাহিত্য-পত্রিকায় সারস্বতচর্চা করেছেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় 'পরিচয়' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। আবেগসর্বস্বতাকে দূরে সরিয়ে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'পরিচয়' পত্রিকা আত্মনিয়োগ করে। প্রগতিমূলক সমাজ ও সাহিত্য চিন্তার প্রকাশ এই পত্রিকায় লক্ষ করা যায়। নীরেন্দ্রনাথ রায়, বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, সমর সেন, সমরেশ বসু, প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রমুখ এই পত্রিকায়

লিখেছেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'কালিকলম' পত্রিকায় কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরাই মূলত লিখতেন। আদর্শগত দিক থেকেও কল্লোলের সঙ্গে কালিকলমের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে অজিত দত্তের পরিচালনায় প্রকাশিত 'প্রগতি' পত্রিকাতেও একই আদর্শের সম্প্রসারণ ঘটেছে। এই কবিতা পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা প্রকাশের পাশাপাশি গ্রন্থ সমালোচনাও প্রকাশিত হতো। এই একই ধারায় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কবিতা ও কবিতা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'কবিতা' বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। নতুন পৃথিবীর স্বপ্নে বিভোর লেখক-কবিরা নতুন কালের স্বপ্নকে এই পত্রিকায় বাণীরূপ দিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ, সমর সেন প্রমুখ কবিরা এই পত্রিকায় লিখেছেন। এরই মধ্যে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় 'দেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা বহু সাহিত্যিক এই পত্রিকায় লেখনী ধারণ করেছেন। এই পত্রিকায় সাগরময় ঘোষের অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, যোগেন্দ্রমোহন সেন প্রমুখ 'দেশ' পত্রিকার প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাংলা গদ্য-প্রবন্ধের ধারা :

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কবিতা ও গানের আধিপত্যের মধ্যে কেবল সামান্য কিছু চিঠিপত্রে ও দলিল দস্তাবেজেই গদ্যের প্রচলন লক্ষ করা যায়। বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শনের মধ্যে দোম আন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' এবং মনো-এল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামের প্রশ্নোত্তরমূলক রোমান ক্যাথলিক ধর্মের তত্ত্বকথা-নির্ভর গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। পর্তুগিজ পাদ্রি মনো-এল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও পর্তুগিজ ভাষায় একটি বাংলা শব্দকোষ এবং একটি বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন যাতে সে দেশের ধর্মপ্রচারকেরা এদেশে এসে সহজে দেশীয় ভাষা শিখে নিয়ে ধর্মপ্রচার করতে পারেন। এভাবেই বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের সূত্রে বাংলা গদ্যগ্রন্থ লেখা শুরু হয়। পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজরা রাজ্য শাসনের জন্য বাংলা লেখার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে বাংলায় গ্রন্থরচনায় তৎপরতা দেখাতে শুরু করেন। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার মিশনারিরাই বাংলা ভাষা চর্চা শুরু করে বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। এই মিশনারিদের মধ্যে উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম ওয়ার্ড, জশুয়া মার্শম্যান-এর নাম উল্লেখযোগ্য। বাইবেলের অনুবাদ, যিশুর চরিত-কাব্য-নিবন্ধ, বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার পাশাপাশি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ, বাংলা হরফে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থাও তাঁরা করেন। এতে এ যাবৎ পুথি নির্ভর বাংলা পদ্য-গদ্যের প্রসার বাড়ে। নতুন বাংলা হরফ হালহেড সাহেবের 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তরুণ ইংরেজ রাজকর্মচারিদের দেশীয় ভাষা-শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হলে উইলিয়াম কেরি সংস্কৃত ও বাংলার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর গদ্যরচনা প্রচেষ্টার পরিচয় বাইবেলের বাংলা অনুবাদে, 'ইতিহাসমালা'য়, 'কথোপকথন'-এ বিধৃত রয়েছে। কথ্যভাষায় গদ্যরচনা করে তিনি পরবর্তী গদ্যকারদের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছেন। এছাড়া তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারতের কিছু অংশ, বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ, বাল্মীকি রামায়ণের মতো গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর নেতৃত্বে সংস্কৃত, মারাঠি, পাঞ্জাবি, কন্নড় প্রভৃতি ভাষায় অভিধান গ্রন্থ, ব্যাকরণ রচিত হতে থাকে। কেরির সহযোগী পণ্ডিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, চণ্ডীচরণ মুনসী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখ। রামরাম বসুর

'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' আর 'লিপিমালা', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজাবলী', 'হিতোপদেশ', চণ্ডীচরণ মুনসীর 'তোতা ইতিহাস', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্', হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' ইত্যাদি বাংলা গদ্য রচনার প্রথম যুগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আরবি ফারসি শব্দ কিংবা সংস্কৃত শব্দে ভরা এসব পাঠ্যপুস্তক ছিল দুর্বোধ্য এবং অনুবাদ ও অনুকরণের গণ্ডিতে আবদ্ধ। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) প্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যকে ব্যবহার করলেন। ধর্ম, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতির কথা তিনি গদ্যে আলোচনা করে তার শক্তি প্রকাশ করলেন। তাঁর গদ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'বেদান্তগ্রন্থ', 'বেদান্তসার', 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার', 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তক সম্বাদ', 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'কবিতাকারের সহিত বিচার', 'পথ্যপ্রদান' ইত্যাদি। তিনি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে প্রথম বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থও লেখেন। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন 'উপদেশকথা', 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসেবেও ডিরোজিওর এই ভাবশিষ্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত 'ষড়দর্শন সংবাদ' একটি দর্শনতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। মূলত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা পরিচালনা সূত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) বাংলা গদ্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর রচিত ধর্ম, দর্শন, আধ্যাত্মিক সাধনামূলক গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'ব্রাহ্মধর্ম', 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা', 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস', 'খ্রীষ্ট ধর্মের ব্যাখ্যা', 'আত্মজীবনী' ইত্যাদি। তাঁর রচনায় স্পষ্টতা, অনুভূতিপ্রবণতা, সহজ সরল বর্ণনা, সর্বোপরি উপনিষদের ভাবরসে জারিত মননের স্পর্শ পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)-এর নাম স্মরণীয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ভবানীচরণ ব্যঙ্গাত্মক ও নক্‌শা জাতীয় রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন, যার মধ্যে 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস' উল্লেখযোগ্য। কলকাতার তৎকালীন বাঙালি সমাজ তাঁর বিদ্রুপাত্মক দৃষ্টিতে গ্রন্থগুলিতে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর রচনায় বহু ইংরাজি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। 'বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) রচিত অনুবাদমূলক রচনার মধ্যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'বাংলার ইতিহাস', 'শকুন্তলা' 'সীতার বনবাস' 'ভ্রান্তিবিলাস', 'মহাভারতের উপক্রমণিকা' প্রভৃতি, সমাজ সংস্কারমূলক রচনার মধ্যে 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' ইত্যাদি, শিক্ষামূলক রচনার মধ্যে 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'আখ্যান মঞ্জরী' ইত্যাদি, ছদ্মনামে লেখা হাস্যরসাত্মক রচনার মধ্যে 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর আত্মজীবনীটি (বিদ্যাসাগর চরিত) একটি অসম্পূর্ণ রচনা। এছাড়া তিনি 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' নামে একটি ব্যক্তিগত শোক আখ্যান রচনা করেন। ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক তাঁর একটি মৌলিক রচনা 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'। কথ্য ভাষায়, হালকা ছাঁদে লিখিত তাঁর দুটি গ্রন্থ 'ব্রজবিলাস' ও 'রত্ন-পরীক্ষা'। সাধু বাংলা গদ্যের সৌন্দর্য বিদ্যাসাগরে হাতেই বিকশিত হয়। ভাষার ওজস্বিতার সঙ্গে রচনার লালিত্য বিদ্যাসাগরের অবদান। তাঁর রচিত ভিত্তির উপরই পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) উনিশ শতকের মননশীল প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক এই মানুষটির শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', তিন খণ্ডে বিভক্ত 'চারুপাঠ', 'ধর্মনীতি' এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা এবং বহির্বাণিজ্য' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং বিজ্ঞান,

ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে স্বচ্ছন্দচারিতা তাঁর প্রবন্ধে অননুকরণীয় মননশীলতা এনেছে এবং বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতির সার্থক প্রয়োগে তা যথেষ্ট প্রসাদগুণেরও অধিকারী হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২৪-১৮৯১) বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে 'প্রাকৃত ভূগোল', 'শিবাজী চরিত্র' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্কর তর্করত্ন (১৮২৮-১৮৫৮) 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা', 'পশ্বাবলী', 'কাদম্বরী' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি অনুসরণকারীদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'আশ্চর্য স্বপ্ন', 'স্বদেশীয় ভাষা অনুশীলন', 'আর্যজাতির উৎপত্তি ও বিচার', 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' ১ম ও ২য় ভাগ, 'সেকাল আর একাল', 'হিন্দুর আশা', 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' প্রভৃতি। তাঁর গদ্য সাবলীল ও স্বাদু। আজীবন মাতৃভাষা চর্চা করেছেন ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়ে সোচ্চার থেকেছেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-১৮৮৬) ছিলেন 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য দুটি গদ্যগ্রন্থ 'রোমরাজ্যের ইতিহাস' ও 'গ্রীস রাজ্যের ইতিহাস'। তিনি সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় গদ্য রচনা করেছেন। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)। তাঁর 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ, 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স ও শিক্ষা সংক্রান্ত রচনাবলির মধ্যে 'শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব', 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান', 'পুরাবৃত্তসার', 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। সুললিত সংস্কৃত বহুল গদ্য তাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রথম সার্থকভাবে চলতি ভাষা ব্যবহারের কৃতিত্বের অধিকারী, এর আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নববাবু বিলাসে (১৮২৫) এই রীতির প্রবর্তন করতে গিয়ে সমধিক নিন্দিত হলেও ১৮৫৮-য় 'আলালের ঘরের দুলাল' -এ একই ধরনের গদ্যরীতির অনুবর্তন করে প্যারীচাঁদ পাঠক সমাজের প্রবল সমাদর লাভ করেন এবং টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেন। তাঁর গদ্যরীতি 'আলালী গদ্য' নামে বিখ্যাত। প্যারীচাঁদের রচনাগুলিকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে—(১) প্রবন্ধ রচনা-'কৃষিপাঠ', 'যৎকিঞ্চিৎ' (২) জীবন-আখ্যান—'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত', কথোপকথন মূলক নীতি আখ্যান-'রামারঞ্জিকা', 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা', 'বামাতোষিণী' (৩) সমাজ-সংস্কারমূলক রচনা-'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (৪) ব্যঙ্গাত্মক নক্শাজাতীয় রচনা—'আলালের ঘরের দুলাল', 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কী উপায়'। কলকাতার চলতি বুলির মাধ্যমে কৌতুক রসসৃষ্টি এবং বিভিন্ন খাঁটি বাংলা বাগ্‌ধারা, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈতও বাগ্‌রীতির ব্যবহারে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) ছিলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র, 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র এবং 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। স্বল্পকালীন জীবনে একদিকে যেমন মহাভারত, গীতা অনুবাদ করেছেন, সংস্কৃত নাটক অনুসরণে 'বিক্রমোর্বশী', 'সাবিত্রী সত্যবান', 'মালতীমাধব' নাটক ও 'বাবু' নামক প্রহসনও রচনা করেছেন, তেমনই তাঁর প্রতিভা নক্শা জাতীয় গদ্যে স্ফূরিত হয়েছে। বস্তুত এই শেষোক্ত ক্ষেত্রটিতেই তিনি স্বরাট ও স্বমহিমায় বিরাজমান। 'হুতোম প্যাঁচা' ছদ্মনামে রচিত তাঁর সমাজ সচেতনতামূলক রচনা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' আলালী গদ্যের চেয়েও সরেস, তীব্র শ্লেষাত্মক ও অধিকতর জীবনস্পর্শী ভাষায় রচিত। উনিশ শতকীয় কলকাতার ও তার পার্শ্ববর্তী শহরতলির কলুষ-কালিমা লিপ্ত ভ্রষ্টাচারময় উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী জীবনযাত্রার পরিচয় গ্রন্থটিতে লাভ করা যায়। কথ্য ভাষা যে তার যথাযথ উচ্চারণভঙ্গি নিয়েও সাহিত্যের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে তা তিনিই প্রথম প্রমাণ করে দিয়েছেন।

উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) একদিকে যেমন রুশো, মিল, বেন্থাম, কোঁৎ প্রমুখ ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের মানবতাবাদী ও উপযোগবাদী দর্শনের অনুরক্ত ছিলেন, শেষ বয়সে তিনিই ছিলেন হিন্দু দেশাত্মবোধের অন্যতম প্রধান উদ্‌গাতা। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে একটি সম্পূর্ণ যুগ ধরে বাঙালি পাঠক সমাজের রুচি ও সাহিত্যবোধ তিনি যেমন নির্মাণ করেছেন, তেমনই মননশীল প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি তার উপযুক্ত পাঠকও তৈরি করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে (১) জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক—'বিজ্ঞান রহস্য', (২) ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক—'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা', (৩) সাহিত্য-সমালোচনা মূলক—'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ভাগ, ২য় ভাগ), 'বিবিধ সমালোচনা'। (৪) সমাজ বিষয়ক—'সাম্য', 'লোকশিক্ষা', (৫) বিবিধ—'কমলাকান্তের দপ্তর', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান গুণ মননশীলতা, যুক্তিবাদিতা, উপযোগবাদী মানবতাবোধ ও কল্যাণচিন্তা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বদেশভাবনা, আধ্যাত্মিকতা ও কবিমনের কল্পনাদৃষ্টি। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দক্ষতা হল বিষয়ানুসারী ভাষা নির্বাচন ও তার ব্যবহার। 'কৃষ্ণচরিত্র' বা 'সাম্য' রচনায় যে ওজস্বিতা ও নিবিড় যুক্তি শৃঙ্খলা দেখা যায়, কমলাকান্তের কল্পনাবিলাসী চিত্রালংকার বহুল কাব্যধর্মিতার সঙ্গে তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

বঙ্কিম সমকালের প্রাবন্ধিকদের অনেকেই ছিলেন তাঁর শিষ্যস্থানীয়। এঁদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ('সমাজ সমালোচনা' 'সনাতনী' 'রূপক ও রহস্য'), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ('বাঙলার ইতিহাস', 'নানা প্রবন্ধ'), চন্দ্রনাথ বসু ('শকুন্তলাতত্ত্ব', 'ত্রিধারা', 'হিন্দুত্ব', 'বাঙালী সাহিত্যের প্রকৃতি', 'সাবিত্রীতত্ত্ব'), কালীপ্রসন্ন ঘোষ (প্রভাতচিন্তা', 'ভ্রান্তিবিনোদ', 'নিশীথচিন্তা', 'নিভৃতচিন্তা'), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ('বাল্মীকির জয়, 'মেঘদূত', 'ভারতমহিলা', 'প্রাচীন বাঙ্গালার গৌরব', 'বৌদ্ধধর্ম'), সঞ্জীবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ('যাত্রা সমালোচনা') দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('তত্ত্ববিদ্যা', 'স্বপ্নপ্রয়াণ'), প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ('গ্রীক ও হিন্দু'), কেশবচন্দ্র সেন ('সুলভ সমাচার', 'নববিধান', 'বালকবন্ধু', 'জীবনবেদ'), রামদাস সেন ('ভারত রহস্য', 'বুদ্ধদেবের জীবন ও ধর্মনীতি'), রজনীকান্ত গুপ্ত ('সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'), যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ('গ্যারিবল্ডির জীবনবৃত্ত', 'চিন্তাতরঙ্গিনী'), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ('মশলা বাঁধা কাগজ'), ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ('সাহিত্যমঙ্গল', 'সোহাগচিত্র'), বীরেশ্বর পাঁড়ে ('বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দু আদর্শ') রমেশচন্দ্র দত্ত ('মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র', 'বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য') প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) মূলত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং 'আত্মচরিত'—গ্রন্থদুটির জন্যই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে চিরকালীন স্থান করে নিয়েছেন। প্রথমটিতে নিজের শিক্ষকের এবং শেষোক্তটিতে নিজের জীবনচরিত্রের প্রসঙ্গে উনিশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে সরস, বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে পারার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'এই কি ব্রাহ্মবিবাহ', 'গৃহধর্ম', 'জাতিভেদ', 'রামমোহন রায়', 'বক্তৃতাস্তবক', 'মাঘোৎসবের উপদেশ', 'মাঘোৎসবের বক্তৃতা', 'ধর্মজীবন' (তিন খণ্ডে) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মীর মশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাস, 'জমিদারদর্পণ' নাটক ছাড়াও 'গো-জীবন', 'হজরত বেলালের জীবনী', 'আমার জীবনী', 'মোসলেম ভারত', 'বিবি কুলসম' প্রভৃতি গ্রন্থের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এছাড়া হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নিরসন প্রসঙ্গে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় 'কোহিনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'সৎ প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সন্ন্যাসী, চিন্তানায়ক, দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দ

(১৮৬৩-১৯০২) তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতার সাক্ষ্য রেখেছেন। তাঁর রচিত বাংলা গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা' ইত্যাদি। তাঁর রচনায় তৎকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা যেমন বর্ণিত হয়েছে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন, বেদ-উপনিষদ-পুরাণ-শাস্ত্রের প্রসঙ্গও অনিবার্যভাবে এসেছে। দেশাত্মবোধ ও মানবতার কল্যাণের আদর্শ তাঁর সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত। তিনি তাঁর প্রবন্ধে ভাষায় চলিত রীতির পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাঁর প্রাঞ্জল, গতিময় ভাষাছাঁদ তাঁর ব্যক্তিস্বভাবেরই প্রতিরূপ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ছোটোগল্প, কবিতা, উপন্যাস রচনার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারাজীবন অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলিকে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, রাজনীতি, সমাজ, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ, ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তাঁর ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্য' 'আধুনিক সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'বাংলা ভাষা পরিচয়', 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', 'ছন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ, যেখানে দেশি-বিদেশি, প্রাচীন—আধুনিক নানান কবি-সাহিত্যিক, সাহিত্য গ্রন্থ, সাহিত্যতত্ত্ব, ভাষা, ব্যাকরণ বা ছন্দ নিয়ে তিনি আপন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। স্বদেশ ও সমকালীন সমাজ-সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা চিন্তার প্রতিফলন 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'রাজাপ্রজা', 'স্বদেশ' 'কালান্তর', 'সভ্যতার সংকট' প্রভৃতি গ্রন্থে লক্ষ করা যায়। 'শিক্ষা' গ্রন্থে শিক্ষা-সংক্রান্ত তাঁর রচিত যাবতীয় প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর অধ্যাত্ম-দর্শনের কথা রয়েছে। তাঁর ভ্রমণকাহিনি, স্মৃতিকথা, ডায়েরি, রম্যরচনা, চিঠিপত্রের মতো ব্যক্তিগত রচনাগুলির মধ্যে, 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি', 'জাপান যাত্রী', 'যাত্রী', 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা', 'রাশিয়ার চিঠি', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'পথের সঞ্চয়', 'ছিন্নপত্র', 'বাতায়নিকের পত্র', 'পঞ্চভূত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), 'হিতবাদী', 'সবুজপত্র' পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্র সমকালের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, রাজশেখর বসু (পরশুরাম) অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ নাম স্মরণীয়। বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বহু বিজ্ঞান নির্ভর প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি 'প্রকৃতি', 'পুণ্ডরীক কুলকীর্ত্তি পঞ্জিকা', 'জিজ্ঞাসা', 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা', 'পদার্থবিদ্যা', 'মায়াপুরী', ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', 'চরিতকথা', 'কর্মকথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'ভূগোল', 'শব্দকথা', 'যজ্ঞকথা', 'বিচিত্র জগৎ', 'নানাকথা', 'জগৎকথা' ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের প্রচারে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। প্রধানত সংকলনধর্মী তাঁর রচনাগুলিতে বক্তব্য ও বিষয়—উভয়েরই সমগুরুত্ব লক্ষ করা যায়। শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন, নান্দনিকতা, স্বদেশ, সমাজ-সাহিত্য সংস্কৃতি-বিভিন্ন বিষয়ে লিখলেও সর্বক্ষেত্রেই তাঁর পরিমার্জিত সাহিত্যগুণ, সৃষ্টিশীলতা ও পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় সহজ ও উপমাবহুল ভাষায় তিনি অনেক গুরুতর বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এবং গদ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—'তেল-নুন-লকড়ি', 'বীরবলের হালখাতা', 'নানাকথা', 'আমাদের শিক্ষা', 'রায়তের কথা', 'নানাচর্চা, 'বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়', 'আত্মকথা' ইত্যাদি। তাঁর রচনায় চলিত গদ্যের প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশি ও বিদেশি শব্দের বৈদগ্ধ্যপূর্ণ মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। ব্যঙ্গ ও পরিহাস রসিকতা পূর্ণ রচনা তিনি যেমন লিখেছেন, তেমনই স্বদেশের নানা সমস্যার কথাও তাঁর বহু প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। তাঁর

রচনায় ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি সবই মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'বীরবল' ছদ্মনামেও তিনি অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) রচিত গদ্যগ্রন্থের মধ্যে 'শকুন্তলা', ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনি', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ', 'আলোর ফুলকি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অবনীন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ লক্ষ করা যায়। রূপকথা ও প্রাচীন লোককাহিনিকে ছোটোদের উপযোগী ভাষায় ও কল্পনায় রূপ দেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর শিল্পতত্ত্বে জ্ঞান ও আগ্রহের পরিচয় 'ভারতশিল্প' ও 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে। 'ঘরোয়া' এবং 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থ দুটি অনবদ্য স্মৃতিকথাধর্মী আখ্যান। শিল্পের সঙ্গে সাহিত্যের সম্মেলনেই অবনীন্দ্রনাথের সিদ্ধি। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে অন্যতম। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত এই বৈজ্ঞানিক আইস্টাইনের জীবনী লেখার পাশাপাশি 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান', 'শিল্প ও বিজ্ঞান', 'দেশবিদেশের বেতারচর্চা', 'বিজ্ঞানের সংকট' প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক ও বিজ্ঞান-নির্ভর প্রবন্ধ লিখেছেন। কুসংস্কার দূর করে মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যেই তাঁর এই সাহিত্য সাধনা। শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষাকেই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। শিক্ষণ পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা দূর করার বিষয়ে তাঁর মতামত আজও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক, গবেষক, পণ্ডিত তথা প্রাবন্ধিক দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষাও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা লিপির উদ্ভব থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তৃত অংশের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লিখিত বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের পরিচয়বাহী গ্রন্থ 'বৃহৎবঙ্গ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। 'রামায়ণী কথা', 'বেহুলা ও ফুল্লরা', 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান', 'পদাবলী মাধুর্য' তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯) 'চিত্র ও কাব্য' প্রবন্ধ গ্রন্থে আপন প্রতিভার মৌলিকতার স্পর্শ রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতো। তাঁর কাব্যধর্মী রচনাগুলিতে কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচনাগুলিকে-কাব্য সঙ্গীত ও সাহিত্য তত্ত্ব সম্পর্কে রচনা, চিত্রধর্মী রচনা, দেশ ও জাতির ঐতিহ্য সম্বন্ধীয় রচনা, দার্শনিক রচনা—ইত্যাদি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। প্রখ্যাত সমাজসেবী ও সুসাহিত্যিক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি 'সওগাত' 'নবনূর', 'ধূমকেতু', 'সাধনা' প্রভৃতি পত্রিকায় নারীমুক্তি ও নারী জাগরণ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ও প্রসারে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। হাস্যরসের গল্প রচনার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় রাজশেখর বসু প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উত্তরাধিকারী। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি লব্ধ অভিজ্ঞতাকে তিনি তাঁর প্রবন্ধে রূপ দিয়েছেন। তথ্যের সঙ্গে শ্লেষ তাঁর রচনায় সমাজ বাস্তবতাকে আরো গভীর করে তুলছে। ভাষা চিন্তা বিষয়ক তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ হলো 'গ্রহণীয় শব্দ', 'ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার', 'বাংলা ভাষার গতি', 'ভাষার বিশুদ্ধি' ইত্যাদি। এছাড়া জীবিকা, ধর্ম, কুটির শিল্প, খনিজ পদার্থ, সাহিত্যিকের ব্রত, সাহিত্যের পরিধি ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে তিনি প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করেছেন। রবীন্দ্র সমসাময়িক কালের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্তের নামও উল্লেখযোগ্য। 'সবুজপত্র' পত্রিকার এই বিশিষ্ট লেখক (১৮৮৪-১৯৬১) 'কাব্য জিজ্ঞাসা' নামে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হলো—'নদীপথে', 'ইতিহাসের মুক্তি', 'জমির মালিক', 'শিক্ষা ও সভ্যতা' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রোত্তর প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় মোহিতলাল মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, গোপাল হালদার, সৈয়দ মজুতবা আলী, অন্নদাশঙ্কর রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, বিনয় ঘোষ, সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) কাব্যরচনার পাশাপাশি বহু সার্থক ও স্মরণীয় প্রবন্ধগ্রন্থ লিখেছেন, যার মধ্যে 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য (উনিশ শতক), 'বঙ্কিম বরণ', 'কবি শ্রীমধুসূদন', 'সাহিত্য বিচার', 'সাহিত্য কথা', 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র কাব্য', 'বাংলার নবযুগ', 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস', 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' উল্লেখযোগ্য। মূলত সমালোচনামূলক এসব গ্রন্থে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ প্রসূত ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি কিছুকাল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং এই পত্রিকায় তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) তাঁর 'সাংস্কৃতিকী', 'ভারত সংস্কৃতি', 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন। বাংলায় লেখা তাঁর ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা', 'বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে' প্রভৃতি। নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী এই খ্যাতনামা মনীষী তাঁর রচনায় বিষয়ের ব্যাপ্তির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল যুক্ত পণ্ডিত ও গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস' রচনায় তাঁর মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকের জীবনী সংকলনে তাঁর প্রতিভার অনন্যতার স্পর্শ মেলে। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে আরেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২)। বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থরাজির মধ্যে রয়েছে 'ভাষার ইতিবৃত্ত', 'বাংলা স্থান নাম', 'বাংলায় নারীর ভাষা', 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (৫ খণ্ড), 'ভারতীয় আর্যসাহিত্যের ইতিহাস', 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য', 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' প্রভৃতি। 'গল্পের ভূত', 'ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি', 'কলকাতার কাহিনি', 'রামকথার প্রাক্ ইতিহাস', 'বটতলার ছাপা ও ছবি' প্রভৃতি গ্রন্থে বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও আলোচনার সরসতা লক্ষ করা যায়। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'দিনের পরে দিন যে গেল' অত্যন্ত সুললিত গদ্যে রচিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের মধ্যে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-কার এই লেখকের অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য', 'বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর', 'সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ' ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য' প্রভৃতি। তিনি বহু লেখকের রচনাবলির ভূমিকা লিখেছেন। তাঁর আত্মকথামূলক রচনা 'স্মৃতি বিস্মৃতির দর্পণে' একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। ইতিহাসনিষ্ঠার সঙ্গে আস্বাদনধর্মী রচনাশৈলীর বেণীবন্ধন তাঁর রচনায় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের বিখ্যাত ছাত্র ও পরবর্তীতে অধ্যাপক সুশোভন সরকার (১৯০০-১৯৮২) রবীন্দ্র-স্নেহধন্য ছিলেন। বাংলায় রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—'মহাযুদ্ধের পরে ইয়োরোপ', 'জাপানী শাসনের আসল রূপ', 'ইতিহাসের ধারা', 'সমাজ ও ইতিহাস', 'ইতিহাস চর্চা', 'প্রসঙ্গ ইতিহাস', 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি', 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ' প্রভৃতি। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিষয়বৈচিত্র্যে অদ্বিতীয়

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৮৬১) অনুবাদ সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ভারতীয় ঐতিহ্য, সঙ্গীত, দর্শন, রাজনীতি—বিভিন্ন বিষয়ের নিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। তাঁর রচিত 'মনে এলো', 'বক্তব্য', 'আমরা ও তাঁহারা', 'চিন্তায়সি', 'উপক্রমণিকা', 'কথা ও সুর' প্রভৃতিগ্রন্থে নানান স্মৃতিচারণা, তাঁর পরিচিত মনস্বী ব্যক্তিত্বের বর্ণনা, মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির উদ্ভাস এবং সংগীতচিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। স্মৃতিচারণ, শিল্পী জীবনের বর্ণময় অভিজ্ঞতার চিত্রায়ণ ঘটেছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) অজস্র দিনলিপিতে, যার মধ্যে রয়েছে—'অভিযাত্রিক', 'স্মৃতির রেখা', 'তৃণাঙ্কুর', 'ঊর্মিমুখর', 'উৎকর্ণ' প্রভৃতি। তাঁর রচিত বহু গল্প উপন্যাসের আদিবীজ এই দিনলিপিগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়। কর্মসূত্রে 'উপাসনা', 'বিচিত্রা', 'মাসিক বসুমতী', 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৬৪)-র বিভিন্ন রচনাতেও এক বিশেষ সময়পর্বের ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁর এ ধরনের গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'স্মৃতিচিত্রণ', 'আমি যাদের দেখেছি', যখন সম্পাদক ছিলাম, 'পত্রস্মৃতি', 'পথে পথে' প্রভৃতি। তাঁর 'পরাশর শর্মা' ছদ্মনামে লিখিত বা রঙ্গব্যঙ্গমূলক রচনাগুলির চাইতে এ ধরনের রচনাগুলিতেই তিনি বেশি সার্থক হয়েছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হলো 'সাহিত্যের সত্য', 'ভারতবর্ষ ও চীন' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লি'। 'মস্কোতে কয়েকদিন' তাঁর লেখা ভ্রমণ কাহিনি। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'আমার কালের কথা', 'আমার সাহিত্য জীবন', 'বৈশাখের স্মৃতি' ইত্যাদি। তাঁর বিচিত্রস্বাদী প্রবন্ধে কখনো সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা, কখনো ভ্রমণের দিনলিপি, কখনো বক্তৃতার লিখিত রূপ, কখনো স্মৃতিচারণ বিষয় হয়ে এসেছে। গুরুত্ব দিয়েছেন স্থানিক ইতিহাসকে, পরিবর্তিত সমাজ-পরিস্থিতিকে। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) রচিত দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ হলো—'স্বগত' ও 'কুলায় ও কালপুরুষ'। যুক্তিবাদী, চিন্তাশীল, দার্শনিক এই কবির বিভিন্ন প্রবন্ধে সমাজের কথা, শিল্প প্রসঙ্গ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের জীবন ও রচনার অনুষঙ্গ, বিভিন্ন গ্রন্থ সমালোচনা, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ বিষয় হয়ে ধরা দিয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি অমিয় চক্রবর্তী লিখিত বহু প্রবন্ধের মধ্যে 'কাব্যে ধারণাশক্তি' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার প্রবন্ধে নীরসতত্ত্ব রচনাশৈলীর গুণে ও অনুভবের সহজ অভিব্যক্তিতে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক, 'প্রবাসী', 'ফরওয়ার্ড', 'ওয়েলফেয়ার', 'স্বাধীনতা'—বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩) 'বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা', 'ইংরেজি সাহিত্যের রুপরেখা', 'রুশ সাহিত্যের রুপরেখা', 'সংস্কৃতির রুপান্তর', 'বাঙালি সংস্কৃতির প্রসঙ্গে', 'বাংলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি', 'বাঙালির আশা, বাঙালির ভাষা' ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাঙালির সংস্কৃতি চর্চায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। 'বাংলা সাহিত্যের রুপরেখা'য় বাঙালির বিপুল ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাশীলতার প্রকাশ ঘটেছে। বহুভাষাবিদ্, সুপণ্ডিত, সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় গদ্যশিল্পী। তাঁর অজস্র গদ্য গ্রন্থের মধ্যে স্মরণীয় 'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচা কাহিনি', 'শবনম', 'শহর ইয়ার' ইত্যাদি বহুদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় উজ্জ্বল বিভায় বিচ্ছুরিত হয়েছে। সরস গল্প বলার ভঙ্গিতে ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতির কথা তিনি অননুকরণীয় ভাবে শুনিয়েছেন। 'জলে ডাঙায়' তাঁর লেখা অনবদ্য ভ্রমণকাহিনি। রসিক এই গদ্যশিল্পী ফিচারধর্মী বা রম্যরচনামূলক-প্রবন্ধের নানা রুপেই অসামান্যতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০৩) ছড়া কবিতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেও বহু মননশীল প্রবন্ধও রচনা করেছেন, যার মধ্যে 'পথে প্রবাসে', 'বাংলার রেনেসাঁস', 'শিক্ষার সংকট', 'সংস্কৃতির বিবর্তন', 'বিনুর বই' উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা 'পারিবারিক নারী সমস্যা', 'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা' ইত্যাদি প্রবন্ধ বিখ্যাত।

আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২) বাংলা প্রবন্ধ রচনায় বিশিষ্টতার সাক্ষ্য রেখেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ—'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা', 'পান্থজনের সখা', 'পথের শেষ কোথায়', 'ব্যক্তিগত ও নৈর্বক্তিক' ইত্যাদি। রবীন্দ্র উত্তরকালের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অন্যতম কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সংকলনগুলির মধ্যে রয়েছে 'উত্তরতিরিশ', 'কালের পুতুল', 'সাহিত্যচর্চা', 'রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য' ইত্যাদি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের তাঁর রচনায় বুদ্ধদেব বসু নানাভাবে স্মরণ করেছেন। তাঁর সমালোচনার ভাষা কাব্যময়, রুচিশীল, বিশিষ্ট গদ্যরীতিতে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। শুধুই বড়োদের কথা নয়, 'বাংলা শিশু সাহিত্য' বিষয়েও তাঁর সুললিত প্রবন্ধ রয়েছে। রসজ্ঞ লেখক তাঁর প্রাজ্ঞ মননশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে কাব্যিক উপমায়, ছন্দে, সুরে, ভাষায় রূপ দিয়েছেন। কবি বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'রুচি ও প্রগতি', 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' 'সাহিত্যের দেশ বিদেশ', 'সেকাল থেকে একাল' ইত্যাদি। তাঁরা প্রবন্ধে চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি সমাজ স্থান পেয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০) 'কালপ্যাঁচা' ছদ্মনামে বহু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', 'শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ', 'নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা', 'কলকাতার কালচার', 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ', 'বাংলার নবজাগৃতি', 'লোকসংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্ব' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আধুনিক সময়ের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাব্য কবিতার ধারা :

কবিগান—কবিওয়ালা বলতে বোঝানো হতো অশিক্ষিত পটু স্বভাব কবিদের। বহু বিচিত্র ধরনের রচনাকে কবিগানের আওতায় আনা যেতে পারে। সজনীকান্ত দাসের ভাষায় 'বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় প্রচলিত তরজা, পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা কবিগান, ঢপ, কীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্ক গীতি প্রভৃতি নানা বিচিত্রনামা বস্তুর সংমিশ্রণে কবিগান জন্মলাভ করে।' ঐতিহাসিকভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত সময়সীমায় নবাগত ইংরাজের নবগঠিত রাজধানী কলকাতায় হঠাৎ বড়লোক অনভিজাত ও স্থূল রুচির ধনাঢ্য মানুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাৎক্ষণিক আমোদের উত্তেজনার আস্বাদনকল্পে এই শিল্পমাধ্যমটির জন্ম। দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল তথা গায়ক কোনো একটি বিষয় নিয়ে পূর্বে রচিত বা তাৎক্ষণিকভাবে পদ রচনা করে চাপানউতোর নামক প্রশ্নোত্তরের ঢঙে একে অপরকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করে। ঢোল, করতাল সহযোগে প্রতিপক্ষের গায়কেরাই নিজ নিজ দোহার নিয়ে গান পরিবেশন করতেন। কবির আসরে ভবানী বিষয়, সখী সংবাদ এবং বিরহ অংশের পর সর্বশেষে লহর বা খেউড় গাইবার নিয়ম ছিল। এই খেউড় অংশটি পারস্পরিক গালিগালাজ পূর্ণ হওয়ায় তৎকালীন শ্রোতৃমণ্ডলী এই অংশেই আমোদ অনুভব করতেন। কবিওয়ালাদের মধ্যে গোঁজুলা গুঁই, রঘুনাথ দাস, নন্দলাল, লালচন্দ্র, রামজী দাস, রাসু ও নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, ভবানী বেনে, নিলু ও রামপ্রসাদ ঠাকুর, ভোলা ময়রা, রামানন্দ নন্দী, রাম বসু, কেষ্টা মুচি, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাজ নবকৃষ্ণের পৃষ্টপোষকতায় কুলুই চন্দ্র সেন উত্তর-প্রত্যুত্ত রহীন শাস্ত্রীয় সংগীত ঘেঁষা আখড়াই গানের প্রবর্তন করেন। আখড়াই ভেঙে তৈরি হাফ-আখড়াই গানে আবার চাপান-উতোর রীতি ফিরে আসে। আঙ্গিকগত খুঁটিনাটি বিষয় ছাড়া কবিগানের সঙ্গে এর বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। টপ্পা গানের বিশেষ উৎকর্ষ বিধান ও পরিণতিদানে রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর নাম অবশ্য স্মর্তব্য।

'টপ্পা' শব্দের অর্থ 'লাফ'। আর এক অর্থে তা বোঝায় 'সংক্ষেপ'। অর্থাৎ ধ্রুপদ খেয়ালের সংক্ষিপ্ততর, তুলনায় লঘু সুরের গানই হলো 'টপ্পা'। কর্মোপলক্ষ্যে বিহারের ছাপরা জেলায় বসবাসের অভিজ্ঞতা ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষার তালিমকে কাজে লাগিয়ে নিধুবাবু বাংলা ভাষায় প্রণয়াশ্রিত, সৌন্দর্য পিপাসা ও দেহবাসনা নির্ভর টপ্পা গানের প্রবর্তন করেন। নিধুবাবুর পর শ্রীধর কথক, কালী মির্জা এবং বিশিষ্ট পক্ষীর দলের নেতা রূপচাঁদ পক্ষী প্রমুখ টপ্পা, কথকতা ও শ্যামা বিষয়ক গানের এই ধারাকে অগ্রসর করেছেন। পাঁচালিকার হিসেবে দাশরথি রায় ছিলেন বিখ্যাত। ঢপকীর্তনের প্রবর্তক হিসেবে মধুসূদন কিন্নর বা 'মধুকান' স্মরণীয় হয়ে আছেন। পাঁচালি এবং কীর্তনের সংমিশ্রণে এই নতুন আঙ্গিকটির জন্ম হয়। যাত্রাগানের সঙ্গেও পাঁচালির সম্পর্ক রয়েছে। গোপাল উড়ে ছিলেন যাত্রার গানে অবিসংবাদীভাবে শ্রেষ্ঠ। কবিগানের আরেক রূপান্তর তরজা। এখানেও কবিগানের মতো উতোর-কাটাকাটি রয়েছে। তবে ঝুমুরের সঙ্গেও এর সম্পর্ক বেশি। গানের সঙ্গে এখানে নাচও পরিবেশিত হয় এবং ভাব, ভাষা ও রুচির পরিপ্রেক্ষিতে তা আজকের দর্শক শ্রোতার কাছে গ্রহণীয় নাও হতে পারে।

নতুন আর পুরনো যুগের কবিতার মধ্যে সেতুর মতো হলেন ঈশ্বর গুপ্ত। দেবতা আর পুরাণ থেকে সরে এসে সমকালীন জীবনের ছবি দেখা গেল তাঁর কবিতায়। হয়তো সামগ্রিকভাবে জীবনের ছবি সেগুলি নয়। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনেরই সঙ্গে জড়িত; যেমন, ষড়ঋতুর সৌন্দর্য থেকে আনারস, ইংরেজি নববর্ষ, নারকেল, পিঠেপুলি, তপসে মাছ ইত্যাদি। কিন্তু শুধু জীবনের এই খণ্ডিত ছবিই নয়, বিদেশি রাজশক্তি এবং বিদেশি মনোভাবাপন্ন বাঙালিদের তিনি বিদ্রুপ করেছেন, প্রকাশ করেছেন স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক মমত্ব; পাশাপাশি অবশ্য রক্ষণশীলতার কারণে স্ত্রীশিক্ষার মতো বিষয়কে মেনে নিতে পারেননি। আসলে যুগসন্ধির এক ব্যক্তিত্বের মতোই পুরনো মানসিকতা, অলংকার-উপমা ব্যবহারের দিক থেকে যেমন তিনি মুখ ফেরাতে পারেন নি, অন্যদিকে তিনিই আবার বিষয়বস্তু, শব্দ ব্যবহার এবং কবিতায় সাংবাদিকসুলভ ভঙ্গিতে নতুন যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করেছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের প্রায় সমসময়ে ইংরেজি শিক্ষিত কয়েকজন বাঙালি ইংরেজিতে কবিতা লিখতে থাকেন। এই ধারার প্রথম গণ্য কবি ডিরোজিও, যদিও বংশগতভাবে পর্তুগিজ, ধর্মের দিক থেকে নবযুগের জিজ্ঞাসু আর ইয়ং বেঙ্গলের মন্ত্রগুরু তিনি ভারতকে 'মাই কান্ট্রি' বা 'স্বদেশ আমার' বলে সম্বোধন করেন। এ পথের পথিকদের মধ্যে কালীপ্রসাদ ঘোষ, রাজনারায়ণ দত্ত, অরু দত্ত-তরু দত্ত এবং সংযুক্তার উপাখ্যান নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ক্যাপটিভ লেডি'র উল্লেখ করতে হয়।

বাঙালির ইংরেজি কবিতা লেখার প্রয়াসের এই ক্ষীণ ধারাটির পাশে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁর পর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৬-১৮৬৭) কথা বলতেই হয়, কারণ বাংলা কবিতার যৌবনে মধুসূদনের ভূমিকার আগে রঙ্গলালের হাতেই তার কৈশোর মোক্ষণ। তিনি প্রথম যুগে ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংবাদ প্রভাকরে কাব্যচর্চা করেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয় উনিশ শতকীয় আখ্যান কাব্যের ধারার প্রবর্তক হিসেবে। ১৮৫৮ সালে হোমারের কাব্য অনুসরণে লেখেন 'ভেক ও মুষিকের যুদ্ধ'। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), 'কর্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮), 'কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯)। 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' বাংলা কাব্যের প্রথম ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স, অন্যদিকে বাংলা কাব্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রসারে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। কাব্যটির 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে

চায়' পংক্তিটি প্রায় প্রবাদের মর্যাদা পেয়েছে। তিনি ভাষা, ছন্দ ও প্রকাশরীতিতে প্রাচীনপন্থী ও ঈশ্বর গুপ্তের ধারানুসরণ করলেও বিষয় নির্বাচন ও কবি-মানসিকতায় যথেষ্ট আধুনিক ছিলেন।

বাংলা কবিতায় ঐতিহ্যমণ্ডিত গীতিকবিতার পাশে মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে সৃষ্টি হলো সাহিত্যিক মহাকাব্যের যুগ। বিত্তশালী পরিবারে জন্ম নেওয়া মধুসূদন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। হিন্দু কলেজে সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসুকে আর অধ্যাপক হিসেবে রিচার্ডসনকে। বাল্যকালে মাতা জাহ্নবীর কাছে রামায়ণ, মহাভারতসহ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন। মধুসূদনের বন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে মধুসূদনের মায়ের লাইব্রেরি 'was complete with 'Mahabharata', 'Ramayana', 'Chandi', 'Annada Mangal', etc, the few Bengali books then extent' পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বার যখন উন্মুক্ত হলো, হোমার-ভার্জিল, তাসো-দান্তে-মিলটন এবং আরো অনেক কবির প্রভাব পড়ল তাঁর উপর, তখনও তিনি ভোলেননি কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাসকে। যাই হোক, হিন্দু কলেজে পাঠ নেওয়ার পর খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা এবং মাদ্রাজে খ্রিস্টান বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের শুরু। ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত 'The Captive Ladie' ও 'Visions of the Past' ইংরেজি ভাষায় মহাকবি হওয়ার পথে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় এবং কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর পরামর্শে বাংলা কবিতায় তাঁর আবির্ভাব ঘটে। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', 'হেক্টর বধ' লিখে নিজেই এক যুগের সৃষ্টি করে গেলেন তিনি। 'মেঘনাদবধ কাব্য'ই বাংলা ভাষায় লিখিত সার্থক সাহিত্যিক মহাকাব্য। মধুসূদন ছিলেন প্রকৃতি অর্থেই নবজাগরণের কবি। একদিকে ভারতীয় ঐতিহ্য, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনার মিশ্রণে তিনি তৈরি করলেন মানবতাবাদের নতুন ব্যাখ্যা।

তাঁর কবিতার চরিত্রগুলি হিন্দু দেবদেবী ও পুরাণের চরিত্রই, কিন্তু 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' দুই অসুর-চরিত্র সুন্দ ও উপসুন্দ যেন দেবতাদের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাবণ বীরত্বে, হতাশায়, বিষাদে উনিশ শতকের এক বাঙালি পুরুষ। ব্রজাঙ্গনায়, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' 'বীরাঙ্গনা'য় 'রাধা', 'প্রমীলা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শকুন্তলা', 'তারা', 'রুক্মিনী', 'দ্রৌপদী', 'জনা' যেন নতুন দিনের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠলেন। এভাবেই প্রাচীন মহাকাব্য ও পুরাণ কথাকে ব্যবহার করে সমকালীন মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে পুনর্বিচার করেছেন তিনি।

শুধু বিষয়ের দিক থেকে নয়, কবিতার ফর্মের দিক থেকেও তার কাব্যজগৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যাদর্শের একটি সার্থক সমীকরণ। Blank verse এর অনুসরণে এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত পয়ার ছন্দের ঐতিহ্য পরম্পরায় মধুসূদন গড়ে তুললেন প্রবাহমান পয়ারের এক নতুন রূপভেদ, যা পরবর্তী সময়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নামে বিখ্যাত হয়েছে। 'বীরঙ্গনা' কাব্যে আবার রোমান কবি ওভিদের 'Heroides' অবলম্বনে বাংলায় প্রথম Epistle বা পত্রকাব্য রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বাংলায় প্রথম সনেট আঙ্গিকের রচনা। এই সনেটগুলির কয়েকটি প্রাচীন রোমান কবি পেত্রার্ক এবং শেক্সপিয়রের সনেটের আদর্শে রচিত। হোমারের ইলিয়াড অবলম্বনে লেখা 'হেক্টরবধ' সম্পূর্ণ করার আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মধুসূদন একই সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী সেতুর ভূমিকা পালন করে বাংলা কবিতাকে যেমন বিরাট বিশ্বের পরিসরে মুক্তি দিয়েছিলেন, সাবালক করে তুলেছিলেন, তেমনই যুগের দাবি অনুসারে ওজ:ময়

ও গম্ভীর ক্লাসিকাল তন্নিষ্ঠতা এবং লিরিকাল ও রোমান্টিক আবেগময়তার দুটি বিপরীত বিন্দুর মধ্যে অনায়াসে সঞ্চরণ করেছেন, যা পরবর্তী সময়ে বাংলা কাব্য-কবিতার ভুবনকে নতুন বিশ্ব আবিষ্কারে প্রাণিত করেছে।

মধুসূদনের অনুসরণে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) বা নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) মহাকাব্য রচনায় প্রয়াসী হলেও সেগুলির কোনোটাই আখ্যানকাব্যের বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে না। হেমচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১৮৬১), 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪), 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১৮৭৫-৭৭), 'আশাকানন' (১৮৭৬), ছায়াময়ী (১৮৮০), দশমহাবিদ্যা (১৮৮২), 'চিত্তবিলাস' (১৮৯৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'পলাশীর যুদ্ধ' ছাড়া তাঁর মহাভারত-নির্ভর ত্রয়ী কাব্য অর্থাৎ রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস আলাদাভাবে উল্লেখের যোগ্য। আখ্যানকাব্যের অন্যান্য কবিদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র (ললিততথা মানস), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (ভারতগাথা), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারত-উদ্ধার), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপ্ন প্রয়াণ), ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (চিত্তমুকুর), আনন্দচন্দ্র মিত্র (হেলেনা কাব্য), শিবনাথ শাস্ত্রী (নির্বাসিতের বিলাপ), রাজকৃষ্ণ রায় (নিভৃত নিবাস) উল্লেখযোগ্য।

বাংলা কবিতার ধারায় মহাকাব্য ছিল এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস। এক ব্যক্তির অসামান্য প্রতিভাবলে নি:সঙ্গ দ্বীপের মতো রচিত হয়েছিল সাহিত্যিক মহাকাব্য। যদিও সে মহাকাব্যে ধ্রুপদী বয়নের মাঝে উঁকি দিয়ে গেছে গীতিকবিতা। মধুসূদনের ভেতরেও গীতিকবিতার মূর্ছনাও যে নিত্য প্রবহমান ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ তাঁর সনেটে। মধুসূদনের পর স্বাভাবিকভাবেই ফিরে এস গীতিকবিতার ধারা, এবং যে গীতিকবিতা এতদিন নানা ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই সাধনভজনের গানের মধ্যে দিয়ে চলে আসছিল, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাতে যুক্ত হলো মানবিক আবেগের ধারা। মূলত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হতে থাকল এ সময়ের কবিতা—নারী, প্রকৃতি ও স্বদেশ। বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস এ যুগের কাণ্ডারী।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত শংসাপত্র সত্ত্বেও খুব বড়ো কবি হিসেবে স্থান পাওয়ার তিনি অধিকারী কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। তবে তাঁর প্রধান গুরুত্ব বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার মূল সুরটিকে ধরতে পারায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'সঙ্গীতশতক' (১৮৬২), 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গ সন্দর্শন' (১৮৭০), 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), 'প্রেম প্রবাহিণী' (১৮৭০), 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯), 'সাধের আসন' (১৮৮৯)। নিসর্গ কবিতা রচনার প্রয়াস, রোমান্টিক অনুভূতির আবাহন এবং ব্যক্তিহৃদয়ের স্পন্দন—বাংলা কবিতার এই বৈশিষ্ট্যগুলির অক্ষয় আসন প্রতিষ্ঠার কাজ বিহারীলালের হাত ধরেই সম্পন্ন হয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিহারীলাল চক্রবর্তী নির্দেশিত গীতিকবিতার পথে কবিতা লিখে যাঁরা সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'সবিতা সুদর্শন' ও 'ফুল্লরা' নামক দুটি আখ্যানকাব্য রচনা করলেও তিনি পরবর্তীকালে গীতিকবিতার পথই বেছে নেন। তাঁর বিখ্যাত গীতিকাব্য 'মহিলা'। তাঁর মৃত্যুর পর এই কাব্যের প্রথম খণ্ড ১৮৮০ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ সেন নিজেকে 'মাইকেল মধুসূদন হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি' বললেও, বিহারীলালের দ্বারাই তিনি সর্বাধিক প্রভাবিত। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো—'পারিজাতগুচ্ছ', 'গোলাপগুচ্ছ', 'অপূর্ব বীরঙ্গনা', 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' ইত্যাদি। বিচিত্র

অলংকারে গড়া তাঁর কবিতাগুলিতে গার্হস্থ্য প্রেমের রোমান্টিকতা ও প্রকৃতির সমৃদ্ধ চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর কবিতায় সম্বোধনের রীতি বিহারীলালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'স্বভাব কবি' গোবিন্দচন্দ্র দাসের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'প্রসূন', 'প্রেম ও ফুল', কুঙ্কুম, 'কস্তুরী', 'চন্দন', 'ফুলরেণু', 'বৈজয়ন্তী' ইত্যাদি। 'ভোগবাদী' কবি হিসেবে চিহ্নিত হলেও তাঁর কবিতায় স্বদেশপ্রেম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'প্রেম-বৈচিত্র্যের কবি' অক্ষয়কুমার বড়ালের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো-'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ', 'এষা'। বিহারীলাল চক্রবর্তীর মতো কল্পনাভিসার অক্ষয়কুমারের কবিতায় থাকলেও তাতে অতীন্দ্রিয়তা নেই। স্ত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তাঁর রচিত 'এষা' (১৯২২) কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শোককাব্য। ভাবে উচ্ছ্বাসের চেয়ে তাঁর কবিতায় ভাষার সংযম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মূলত গদ্যসাহিত্যের লেখক হলেও রবীন্দ্র অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৩) গীতিকাব্যের জন্য কবিতা-ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এই কাব্যটি রোমান্টিক রহস্যময়তায়, ভাবের প্রাচুর্যে, রচনার বিচিত্রতায় অনবদ্য। এটি কবি Spencer এর 'Faerie queene' এর আদর্শে রচিত।

ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকে কয়েকজন মহিলা কবির কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, কিন্তু সে-সব কবিতা ছিল কাব্যগুণে বঞ্চিত। উনিশ শতকের শেষের দিকেই বেশ কয়েকজন মহিলা কবির কবিতা পাওয়া যায়, যাঁরা পাঠক সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা গীতিকবিদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী সরস্বতী, প্রমীলা নাগ, ষোড়শীবালা দাসী, জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ও নারীশিক্ষার প্রসারের পটভূমিতে, বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এঁদের সাহিত্যসাধনা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও স্মরণীয় হয়ে আছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো—'কবিতাহার', 'ভারতকুসুম', 'অশ্রুকণা', 'আভাস', 'শিখা', 'অর্ঘ্য' ইত্যাদি। তার কাব্যে গ্রাম্য প্রকৃতির বর্ণনা এবং করুণরসের আধিক্য লক্ষ করা যায়। কামিনী রায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো—'আলো ও ছায়া', 'নির্মাল্য', 'মালা ও নির্মাল্য', 'অশোক সঙ্গীত', 'দীপ ও ধূপ', 'জীবন পথে'। শোকমূলক কবিতায় তাঁর প্রতিভার পরিচয় উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যচর্চায় বিহারীলাল চক্রবর্তী ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর প্রভাব বিশেষ করে লক্ষ করা যায়। নারী জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রেম-উচ্ছ্বাসকে তিনি কবিতার বিষয় করে তুলেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো 'গাঁথা', 'কবিতা ও গান'। সমকালীন গীতিকবিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ কবিতাগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

'নবজাতক' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু জোগান নতুন পথ নেয়। ....কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টি বদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না'। কাব্যের এই ঋতু-বদলের কথা স্মরণ রেখে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গদ্যকাব্য এবং ছন্দোবদ্ধ কাব্য—উভয় ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম পর্বের রচনার মধ্যে রয়েছে 'বনফুল' (১২৮২-৮৩ সালে 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত), 'কবি কাহিনী' (১২৮), 'ভগ্নহৃদয়', 'ভানুসিংহের পদাবলী' (১২৮৪-১২৯০), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (গীতিনাট্য) প্রভৃতি। তাঁর স্বকীয়তার বিচ্ছুরণ, প্রতিভার বিকাশ ক্রমশ লক্ষ করা গেছে

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১২৮৮), 'প্রভাতসংগীত' (১২৯০), 'ছবি ও গান' (১২৯০), 'কড়ি ও কোমল' (১২৯৩) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে। প্রভাত সংগীত রচনার সময়পর্বে প্রকৃতির প্রসারতা ও মানব জীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে কবির যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় তাঁর হৃদয়াবেগের অস্পষ্টতা কেটে গেছে এবং তাঁর কাব্যের ভাব, ভাষা ও ছন্দ ক্রমশ সুন্দর হয়ে উঠেছে। প্রভাত সংগীতের পরবর্তী কাব্য 'ছবি ও গানে'র পর রবীন্দ্রনাথের বধূ সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতাসমৃদ্ধ 'কড়ি কোমল' (১২৯৩) প্রকাশিত হলে, তাতে তাঁর মর্ত্যমমতা, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বমানবতা ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাব ও প্রকাশ লক্ষ করা গেল। 'মানসী' (১২৯৭) ও 'সোনার তরী' (১৩০০) কাব্যগ্রন্থে বিশ্বাত্মবোধে, ছন্দ ও ভাষার আড়ষ্টতা থেকে মুক্তিতে, সৌন্দর্যব্যাকুলতা ও নিসর্গচেতনাময় রোমান্টিক কল্পনার বিস্তারে তাঁর কবি প্রতিভার যথার্থ উন্মেষ ঘটেছে। 'চিত্রা' (১৩০২) কাব্যগ্রন্থে মানবপ্রেম তথা মানবতাবোধ, সৌন্দর্যকে সীমা ও অসীমে পরিব্যাপ্ত করে দেখার মনোভাব, কর্মচঞ্চল জীবনের আহ্বানে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির চেতনা, দুঃখবরণ ও আত্মবিসর্জনে ঔৎসুক্য লক্ষ করা গেল। সমসাময়িক 'মালিনী' নাটকেও এই আদর্শেরই সম্প্রসারণ। 'চিত্রা'র পরবর্তীকালে 'চৈতালি' (১৩০২) কাব্যগ্রন্থে প্রাচীন ভারতের ধ্যানগম্ভীর, শান্ত আদর্শে কবি উদ্বুদ্ধ। এছাড়া এই কাব্যে সুখ-দুঃখ, মহত্ত্ব, কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কল্পনা' (১৩০৭) কাব্যেও লক্ষণীয় সেই অতীত স্মৃতিরই অনুধ্যান। এখানে অতীতমুখী কবিমন প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য স্মৃতিতে বিভোর। প্রায় একই সময়ে রচিত তাঁর অন্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো 'কথা ও কাহিনী' ও 'ক্ষণিকা'। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, লৌকিক আখ্যায়িকা থেকে গৃহীত বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা ও নাট্যকবিতা স্থান পেয়েছে 'কথা ও কাহিনী' ও 'ক্ষণিকা'য়। সমাজ ও স্বভাবধর্মের ওপর মনুষ্যধর্মের জয়ঘোষণার পাশাপাশি ত্যাগ যে কত মহনীয় হতে পারে, তা কবিতাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থে আবেগ উচ্ছলতা সংযত হয়ে সাধারণ জীবনের চারপাশের ভাব থেকে রূপক বেছে নিয়ে নীতিনির্ভর, দার্শনিকতা প্রধান অজস্র কবিতা রচিত হয়েছে। 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলি গীতকবিতার অসামান্য নিদর্শন। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে ঈশ্বরের প্রতি শান্ত, সমাহিত, ঐকান্তিক অনুরাগের ছবি যেমন ধরা পড়েছে, তেমনই সবরকম সংস্কারমুক্ত সত্যধর্ম উপলব্ধিরও প্রকাশ ঘটেছে। স্বদেশকেও সেই সত্যসাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন কবি। এই কাব্যে ভগবানের কাছে তাঁর ও দেশবাসীর জন্য কবির পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রার্থনা তাঁর 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' তৈরির মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। স্ত্রী বিয়োগের পটভূমিতে রচিত 'স্মরণ' (১৩০৯) কাব্যে মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধীয় বেশ কিছু কবিতা স্থান পেয়েছে। শিশুমনের খেয়ালি কল্পনা ও রহস্য উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে 'শিশু (১৩১০) কাব্যগ্রন্থে। অসীমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যাকুলতার প্রকাশ ঘটেছে 'উৎসর্গ'-এর কবিতায়। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থে ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের মধ্য থেকে জীবনের পূর্ণতার অনুধ্যান ভগবদ্‌ভক্তির অনুভূমিতমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি যে বিচিত্র বর্ণসুষমায় উদ্ভাসিত, তারই পরিণতি পরবর্তী গানের সংকলনগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'তে, যেখানে তাঁর ভগবৎপ্রেম আরো স্নিগ্ধ, গভীর, তত্ত্বপ্রধান ও অপরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশিত হয়েছে। কবির ভগবৎবিশ্বাস এখানে বৈষ্ণব-বাউল-সহজিয়া-সুফি মরমিয়াদের অনুরূপ। তা যেন মানবপ্রেমেরই বিস্তৃত প্রকাশ, যে প্রেমে ঈশ্বরও তাঁর বন্ধুর রূপ পরিগ্রহ করেন। 'গীতাঞ্জলি'র মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য দেশগুলি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ, ঈশ্বর উপলব্ধির সঙ্গে পরিচিত হলো। সংস্কারমুক্তি ও গতির বাণী নিয়ে এসে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রকাব্যের দিক পরিবর্তনকে সূচিত করেছে। 'বলাকা', 'পূরবী', 'মহুয়া'র কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্যছন্দের নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। 'বলাকা' পরবর্তী 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কাহিনি নির্ভর বাস্তবধর্মী কবিতা যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি অজানা জগতের প্রতি আকর্ষণ ও

অলক্ষ্য থাকেনি। 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে গতিবাদের সুর। 'পূরবী'তে যেখানে কবি আত্মসমীক্ষায় নিমগ্ন, 'বনবানী' কাব্যে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে কবির পরিচিতির বিস্ময়বোধ ও বিশ্বসৌন্দর্য দর্শনজনিত আনন্দের প্রকাশে তন্ময়, 'মহুয়া'য় সেই তিনিই আবার প্রেমের বিচিত্র প্রকাশে ও নারীবন্দনায় মুখর। 'পরিশেষ'-এর কবিতাগুলি বিবাহ, নামকরণ প্রভৃতি জীবনঘনিষ্ঠ ঘটনা নিয়ে রচিত। গদ্যছন্দের সৃষ্টি ও পরীক্ষার পর্বে তাঁর 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থগুলিও উল্লেখযোগ্য। জীবনের প্রান্তসীমায় এসে 'শেষসপ্তক', 'প্রান্তিক', 'সেঁজুতি', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' তাঁর প্রধানতম সৃষ্টি। অষ্টাদশ অক্ষর অমিত্রছন্দে বিন্যস্ত ক্ষুদ্র কাব্য 'প্রান্তিক' এ অপার রহস্যময়তার প্রতি কবির অভিযাত্রা এবং যুদ্ধবিরোধী কবির অপরূপ বৈরাগ্যের ছবি ধরা পড়েছে। 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থে সংস্কারমুক্তির কথায়, 'আকাশ প্রদীপে' কৈশোর স্মৃতির রোমন্থনে, 'নবজাতক'-এ আত্মঘাতী সভ্যতার বীভৎসতার প্রতি ধিক্কারে কবি মুখর। তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ 'জন্মদিনে', কবি জীবনের সার্থকতাকে কৃতজ্ঞচিত্তে পরমশ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকালের শেষ দশ/বারো বছরের সময়কালে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন পর্যায়ের রেখাপাত হতে শুরু করে। এই রেখাপাত অবশ্য অবিমিশ্র ছিল না। এর কারণ রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতির ফলে এবং '...গুরুদেবের কাব্যকলা মারাত্মক রূপে প্রতারক, সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না-বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে'—কিছুটা এর ফলেও 'অনিবার্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এবং অসম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ'[১]। ফলত করুণানিধান, কিরণধন, যতীন্দ্রমোহনের মতো অনেক কবি বহু সুপাঠ্য ও উপভোগ্য কবিতা লিখেও বিস্মৃত হয়ে গেলেন, ঢাকা পড়ে গেলেন রবীন্দ্র বলয়ে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্নতর হওয়ার একটা চেষ্টা শুরু হলো। 'নিজের কথাটা নিজের মতো ক'রে বলবো—এই ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছিল সেদিন, আর তার জন্যই তখনকার মতো রবীন্দ্রনাথকে দূরে রাখতে হলো'[২]। নতুন কবিদের সমস্যাটাই ছিল সাবালকত্ব অর্জনের সমস্যা, নিজের নিজস্ব কাব্যভাষা তৈরি করে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। ফলে রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসার লড়াইটা শুরু হয়েছিল হয়তো এভাবেই, পাশাপাশি সমিধ জুগিয়েছিল তখনকার সামাজিক অবস্থা আর অন্যভাষার সাহিত্যিক দর্শন ও নিদর্শন।

প্রথম পর্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলামের হাতে শুরু হয়েছিল এই রবীন্দ্রবলয় অতিক্রমের প্রয়াস। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম দিকের তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা', 'সন্ধিক্ষণ', 'হোমশিখা'র পর 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা' আর 'তুলির লিখন'-এ এসে সত্যেন্দ্রনাথকে স্বকীয় ও বিশিষ্ট রীতিতে পাওয়া যায়; ধ্বনিচিত্রের একাত্মতা, স্নিগ্ধ মাধুর্যের স্বাদ, রূপরঙের সঙ্গে ছন্দের নিপুণ ব্যবহার আর বিচিত্র শব্দপ্রয়োগে যে কাব্যিক জগৎ তিনি নির্মাণ করলেন, তা একেবারেই অ-রাবীন্দ্রিক। যতীন্দ্রনাথ নি:সন্দেহে নিজস্ব ভাষায় রচনা করেছিলেন তাঁর কাব্যিক ভুবন। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এই কবি জীবনকে মূলত নিরাশাবাদী বস্তুমূলক নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর এই দেখাকেই বাক্‌সংযমের মধ্যে, আত্মসচেতনতার আতিশয্যে, তীব্র কৌতুকে এমনভাবে রূপায়িত করেন, মনে হয় তিনি সদর্থেই পরবর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্র-সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়-বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে 'মরীচিকা', 'মরুমায়া', 'মরুশিখা', 'সায়ম' ইত্যাদি। যতীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হলেও কবিস্বভাবে অনেকটাই আলাদা মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)। মোহিতলালের কাব্যে ধ্বনিত হল দেহবাদ, ভোগবাদ,

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও রোমান্টিক বিষণ্ণতাবোধ। চার্বাকপন্থী লোকায়ত দর্শনের জীবন সম্পৃক্ততা ও বীরাচারী সাধনার বলিষ্ঠ দেহাত্মবাদের সঙ্গে তাঁর কবিতায় যুক্ত হয়েছে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং ব্যক্তিমানুষের অসহায়তাবোধ। আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর কবিতা ক্লাসিকগন্ধী এবং স্তবক নির্মাণে ভাস্কর্যধর্মী। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'দেবেন্দ্রমঙ্গল', 'স্বপনপসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল', হেমন্ত গোধূলি', 'ছন্দচতুর্দশী' উল্লেখযোগ্য। যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল সম্ভবত সচেতনভাবেই সরাসরি রবীন্দ্র সমালোচনার পথে না গেলেও রবীন্দ্র-নিরপেক্ষ নিজস্ব কাব্যজগৎ সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, আর কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৮-১৯৭৬) ক্ষেত্রে সেটা সম্ভবত স্বত:স্ফূর্ত প্রাণোন্মদনা। বস্তুত, অন্যান্য নাগরিক, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত কবিদের তুলনায় তাঁর জীবন ও প্রতিবেশ এতটাই আলাদা ছিল যে, সমসময়ের সাহিত্যধারা, এমনকি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও তাঁকে সেভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। শৈশবেই লেটোগানের দলে প্রবেশের সুবাদে কবিত্ব শক্তির উন্মেষ, বাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে ভাগ্য অন্বেষণ, অসমাপ্ত পড়াশুনো এবং সেনাবাহিনীতে যোগদান তাঁকে যে বিচিত্র, বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের সুযোগ করে দিয়েছিল, নিজস্ব কবিত্ব প্রতিভাবলে তাকেই তিনি সাহিত্যের রূপ দিয়েছেন। কলকাতায় ফেরার পর সাম্যবাদী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং ইংরেজ-বিরোধিতা তাঁর কবিতার গতিপ্রকৃতি নির্দিষ্ট করে দেয়। সমসাময়িকতা তাঁর এই সময়ের অধিকাংশ কবিতার প্রাণ হলেও সেখানে তাঁর স্বাধীনতাকামী, মানবতাবাদী, রাজনীতি-সচেতন অথচ রোমান্টিক কবি মনেরই প্রকাশ ঘটেছে।

আসলে নজরুলের কবিতায় বিদ্রোহ ও বীর্যের যে হুঙ্কার তা কবিমনের রোমান্টিকতারই প্রকাশ। সে রোমান্টিক মন ক্রিয়াশীল থাকে, যখন নজরুল লেখেন প্রেমের আর প্রকৃতির কবিতাগুলি। প্রচণ্ড আবেগ ও উচ্ছ্বাস রয়ে গেছে তাঁর সব কবিতাতেই। রাজনৈতিক চেতনা ও বিদ্রোহের দীপ্তি, হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃত্বের কথা, সাম্যবাদ, কৃষক-শ্রমিকের প্রতি সমর্থনে এবং শোষকের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতাগুলি মানুষের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। 'বিদ্রোহী', 'ফরিয়াদ', 'সাম্যবাদী' 'অন্ধ স্বদেশ', 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'কুলিমজুর' নজরুলের জনপ্রিয়তম কবিতা। অন্যদিকে 'গানের আড়াল', 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি', 'আমি গাই তারই গান' কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির অদ্ভুত মনোরম সমাবেশ। আবার এই চিরবিদ্রোহী মানুষটির অন্তরে ভক্তির অনবদ্য প্রকাশ আমরা দেখতে পাই শ্যামাসংগীত আর ইসলামি গান থেকে। আগমনী বিজয়ার গান, গজল, মারিফতি, মুর্শিদি, ঠুংরি, ভাটিয়ালি—বাংলার প্রায় সবরকম গানই তিনি লিখেছেন ও সুরে বেঁধেছেন। সেখানেও মানুষের কথা, প্রেমের কথা, প্রকৃতির কথা। 'অগ্নিবীণা', 'দোলনচাঁপা', 'বিষের বাশী', 'ভাঙার গান', 'ছায়ানট', 'ফণিমনসা' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

যতীন্দ্রনাথের মরুভূমির মতো বাস্তব পৃথিবী, মোহিতলালের ধ্রুপদী দেহবাদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সৌন্দর্য ও ছন্দের ধ্বনিমাধুর্য আর নজরুলের চড়া গলার পরে 'বাংলা কবিতায় দেখা দিল সংহতি, বুদ্ধিঘটিত ঘনতা, বিষয় এবং শব্দচয়নে ব্রাত্যধর্ম, গদ্য-পদ্যের মিলনসাধনের সংকেত'[৩]। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে আর বুদ্ধদেব বসু বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিকতাকে সম্প্রসারিত করেছিলেন অনেকখানি। প্রাথমিক পর্বে প্রথম চারজনের ক্ষেত্রেই দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ছিল। একদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাণ্ডার, অন্যদিকে ব্যক্তিগত মনন ও চিন্তা তার সঙ্গে ইতিহাসবোধ, সময় আর নাগরিকতার মিশেলে দ্রুতই পালটে যাচ্ছিল বাংলা কাব্যের ধরন। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'-এর পর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও রূপসী বাংলা'য় নিসর্গের উজ্জ্বলতাকে তিনি নিয়ে এলেন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, আবার একই সঙ্গে স্থাপন করলেন আবহমান

কালে। খাঁটি বাংলাভাষায় দেশজ শব্দে এমন এক ঈষৎ বিষাদমিশ্রিত মৃত্যু চেতনাসম্পন্ন দৃশ্যপট তৈরি করতে থাকলেন যা পাঠককে আচ্ছন্ন করে দেয়। এই সবের সঙ্গে অতীত কাল ও ভবিষ্যৎকে যুক্ত করলেন বর্তমানের সঙ্গে, প্রসারিত করলেন সময় চেতনার বলয়কে 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে। পরবর্তী সময়ে তিনি যত এগিয়েছেন 'মহাপৃথিবী' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' কিংবা 'বেলা অবেলা কালবেলা'র দিকে, ততই ইতিহাসবোধ ও সময়চেতনার ভিতরে এসেছে সমসাময়িক সময়ের চাপ। স্বাধীনতার আগে পরে দাঙ্গা, দেশভাগ, যুদ্ধবিধ্বস্ত নগর সভ্যতার মনমানসিকতা সবই ভিড় করছিল আর এখান থেকেই তাঁর হৃদয়ে জেগেছিল গভীরতর জিজ্ঞাসা, যদিও শেষপর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করতে চান 'নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনা দিন'কেই।

'কিন্তু মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে মলমাস'—সুধীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ কবিতাই মানবেতিহাসের মলমাসেরই প্রতিচ্ছবি। বন্ধ্যাত্ব, অক্ষমতা নিস্ফলতাবোধ তাঁর কবিতার প্রধান কথা। এই নি:সঙ্গতা ও একাকীত্ব ইতিহাসের বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটে প্রতিফলিত বলেই তা তাঁর কবিতায় নিয়তিবাদের রূপ নিয়েছে। তিনি তাঁর কবিতায় খুঁজে পাননি কোনো স্থিরকেন্দ্র, সবই আপেক্ষিক নৈমিত্তিক। তাই বুদ্ধদেব বসু বলেন যে ....অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী ও উত্তরফাল্গুনী, এ তিনখানা আসলে একখানাই বই, একই বইয়ের তিনটি অধ্যায়, তিনটি বইয়ের ভিতর দিয়ে একটি কথাই তিনি বলেছেন। আবার সমবয়সী হলেও অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যসাধনা সুধীন্দ্রনাথের চেয়ে একেবারে আলাদা। অমিয় চক্রবর্তী প্রশান্তির কবি এবং তিনিই একমাত্র আধুনিক যাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিবেশ লালিত হয়েও স্বতন্ত্র। 'খসড়া', 'একমুঠো'য় জগৎ ও জীবনকে দেখার ইচ্ছে, কখনো প্রকৃতির সঙ্গে মিলে যায় মানুষের মন, কখনো স্মৃতিভাবনা কখনো বা সামগ্রিক সংসারের ছবি। কিন্তু 'মাটির দেওয়াল', 'অভিজ্ঞান বসন্ত' 'দূরযানী'তে দেখা দিলো গভীর ধ্যানের চিন্তা ও চেতনার জগৎ। শেষপর্বে অর্থাৎ 'পারাবার', 'পালাবদল' থেকে 'পুষ্পিত ইমেজ'-এ আছে বিশ্বের নানা স্থানে ভ্রমণের ফলে আধুনিক বিশ্বজীবন। স্বদেশে ও বিদেশে তাঁর জীবন অন্বেষণ কবিতায় এনেছে ব্যাপ্তি, হতাশা ও নিরাশার জগৎ থেকে উত্তরণের দিশা।

কাব্যগ্রন্থের সংখ্যার দিক থেকে, বিস্তারের দিক থেকে, চেতনার নানা পর্যায়ের বাঁকবদলের দিক থেকেও এক দীর্ঘ ব্যাপ্ত পরিকল্পনা নিয়ে কবিতা লিখে গেছেন বিষ্ণু দে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ প্রেমচেতনাই প্রধান সুর এবং পরবর্তী 'চোরাবালি', 'পূর্বলেখ' কিংবা 'সাত ভাই চম্পা' তেও সে সুর বেজেছে, কিন্তু পাশাপাশি এসেছে 'দেশের জনসমাজের সঙ্গে দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সেতুবন্ধনের কথা'ও। যে-ভূপ্রকৃতি তাঁর কাব্যে বারে বারে ফিরে এসেছে তা যেমন সাঁওতাল পরগনার দ্বন্দ্বময় নিসর্গ-ভূমি, তেমনি মেঘ, বিদ্যুৎ, নদী, ঝড়ের প্রতীকে তিনি জীবনের নাট্যময় অধিদেবতাকেই আহ্বান করেছেন বারে বারে। দেশজ কাব্য ও রূপকথার লৌকিক সংস্কৃতির শৈল্পিক সজ্ঞানতাকে কাব্যে ব্যবহার করে বিষ্ণু দে-ই হয়ে উঠলেন আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রথম এবং একামাত্র কবি যিনি মহাকবির মন নিয়ে শিল্পে ব্যক্তিত্ব মুক্তির সাধনা করেছেন। বুদ্ধদেব বসু প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা' থেকেই রোমান্টিক, কামনার প্রকাশে পরবর্তী 'কঙ্কাবতী', 'দ্রৌপদীর শাড়ি' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ পেরিয়ে জীবনের শেষপর্যন্ত সঙ্কোচহীন। তবে শেষের দিকে কবিতায় যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব, আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব, প্রবৃত্তি ও প্রেমের দ্বন্দ্ব। এ পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'যে আঁধার আলোর অধিক', 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' এবং 'মরচে-পড়া পেরেকের গান' নি:সন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

এঁদের সঙ্গেই আসে সমবয়স্ক প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অজিত দত্তের নাম। নজরুল ইসলামের বিদ্রোহ ও প্রেম, যতীন্দ্রনাথের বিদ্রুপ, মোহিতলালের দেহবাদী উচ্চারণ, জীবনানন্দ-সুধীন-বিষ্ণু-অমিয়-বুদ্ধদেবের অসামান্য মননশীলতার পাশেও প্রেমেন্দ্র মিত্র আকর্ষণ করেছিলেন কাব্যপাঠকের দৃষ্টি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা'র 'বেনামী বন্দর', 'মাটির ঢেলা', 'আমি কবি যত কামারের' কবিতাগুলির নতুনস্বাদ, বন্ধন ছিন্ন করতে চাওয়ার সঙ্গে ভৌগোলিক চেতনা, কখনো নগর জীবন আবার আকাশের তল্লাশ নিয়ে সাগর থেকে ফিরে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন সুবিশাল সমুদ্র চেতনা। 'সম্রাট', 'ফেরারী ফৌজ', 'কখনো মেঘ', 'হরিণ, চিতা, চিল' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলেও তাঁর 'সাগর থেকে ফেরা' জনপ্রিয়তম। তুলনায় অজিত দত্ত মৃদুভাষী এবং একান্তভাবে প্রেমের কবি। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মতো তাঁর প্রেমের ভাষা দুর্জয় আবেগে উচ্ছ্বসিত নয়, এবং সনেটের বন্ধনে সংযত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমের মাস' এবং তিনি বাংলা কবিতার ইতিহাসে রয়ে গেলেন কুসুমের মাসের কবি বলেই, যদিও 'পাতালকন্যা', 'নষ্টচাঁদ', 'পুনর্নবা' কাব্যগ্রন্থগুলি প্রেম ও প্রসন্নতার নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়িয়ে ক্রমেই সাবালক হয়ে উঠল বাংলা কবিতা। ত্রিশের দশকের সময় থেকেই বাংলা কবিতায় এল বিপ্লবী আধুনিকতার ধারা। ধনতন্ত্র- ফ্যাসিবাদ-সাম্রাজ্যাদ-বিরোধী সাম্যবাদী ধারণার উপর আস্থা স্থাপন করে গণমুখী রাজনৈতিক কাব্যধারার সূত্রপাত ঘটল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ এ পথেই কাব্যসাধনা করেন। এই নাগরিক জীবনের মরুভূমিসম অসাড়তা, বন্ধ্যাত্ব জীবনানন্দের হাতেই রূপ পাচ্ছিল, সুধীন্দ্রনাথ এই ভাবনাকে প্রায় নিয়তির স্থানে দিয়ে গেলেন আর সমর সেন তাকে স্থাপিত করলেন তাঁর কবিতার কেন্দ্রে। সমর সেন মেধা আর অসাধারণ গদ্যের সুষমায় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিলেন, কিন্তু তিনি থেমে গেলেন কিছুদিনের মধ্যেই। এই স্বল্পসময়ের পদচারণাতেই তিনি রয়ে গেলেন বিশিষ্ট হিসেবে। 'ম্লান হয়ে এল রুমালে/ইভনিং ইন প্যারিসের গন্ধ—/হে শহর হে ধূসর শহর!/কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও/লম্পটের পদধ্বনি/কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে কি পাও/হে শহর হে ধূসর শহর!

সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্পষ্ট করেই তো 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থে বলেছিলেন 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'। ছন্দের তৎপরতায়, শ্লোগানে, সরল ভাষায় প্রতিবাদী কবিকণ্ঠ হিসেবে রাজনৈতিক জীবনযাপনের পাশাপাশি তিনি কবিতা লিখে চললেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করলে, এমনকি তাঁর দীর্ঘজীবনে যাঁদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, সেই সহযোদ্ধাদের নিদারূণ স্খলনও শেষপর্যন্ত তাঁর চিরপ্রতিবাদী চেতনার হাত থেকে রেহাই পেল না। মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, দিনেশ দাস, রাম বসু সমাজ ও রাজনীতির কথাই বলে গেলেন নির্দিষ্ট মতবাদে আস্থা রাখে।

তিরিশের মননশীলতা আর চল্লিশের সমাজবিবেক মিশে গেছে শঙ্খ ঘোষের কবিতায়। ব্যক্তিগত অনুভব আর প্রখর বিবেক নিয়ে শিল্প-প্রগল্‌ভতা বা রাজনৈতিক-প্রগল্‌ভতা থেকে সরে দাঁড়িয়ে মিতভাষ্যে কিন্তু দৃঢ়স্বরে কবিতা লিখলেন। ফলত 'পঞ্চাশ দশকের প্রধান কবি'র তকমা সরিয়ে ক্রমশই হয়ে উঠতে লাগলেন বিশ শতক ও পরবর্তী সময়ের মহৎ কবি। পৃথিবীর নিহিত রহস্যের সন্ধানী, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, লৌকিক ধর্মকে আধুনিক কাব্যভাষ্যে প্রকাশ করেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতার ফর্ম, প্রধানত ভাষা নিয়ে দীর্ঘ পরীক্ষায় রত এই আধুনিক মরমী কবি। বুদ্ধদেব বসু যে শুদ্ধ কবিতার ধারাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সে ধারায় লিখলেন অরুণ কুমার সরকার, নরেশ গুহ থেকে বিনয় মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসুরা।

নারী, নিসর্গ আর কবিতা মিশে গেছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায়, অন্যদিকে নির্বেদ, বিতৃষ্ণা থেকে বেরিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা জীবনের ছন্দে, আস্তিক্যবোধে বিধৃত। আর প্রকৃতির মগ্ন কবি আলোক সরকার আকর্ষণ বোধ করেন, 'প্লাবিত সুন্দরতা, বিস্ময়, আনন্দের তরঙ্গিত উচ্ছলতা'র প্রতি। আত্মার গহনে ডুব দিয়ে এক নিবিড় অভিজ্ঞতার কথাই বলেন উৎপলকুমার বসু।

এই সময় থেকে জীবনযাপনেও মিশে যাচ্ছিল কবিতার মতোই এক স্বাতন্ত্র্য। তার প্রকাশও হয়ে উঠতে চাইল বহুমুখী। আর বহুমুখিতার প্রকাশ আশ্রয় পাচ্ছিল একের পর এক প্রকাশিত 'ছোটো পত্রিকা'য়। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাগুলির ভূমিকা অপরিসীম। প্রকৃত পক্ষে যা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা, ফর্মের ভাঙা-গড়া, বক্তব্যের সাহসী প্রকাশ-সবই ধারণ করে আছে কলকাতা আর এ রাজ্যের জেলাগুলি থেকে প্রকাশিত অসংখ্য ছোটো পত্রিকা। কবিতা গল্প, উপন্যাসের নতুনত্বের ক্ষেত্রে এবং বাংলা কবিতার বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে খুব বড়ো ঋণ রয়ে গেল এঁদের কাছে।

বাংলা নাটক ও যাত্রার ধারা :

ভারতবর্ষে নাটকের সূচনা বহুকালপূর্বে। এমনকি ঋগ্বেদের কোনও কোনও সূত্রেও নাট্যক্রিয়ার বীজ চিহ্নিত রয়েছে। পরবর্তীতে উপনিষদ বা মহাকাব্যগুলি সম্বন্ধেও এ কথা খাটবে। আর কালিদাস, ভাস, শূদ্রক প্রমুখ জগৎপ্রসিদ্ধ নাট্যকারের নাট্যকৃতি আজও সংস্কৃত নাটকের সুমহান নাট্য-ঐতিহ্যের সাক্ষ্যবহনকারী। পরবর্তী সময়ে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি গঠনের যুগেও লোক জীবনে নাটকের যোগ ছিল অঙ্গাঙ্গী। চর্যাপদে পাবো 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।/বুদ্ধনাটক বিসমা হোই।।" অর্থাৎ, 'বজ্রাচার্য নাচছেন আর দেবী গান গাইছেন, এর ফলে বুদ্ধনাটক বিপরীতভাবে অনুষ্ঠিত হল'। তৎকালীন বঙ্গ সমাজে নাটগীতির পালা অভিনয়ের সপক্ষে এই পদটি একটি জোরালো প্রমাণ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর গঠনরীতি বিশ্লেষণ করলে একেও নাটগীতিই বলতে হয়। পরবর্তী সময়েও এই ধারা অব্যাহত থেকেছে। পালাগান, কীর্তন কিংবা পাঁচালির মধ্যেও বিবিধ চরিত্র এবং উত্তর-প্রত্যুত্তরের ঢঙে সংলাপ ও গান পরিবেশনে নাটগীতির বহমানতার পরিচয় পাবো। অন্যদিকে পুতুল নাচ, ছৌ, কালীকাচ, আলকাপ বা গম্ভীরার মতো লোকশিল্পেও নাট্য সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে, আর বাংলার নিজস্ব নাট্যমাধ্যম যাত্রার কথাও এপ্রসঙ্গে ভুললে চলবে না। এই নাট্যকলার মূলে বৈদিক কালের নাট্যাঙ্গিকের অবশেষ আবিষ্কার করেছেন কেউ কেউ; অনুমান করা হয় প্রথম পর্যায়ে সূর্য-ই ছিলেন যাত্রা-কাহিনির অধিদেবতা, পরে কৃষ্ণযাত্রা এবং আরও পরে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়। এই বিদ্যাসুন্দর নিয়েই কলকাতায় প্রথম সখের যাত্রাদল বাঁধেন বহুবাজারের রাধামোহন সরকার। গোপাল উড়ে এই যাত্রাদলে গান করে সুবিখ্যাত হন। এরও পূর্বে শিশুরাম অধিকারী অথবা শ্রীদাম, সুবল, পরমানন্দ প্রমুখের কীর্তি স্মরণীয়। কিন্তু আধুনিক অর্থে আমরা যাকে থিয়েটার বলি, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের স্বদেশি নাট্যমাধ্যম থেকে তা সহজ ও স্বত:স্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়নি। সাহিত্য ও সংস্কৃতির আরও অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো নাটকের বিষয়ও ইংরেজি শিক্ষিত নবীন বাঙালির রসদৃষ্টি ইংরাজি নাট্যাঙ্গিকের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল।

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে রুশদেশবাসী গেরাসিম স্তেফানোভিচ লেবেদেফ কলকাতায় প্রথম 'দ্য ডিসগাইজ'-নামক একটি ইংরেজি নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়ে বাঙালি নটনটীদের দিয়ে অভিনয় করান, গোলোকনাথ দাসের অনুবাদে এর নাম হয়েছিল 'কাল্পনিক সংবদল', ১৭১৬-এ আর একবার অভিনয়ের পর বিভিন্ন কারণে লেবেদেফের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

কেবল একদিক খোলা মঞ্চ বা 'প্রসেনিয়াম'-রীতিতে বাঙালির চেষ্টায় প্রথম নাট্যাভিনয় ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটারে। ১৮৩৫-এ শ্যামবাজারে নবীন বসুর বাড়িতে অভিনীত হয় দেশীয় নাটক 'বিদ্যাসুন্দর', সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ যেমন এই সময়েই শুরু হয় তেমনই ইংরাজি আদর্শে নাটক রচনার চেষ্টাও প্রবলতর ছিল। ১৮৫২-র লিখিত যোগেন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তি বিলাস' যেমন ট্রাজেডি ও বিশেষত শেক্স্পিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের ছায়ায় রচিত, ঐ সালেই লেখা তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' তেমনই প্রথম কমেডি লেখার প্রয়াস। হরচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন চারটি নাটক। শেকস্পিয়রের 'মার্চেন্ট অফ্ ভেনিস'-অবলম্বনে 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩), মহাভারতের গল্প নিয়ে 'কৌরববিয়োগ' (১৮৫৮), শেক্স্পিয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' অবলম্বনে 'চারুমুখ চিত্তহরা' (১৮৬৪) এবং ব্রহ্মদেশের কাহিনি নিয়ে 'রজতগিরি নন্দিনী' (১৮৭৪)। এরপর নাম করতে হয় রামনারায়ণ তর্করত্ন বা নাটুকে রামনারায়ণের। তাঁর প্রথম নাটক 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' (১৮৫৪) শিক্ষিত বাঙালি সমাজে কৌলীন্য প্রথার নিরসনে অপূর্ব উদ্দীপনা সঞ্চার করে। তাঁর সংস্কৃত নাট্যানুবাদের মধ্যে পড়ে 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' (১৮৬০) ও 'মালতীমাধব' (১৮৬৭)। পুরাণাশ্রিত বিষয়ে তাঁর মৌলিক নাটক তিনটি—'রুক্মিনীহরণ' (১৮৭১), 'কংসবধ' (১৮৭৫) ও 'ধর্মবিজয়' (১৮৭৫)। তবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালায় অভিনীত 'নবনাটক' বা 'বহুবিবাহ' প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নাটক এবং 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'উভয় সংকট' ও 'চক্ষুদান' প্রহসনগুলি তিনি রচনা করেন।

রামনারায়ণের অনুকারীদের মধ্যে তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক' (১৮৫৮), শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্যবিবাহ নাটক' (১৮৫৯), শ্যামাচরণ শ্রীমানির 'বাল্যোদ্বাহ' (১৮৬০) এবং নফরচন্দ্র পালের 'কন্যাবিক্রয় নাটক' উল্লেখ্য। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইন-সিদ্ধ হলে ঐ বছরেই উমেশচন্দ্র মিত্রের লেখা 'বিধবাবিবাহ' নাটকটিও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণের 'রত্নাবলী'-নাটকের অভিনয় দেখে অতৃপ্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় রসোত্তীর্ণ নাটক রচনায় অভিনিবেশ করেন। তাঁর এই চেষ্টার সার্থক ফল প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯)। মহাভারতের কাহিনি ও পাশ্চাত্য আঙ্গিকের মেলবন্ধনে এটিই আধুনিক বাংলাভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। ১৮৬০-এ লেখা 'পদ্মাবতী' গ্রিক পুরাণের 'apple of discord'-এর কাহিনি নিয়ে রচিত। অন্যান্য কারণ ছাড়াও এই নাটক স্মরণীয় হয়ে থাকবে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারে। তবে মধুসূদনের সিদ্ধিলাভ ঘটেছে তাঁর রচিত দু'টি প্রহসনে। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' লেখার সমসময়েই রচিত 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' এই দুটি প্রহসনে সেকালের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের নৈতিক ব্যাভিচার ও আধুনিকতার নামে উৎকট উন্মার্গগামী কদর্য উচ্ছৃঙ্খলতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনই কপট ধার্মিক ধনাঢ্য বৃদ্ধের দুরাচরণও তার সমস্ত ন্যক্কারজনক হাস্যকরতা নিয়ে উঠে এসেছে। উনিশ শতকের 'বাবু' সংস্কৃতির এর চেয়ে ভালো প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যে আর হয়েছে কি না সন্দেহ। মধুসূদনের শেষ উল্লেখ্য নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) টড্-এর লেখা রাজস্থানের ইতিহাস কথা অনুসরণে রচিত। রাজা জয়সিংহ এবং মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বলি উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর ট্রাজিক মৃত্যুই এই নাটকের উপজীব্য। এছাড়া মৃত্যুর আগে 'মায়াকানন' নামে একটি নাটক তিনি লিখে শেষ করলেও 'রিজিয়া' নাটকটি অসম্পূর্ণই ছিল।

মধুসূদন পরবর্তী সময়ে বাংলা নাটকের ধারায় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আসন দীনবন্ধু মিত্রের। ১৮৬০ সালে 'কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম্' ছদ্মনামে লেখা নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের সার্থক প্রতিফলন 'নীলদর্পণ'

নাটকটি প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন বঙ্গসমাজ এই নতুন নাট্যকারকে চিনে নিতে দেরি করেনি। বস্তুত, নাটক যে সমসময়ের প্রত্যক্ষ ফসল, এমনকি তা যে সমসময়কে প্রভাবিত করতেও সক্ষম এ বিশ্বাস 'নীলদর্পণ' নাটকের সূত্রে তৈরি হওয়া সমাজ আন্দোলনের ঐতিহাসিক বাস্তবয়তায় প্রত্যয়িত হয়েছে। এই নাটকটি অনুবাদ করে মধুসূদন দত্তের জেল ও জরিমানা হয়। ইংলণ্ডে 'Indigo Commission' বসে এবং ক্রমে নীলচাষ রদ হয়। দীনবন্ধুর নাটকগুলিকে মূলত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-(১) সামাজিক নাটক—'নীলদর্পণ' (১৮৬০)। (২) রোমান্টিক নাটক—'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) (৩) কমেডি নাটক—'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'জামাই বারিক' (১৮৭২)। এই নাটকগুলির মধ্যে বিশেষত 'সধবার একাদশী' পৃথক উল্লেখের দাবি রাখে। সমসাময়িক বাংলার ক্ষয়িষ্ণু ও উন্মার্গগামী মূল্যবোধহীন সমাজের চিত্রায়ন এবং নিমচাঁদের মতো যুগসন্ধির বলিপ্রদত্ত সিরিও-কমিক চরিত্রচিত্রণে দীনবন্ধু অত্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছেন।

মনোমোহন বসুর নাটকগুলিতে বাঙালির জাতীয় প্রবণতার সন্ধানের একটি চেষ্টা দেখা যায়। যাত্রার মতো তাঁর নাটকগুলিও ঘটনা শ্লথতায় আক্রান্ত, আবেগসর্বস্ব এবং সংগীতপ্রবণ। তাঁর লেখা পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের মধ্যে 'রামাভিষেক' (১৮৬৭), 'সতী' (১৮৭৩), 'হরিশচন্দ্র' (১৮৭৫), 'পার্থ পরাজয়' (১৮৮১), 'রামলীলা' (১৮৮৯), 'আনন্দময়' (১৮৯০)—এর নাম করা যায়। এই নাটকগুলির মধ্যে স্বদেশপ্রীতির উদ্দীপনাও পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখব। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুভঙ্গ' (১৮৭৮) নাটকে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম সফল প্রয়োগ লক্ষ করা যায় যা পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের হাতে গৈরিশ ছন্দের রূপ নেবে। তাঁর 'প্রহ্লাদচরিত্র', 'নরমেধ যজ্ঞ', 'অনলে বিজলী' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক 'বিক্রমাদিত্য' এবং 'কলির প্রহ্লাদ', 'জাগো পাগলা' ইত্যাদি প্রহসন যথেষ্ট প্রসাদগুণের অধিকারী। এই সময়ের মধ্যে কামিনী সুন্দরী দেবীর তিনটি নাটকের নাম জানা যায়, যথা-'ঊর্বশী', 'ঊষা' ও 'রামের বনবাস'। সম্ভবত, তিনিই বাংলার প্রথম মহিলা নাট্যকার।

বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগে লেবেদেফ বা চৌরঙ্গির সাঁসুসি থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনীত হলেও সেখানে দেশীয় মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। আর তার পরে শ্যামবাজার, জোড়াসাঁকো বা বেলগাছিয়া সর্বত্রই জমিদার ও ধনী মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের প্রাসাদ মঞ্চেই নাটকের অভিনয় চলেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই নাট্যমঞ্চগুলির স্বাভাবিক ভাবেই তাই কোনো যোগ ছিল না। মঞ্চমালিক বা তার অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়ের রুচি ও খামখেয়ালের বশেই অধিকাংশ সময়ে নাটকের অভিনয় বা নির্বাচন নির্ভর করত। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিয়মিত নাটকাভিনয়ের সুযোগ যেমন তৈরি হলো, তেমনই বাংলা থিয়েটারও বাধ্য হলো দর্শক চাহিদা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রাখতে। আর এই যে দু-আনা পয়সা থাকলেই সমাজের যে কোনো শ্রেণির মানুষ রঙ্গমঞ্চে গিয়ে টিকিট কেটে নাটক দেখতে পারলেন, মতামত দিতে পারলেন, এভাবে এই প্রথম বাংলা থিয়েটারের প্রকৃত গণতন্ত্রীকরণ ঘটল। পরবর্তী সময়ে বাংলা নাটকের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রসারও সম্ভব হলো এই প্রেক্ষিতেই। যে জাতীয়তাবাদের কথা আগে বলা হলো, তার অন্যতম কেন্দ্র ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। হিন্দুমেলা (১৮৬৭), শিবাজী উৎসব বা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন কেবল অতীতমুখিনতায় ডুবে না থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অর্থাৎ জাতীয় জাগরণের একটি সর্বাঙ্গীন

রূপের হদিশ পেতে বদ্ধপরিকর ছিল। নাটকের মধ্যেও সেই কর্মপ্রবর্তনাময় আদর্শের ছাপ প্রথম যে দুজনের নাটকে ধরা পড়েছিল তাঁরা হলেন হরলাল রায় আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হরলালের 'হেমলতা' (১৮৭৩) ও 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৪) নাটক দুটিতে পরাধীনতার বেদনাবোধ প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া 'বেণীসংহার' অবলম্বনে 'শত্রুসংহার', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' অনুকরণে 'কনকপদ্ম' ও 'হ্যামলেট' অনুকরণে 'রুদ্রপাল' উল্লেখ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন এ যুগের প্রথম নাট্যকার, জাতীয় প্রণোদনা ছাড়াও যাঁর নাট্যশৈলীও নি:সংশয়াতীত প্রশংসার দাবি রাখে। ১৮৭২-এ লেখা 'কিঞ্চিৎ জলযোগে' স্ত্রী স্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষ থাকলেও পরবর্তীকালের নারীস্বাতন্ত্র্যের আন্দোলনে এই মানুষটি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় প্রহসন 'অলীকবাবু' (১৮৭৭) প্রথমে 'এমন কর্ম্ম আর করব না' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয় এবং বিতর্কের অবকাশ থাকলেও সম্ভবত এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। ফরাসি নাট্যশৈলীর প্রভাব এই নাটকটিকে বিশেষ স্বাদমাধুর্য দিয়েছে। তাঁর অন্যান্য প্রহসনগুলি হলো 'হিতে বিপরীত', 'হঠাৎ নবাব', 'দায়ে পরে দারগ্রহ'। অনুবাদ নাটকের মধ্যে রয়েছে 'অভিজ্ঞান শকুন্তল', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্বশী', 'মালতীমাধব', 'জুলিয়াস সীজার' প্রভৃতি। মৌলিক নাটকগুলির মধ্যে 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) প্রধানত ঐতিহাসিক নাটক, আর তাঁর শেষ মৌলিক নাটক 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) ইতিহাসাশ্রিত হলেও মূলত রোমান্সের জগতেই বিচরণশীল থেকেছে। এই সময়ের আরেকজন স্মরণীয় মানুষ উপেন্দ্রনাথ দাস। এঁর লেখা 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (১৮৭৫) নাটকের অভিনয় সরকারি আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরাধীনতার ক্ষোভ এবং হুগলি জেলার শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যাভিচারের বাস্তব কাহিনি যুক্ত হয়ে এই নাটকটি বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর 'শরৎ সরোজিনী' নামে একটি নাটক এবং 'দাদা ও আমি' নামে একটি প্রহসন রয়েছে।

মঞ্চাশ্রয়ী বাংলা নাটক তথা বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবদান অসামান্য। গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র নাট্যকার ছিলেন না, নট, নির্দেশক, সংগঠক তথা গোটা একটা যুগের ধারক ছিলেন বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বস্তুত তাঁকে কেন্দ্র করেই এই সময় অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দু মুস্তাফী, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বিনোদিনী দাসী প্রমুখ ইতিহাসখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী ও নাট্যকারের সমাবেশ ঘটেছিল। বাংলা থিয়েটারের প্রয়োজনে সবশুদ্ধ ৭৫টি সম্পূর্ণ ও ৪ খানি অসম্পূর্ণ নাটক-নাটিকা-প্রহসন তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ নাটকেই স্বদেশপ্রীতি এবং ধর্মোন্মাদনা উচ্ছ্বসিত আবেগবাহুল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। এ বিষয়ে অগ্রজ মনোমোহন বসুর মতোই তিনি বাঙালি দর্শক সাধারণের নাড়ি চিনতে পেরেছিলেন। পরবর্তী সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ ও ভাবপ্রভাবে তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিতে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্য লক্ষ করা যায়। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক হল—'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' (১৮৮৩), 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৫), 'বুদ্ধদেব চরিত' (১৮৮৫), 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' (১৮৮৬), 'প্রফুল্ল' (১৮৯১), 'জনা' (১৮৯৩); 'বলিদান' (১৯০৫), 'সিরাজদৌল্লা' (১৯০৬) প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে 'কপালকুণ্ডলা' 'বিষবৃক্ষ' 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', 'চোখের বালি' প্রভৃতি বিখ্যাত রচনার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তাঁর 'ম্যাকবেথ' নাট্যানুবাদও একসময় যথেষ্ট মঞ্চসফল হয়েছিল। এছাড়া অপেরাধর্মী 'আবু হোসেন' বা প্রহসন 'বেল্লিক বাজার' (১৮৮৬) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। গিরিশচন্দ্রের পরেই নট ও নাট্যকার রূপে নাম করতে হয় অমৃতলাল বসুর। তাঁর 'হীরকচূর্ণ', 'হরিশচন্দ্র', 'যাজ্ঞসেনী' ইত্যাদি গম্ভীর নাটকগুলিতে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটকগুলি বিভিন্ন দুর্বলতার শিকার। তাঁর

নিজস্ব ক্ষেত্র ছিল হাস্যময় ও শ্লেষ বিদ্রুপাত্মক রঙ্গ রচনার পরিসর। বাঙালি দর্শক সার্থভাবেই এই মানুষটিকে 'রসরাজ' অভিধায় অভিহিত করেছে। তাঁর 'কৃপণের ধন', 'চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে', 'বিবাহ বিভ্রাট', 'বাবু', 'খাসবদল', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি রচনা কালোত্তীর্ণ সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। এই সময়ের আর একজন বিখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনিকে যেমন উনিশ শতকীয় মানবতাবাদী মূল্যবোধের আলোকে পুনর্নির্মিত করেছেন, তেমনই স্বদেশভক্তির উদ্দীপনাও প্রবলভাবে তাঁর নাটকগুলিতে লক্ষ করা যায়। তবে, আবেগের অতিশায়িতা নয়, বরং পরিচ্ছন্ন গঠনশৈলীর জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে 'ভীষ্ম', 'নরনারায়ণ', 'আলিবাবা', 'প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ্য। ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক ও দেশি-বিদেশি উপকথাভিত্তিক নাটক মিলিয়ে তাঁর মোট নাট্যসংখ্যা প্রায় ৪০টি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন এযুগের অন্যতম জনপ্রিয় নাট্যকার। তিনি শেক্সপীয়র নাট্য আঙ্গিকের অনুসরণে এবং প্রাণবান জীবনরসের সংযোজনে রোমান্টিক কমেডি নাট্য, ঐতিহাসিক বিষয়াশ্রিত, স্বদেশী-ভাবাপন্ন এবং সামাজিক ও পৌরাণিক নাটক—সর্বক্ষেত্রেই অনায়াস সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক নাটকের মধ্যে 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে সামাজিক নাটক 'পরপারে', পৌরাণিক গীতিনাটিকা 'সীতা' ও 'পাষাণী' এবং 'কল্কি অবতার', 'পুনর্জন্ম' প্রভৃতি প্রহসনগুলি আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে।

আগেই বলা হয়েছে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থিয়েটারেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষ লক্ষণ ধরা পড়তে শুরু করেছিল। 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দিয়েই জাতীয় রঙ্গালয়ের উদ্বোধন ঘটে এবং এই সময় থেকেই ব্রিটিশ সরকার থিয়েটারের ক্ষমতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন। ১৮৭২-এ 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নীলদর্পণের বিতর্কিত অংশগুলি বাদ দিয়ে অভিনয় করলেও 'ইংলিশম্যান' কাগজের সমালোচনা এবং পুলিশি পরিদর্শনের সম্মুখীন হয়েছিল। ১৮৭৬ নাগাদ বেঙ্গল থিয়েটার এবং ন্যাশনাল থিয়েটার ভাঙা নবগঠিত 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' বিভিন্ন সামাজিক, পৌরাণিক বা প্রহসনমূলক নাটকের সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম', কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতে যবন', হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান', 'হেমলতা', নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়ার', অমৃতলালের 'হীরকচূর্ণ', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী', 'গজদানন্দ ও যুবরাজ', 'হনুমানচরিত্র', 'পুলিস অফ পিগ অফ শিপ' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় ব্রিটিশ সরকারের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে। এই নাটকগুলির অধিকাংশেরই বিষয় ছিল সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনায় ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা বিস্তারের নগ্ন আস্ফালন। এই সময় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'চা-কর দর্পণ' নাটকটি প্রকাশ হলে নীলদর্পণের অভিজ্ঞতায় ভুক্তভোগী ব্রিটিশ সরকার চা-ব্যবসায়ের উপর আঘাত আসার আশঙ্কায় মরিয়া হয়ে উঠল। সরকারের এই দমনমূলক মনোভাবের পিছনে নীতিবাগীশ মধ্যবিত্ত বাঙালির পরোক্ষ ইন্ধনও কিছু কম ছিল না। রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীদের উপস্থিতিতে এই শিক্ষিত নাগরিক ভদ্রসমাজ অশ্লীলতার দোহাই দিয়ে থিয়েটারকে জল-অচল করতে চেয়েছিলেন। এই দুই শক্তির সমবেত উদ্যোগের ফসল ১৮৭৬-এ অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন, যা ঐ বছর ১৬ ডিসেম্বর তারিখে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক লিপিবদ্ধ করেন। আইনের জমি আগে থেকে প্রস্তুত থাকলেও উপলক্ষ ছিল মহারানি ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্-এর ভারত-আগমন ও নানরকম বেয়াড়া আবদারের কাহিনি নিয়ে লেখা

উপেন্দ্রনাথ দাসের 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নাটকটি। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি নাটকটি দুবার অভিনয়ের পরেই পুলিস-এর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে। নাটকটির নাম পাল্টে 'হনুমান চরিত্র' রেখে ২৩ তারিখ আবার অভিনয়ের পর তৎক্ষণাৎ পুলিস তা নিষিদ্ধ করে। এই দমন-পীড়ন চলতেই থাকে এবং ঐ বছর ৪ ঠা মার্চ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু প্রমুখ-সহ মঞ্চমালিক ভুবমোহন নিয়োগী অশ্লীলতার দায়ে গ্রেপ্তার হন। এই বিচার নিয়ে পত্র-পত্রিকা সহ জনমানসে অনেক আলোচনা হয় এবং কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বজ্জন উপেন্দ্রনাথদের পক্ষে দাঁড়ালে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালের নামমাত্রা সাজা হয়। কিন্তু এর পরপরই ব্রিটিশ সরকার 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' (১৬ ডিসেম্বর, ১৮৭৬) 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' (১৮ মার্চ, ১৮৭৮) এবং আর্মস অ্যাক্ট প্রণয়ন করে ভারতবাসীর মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ এবং নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে আইন করতে বাধ্য হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতি ও তীব্রতা যে এইসময় ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ইংরেজ সরকারের আচরণে তা প্রমাণিত হলো।

সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বিচরণ করেছেন এবং নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। বস্তুত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে নাট্যচর্চার ঐতিহ্য ও আবহেই তাঁর শৈশব কেটেছে। কৈশোরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে সঙ্গীত রচনা ও সুরারোপ-সহ অভিনয়ও করেছেন তিনি। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই অপরিণত বয়সেই 'বাল্মীকি প্রতিভা' বা 'কালমৃগয়া'র মতো গীতিনাট্যে তাঁকে হাত পাকাতে দেখা যাবে। গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কৌতুকনাট্য সামাজিক, ঐতিহাসিক—বিবিধ ধারার নাটক রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি তাঁর রূপক-সাংকেতিক ও তত্ত্বাশ্রয়ী নাটকগুলিতে। যদিও সমসময়ে রবীন্দ্রনাথের নাটক জোড়াসাঁকো বা বিশ্বভারতীর নিজস্ব প্রযোজনা ছাড়া সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রায় কখনই গৃহীত হয়নি। অনেক পরে মূলত বহুরূপী নাট্যদলের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাটকগুলি প্রকৃত মঞ্চসাফল্য অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(১) গীতিনাট্য—বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২), মায়ার খেলা (১৮৮২)।

(২) কৌতুক নাট্য—গোড়ায় গলদ (১৮৮২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), হাস্যকৌতুক (১৯০৭), ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭), চিরকুমার সভা (১৯২৫), শোধবোধ (১৯২৫)।

(৩) রূপক সাংকেতিক ও তত্ত্বাশ্রয়ী নাটক—শারদোৎসব (১৯০৮), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬) গুরু (১৯১৮), অরুপরতন (১৯১৯), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকবরী (১৯২৪), পরিত্রাণ (১৯২৯), কালের যাত্রা (১৯৩২), রথের রশি (১৯৩২), তাসের দেশ (১৯৩৩)।

(৪) সামাজিক নাটক—গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), বাঁশরী (১৯৩৩)।

(৫) নৃত্যনাট্য—শাপমোচন (১৯৩১), চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চণ্ডালিকা (১৯৩৭), শ্যামা (১৯৩৯)।

(৬) বিবিধ—রুদ্রচণ্ড (১৮৮১), প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), রাজা ও রানী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৯৯০), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), বিদায় অভিশাপ (১৮৯৪), মালিনী (১৮৯৬), নরকবাস (১৯০০), গান্ধারীর আবেদন (১৯০০), কর্ণকুন্তীসংবাদ (১৯০০)।

তাঁর বিবিধ নাটকের মধ্যে 'রক্তকবরী', 'মুক্তধারা', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'তাসের দেশ', 'অরূপরতন', 'রাজা' বা 'রথের রশি' দেশ-কাল-সমাজ-সম্পর্ক-অর্থনীতি-রাজনীতি সহ জীবনরহস্যের গভীর অনুধ্যানে শাশ্বতভাবে প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্র সমসাময়িক ও পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন', যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা', শচীন সেনগুপ্তর 'সিরাজদৌল্লা' ও 'গৈরিক পতাকা', মন্মথ রায়ের 'কারাগার', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'লাঙল', 'বন্দিতা', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী জোড়া অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অব্যবস্থা, বিজিত দেশগুলির সম্মিলিত উষ্মা এবং ১৯২৯-এর বিশ্বজোড়া বিরাট আর্থিক মন্দায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতা প্রকাশ্যে আসে। এই সুযোগে ইতালি, জার্মানি, স্পেন, গ্রিস ও জাপানে দেশাত্মবোধের মুখোশে একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। রোমা রোঁলাঁ, আদ্রেঁ জিঁদ, এপকেনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ সহ পৃথিবীর তাবৎ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী গণতন্ত্র ও মানবিকতার মৃত্যুতে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ার শপথ নেন। ফেদেরিকো লোরকা, র‍্যালফ্ ফক্স সহ অনেকেই উদ্দীপনা এনেছিল এবং তারাও সাম্রাজ্যবাদ সহ ফ্যাসিজমের তীব্র নিন্দা করেছিল। ভারতে এই পরিপ্রেক্ষিতেই গণনাট্য সঙ্ঘ তথা গণনাট্য আন্দোলনের সূচনা। IPTA (Indian Peoples' Theatre Association) ছিল কম্যুনিস্ট পার্টিরই সাংস্কৃতিক মঞ্চ। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে যোগ রেখেই এদেশেও ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছিল। এর পরপরই স্থাপিত হয়েছিল প্রগতি সাহিত্য শিল্পী সঙ্ঘ। এই সংগঠনগুলিরই উত্তরাধিকারী হিসেবে ১৯৪৩-এর মে মাসে অধুনা মুম্বাই-এ সোভিয়েত বা চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক মঞ্চ এবং রোমা রোলাঁ, ব্রেখট্ প্রমুখের আদর্শ Peoples' Theatre বা জনগণের থিয়েটারের আদর্শকে মাথায় রেখেই IPTA-র প্রতিষ্ঠা। IPTA-র বুলেটিনে বলা হল— 'The movement seeks to make our art the expression and organism of our people's struggle for freedom, economic justice and democratic right,.....the movement seeks to stand against fascism and imperialism and everything which is against of our people.'

গণানাট্যের আদর্শগুলিকে সূত্রাকারে প্রকাশ করা যাক—

(১) নাটক বা যে কোনো শিল্পে বাস্তব জীবনসমস্যার রূপায়ণ থাকবে। জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধ সেই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাও চিত্রিত হবে।

(২) ব্যক্তিকে বিশিষ্ট শ্রেণিভুক্ত করে দেখাতে হবে তার শ্রেণি মানসিকতার রূপায়ণও থাকা চাই।

(৩) ব্যক্তিনায়কের পুরনো চিন্তার অনুবর্তন চলবে না, মুখ্য হয়ে উঠবে সমষ্টির কথা।

(৪) শিল্পের উদ্দেশ্য হবে জনতার মনোরঞ্জন, একই সঙ্গে শিক্ষা বিধান। জনগণের দুর্দশার মূল কারণ এবং তার পরিবর্তনের উপায় সম্বন্ধে তাদের সচেতন করানো।

(৫) লোকসংগীত, লোকশিল্প, লোকউৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে লোকহৃদয়ের স্পন্দন বুঝতে চাওয়া এবং নাগরিক মধ্যবিত্ত সংস্কার ত্যাগ করে শ্রমজীবী ও গ্রামীণ লোকমানসের কাছাকাছি যাওয়া। তুলসী লাহিড়ী (১৮৭৯-১৯৫৯) ছিলেন একাধারে নট, নাট্যকার, রঙ্গমঞ্চ পরিচালক এবং সঙ্গীতকার। ১৩টি পূর্ণাঙ্গ নাটক, ১৬টি একাঙ্ক নাটক এবং একটি নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো—'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৭), 'ছেঁড়া তার' (১৯৫৩), 'বাংলার মাটি' (১৯৫৩), 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' (১৯৫৯), 'ঝড়ের মিলন' (১৯৬০) ইত্যাদি। নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ 'নাট্যকারের ধর্ম' (১৯৬০) তাঁর নাট্যদর্শনের প্রতিফলন স্বরূপ। IPTA-র সাহিত্যাদর্শ মেনেই তুলসী লাহিড়ীর নাটক সমষ্টিজীবনের কথা তুলে ধরেছে, আঞ্চলিক জীবন ও লোকজীবনের বস্তুনিষ্ঠ চিত্রণে যত্নবান থেকেছে এবং হয়ে উঠেছে শ্রেণি সংগ্রামের হাতিয়ার।

গণনাট্য পর্বের আর একজন উল্লেখ্য নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৯০) শ্রেণি চেতনার আদর্শে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সমাজের সমস্যা ও সংকট, দেশভাগজনিত মানুষের বিপর্যয় ও ছিন্নমূল মানুষের অসহায়তা, সাম্প্রদায়িক বর্বরতা, শাসক শ্রেণির দমনপীড়ন এবং শ্রমিক—কৃষকের দুঃসহ জীবনচর্যা তাঁর নাটকে স্থান করে নিয়েছে। 'আহুতি' (১৯৩২), 'দীপশিখা' (১৯৪৩), 'তরঙ্গ' (১৯৪৬), 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭), 'অন্তরাল' (১৯৪৪), 'মশাল' (১৯৫৪), 'অমৃতসমান' (১৯৬৯), 'স্বর্গের সিঁড়ি (১৯৮২) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক।

নাট্যকার, অভিনেতা, সংগীতবিদ্ এবং বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭২) ছিলেন বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। ১৯৪২-এ কম্যুনিস্ট পার্টি ও যথাক্রমে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ও IPTA-র সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। ১৯৪৩ এর মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত 'নবান্ন' নাটকটির ১৯৪৪ সালের ২৪ এ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনয়ের পর থেকেই বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা হলো বলা যেতে পারে। 'নবান্ন' ছাড়াও তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'মরাচাঁদ' (১৯৪৬), 'অবরোধ' (১৯৪৭), 'জতুগৃহ', (১৯৬২), 'গোত্রান্তর' (১৯৫৭), 'ছায়াপথ' (১৯৬১), 'মাস্টারমশাই' (১৯৬১), 'দেবীগর্জন' (১৯৬৯), 'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৬৬), 'ধর্মগোলা' (১৯৬৭), 'আজ বসন্ত' (১৯৭০), 'গর্ভবতী জননী' (১৯৭১), 'সোনার বাংলা' (১৯৭১) উল্লেখ্য। একাঙ্ক নাটকের মধ্যে 'আগুন' (১৯৪৩), 'জবানবন্দী' (১৯৪৩), 'জননেতা' (১৯৫০), 'লাশ ঘুইর‍্যা যাউক' (১৯৭০), 'হাঁসখালির হাঁস' (১৯৭৭) এবং গীতিনাট্য 'জীয়নকন্যা' (১৯৪৮) এবং রূপক নাট্য 'স্বর্ণকুম্ভ' (১৯৭০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুম্বাই এবং টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গেও চিত্রনাট্যকার হিসেবে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং হিন্দি ও বাংলা ভাষায় 'নাগিন', 'বসু পরিবার', 'সাড়ে চুয়াত্তর' প্রভৃতি জনপ্রিয় ছায়াছবির চিত্রনাট্য তাঁর রচনা। IPTA-র সাহিত্য আদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিফলন দেখা যায় বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকৃতিতে, দুর্গতি, মন্বন্তর বা বিভীষিকাই নয়, বেঁচে ওঠার সংকল্পে, প্রতিরোধের দৃঢ়তায়, নবজীবনের আহ্বানে তাঁর নাটক সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। এই সময়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাট্যব্যক্তিত্বদের মধ্যে সলিল সেন ('নতুন ইহুদী', 'মৌ চোর', 'দর্পণ') কিরণ মৈত্র ('বারো ঘণ্টা', 'চোরাবালি', 'সংকেত', 'নাটক' নয়'), ধনঞ্জয় বৈরাগী/তরুণ রায় ('রুপোলি চাঁদ', 'একমুঠো আকাশে', 'এক পেয়ালা কফি') বীরু মুখোপাধ্যায় ('সংক্রান্তি', 'এতটুকু বাসা'), গঙ্গাপদ বসু ('জীবনায়ন', 'সত্য মারা গেছে', 'নমো যন্ত্র', 'বিশ্বাসের মৃত্যু'), পরেশ ধর ('ছায়া', 'ডানা ভাঙা পাখি', 'কালপুরী'), ঋত্বিক ঘটক ('দলিল', 'গ্যালিলিও', 'জ্বালা') প্রভৃতি উল্লেখ্য।

গণনাট্যের পরবর্তী পর্যায় নবনাট্য আন্দোলন। নবনাট্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গঙ্গাপদ বসু লিখেছেন—''রবীন্দ্রনাথের ক্লাসিক পর্যায়ের নাটকের কথা, যেগুলোকে অনায়াসেই নবনাট্যের নাটক বলতে

পারি, আবার আধুনিক কালের কোনো রচনাকে হয়তো নবনাট্যের নাটক নাও বলা যেতে পারে। মোটামুটি বলা যায়, সৎ মানুষের নতুন জীবনবোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবনগঠনের মহৎ প্রয়াস সে সুলিখিত নাটকে শিল্প সুষমায় প্রতিফলিত, তাকেই বলতে পারি নবনাট্যের নাটক এবং এইরকম নাটক নিয়ে মঞ্চে সমাজ সচেতন শিল্পীর মতো ও রিয়ালিটির যে অন্বেষণ তাকেই বলতে পারি নবনাট্য আন্দোলন।" বস্তুত, গণনাট্য-প্রবর্তিত নব্যরীতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে সহমত পোষণ করলেও কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের সীমায় নিজেদের আবদ্ধ করতে না চেয়ে যে সমস্ত নাট্যদলগুলি উদ্ভূত হয়, নবনাট্য নামে সেই দলগুলিই চিহ্নিত হয়েছে। পূর্বোক্ত নাট্যকারদের অধিকাংশই গণনাট্য ও নবনাট্য উভয় আন্দোলনেরই শরিক ছিলেন, কিন্তু নবনাট্যের সূত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে মানুষটি, তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যপরিচালক শম্ভু মিত্র (১৯২৫-১৯৯৭)। নাট্যকার হিসেবেও তাঁর অবদান অসীম। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে 'ঘূর্ণি', 'কাঞ্চনরঙ্গ', সফোক্লেস অনুসরণে 'রাজা অয়দিপাউস', ইবসেনের অনুসরণে 'পুতুলখেলা', 'গর্ভবতী বর্তমান', 'অতুলনীয় সংবাদ', 'বিভাব', 'চাঁদবণিকের পালা' উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৮ সালে বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা এবং রবীন্দ্রনাথ, সফোক্লেস, ইবসেন প্রমুখের দেশি-বিদেশি নাটকের সফল মঞ্চ প্রযোজনা, থিয়েটারের নিত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সর্বোপরি জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতায় তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শম্ভু মিত্রের স্ত্রী তৃপ্তি মিত্রর (১৯২৫-১৯৮৯) আধুনিক নাট্যশিল্পে অভিনেত্রী ও রঙ্গমঞ্চ পরিচালিকা হিসেবে কৃতিত্ব সমাধিক হলেও বেশ কিছু নাটক এবং নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা। 'শিবতোষ ভাদুড়ী' ছদ্মনামে তিনি বেশ কিছু গল্প ও নাটক রচনা করেন, তাঁর রচনাগুলির মধ্যে 'বলি', 'ইদুঁর', 'সুতরাং', 'প্রহরশেষে', 'কে?', 'বিদ্রোহিনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ের আরও দু'জন উল্লেখ্য নাট্যকার সুনীল দত্ত ('জতুগৃহ', 'হরিপদ মাস্টার', 'সংবিধান বিভ্রাট', 'মালাবদল', 'বর্ণপরিচয়') এবং উমানাথ ভট্টাচার্য ('সমান্তরাল', 'ছারপোকা', 'সকাল সন্ধ্যার নাটক')।

আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের অন্যতম এবং সর্বভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলা নাটকের গুরুস্থানীয় ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১)। পেশায় নগর পরিকল্পনা ও নির্মাণ কলাবিদ্, এমনকি এ বিষয়েও তাঁর বই রয়েছে। অথচ, পঞ্চাশের দশকের পর থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় সামুয়েল বেকেট, হ্যারল্ড পিন্টার, লুইজি পিরানদেল্লো প্রমুখের প্রবর্তনায় আপাত অর্থহীন যে অ্যাবসার্ডিটি ও যাদুবাস্তবতা আধুনিক নাটকের প্রাণস্বরূপ হয়ে উঠল, বাংলা নাটকে তার সার্থক প্রয়োগের কৃতিত্ব বাদল সরকারেরই প্রাপ্য। তাঁর নাট্যাদর্শ প্রসেনিয়াম মঞ্চ ও পেশাদারি বাজার-নির্ভর কিংবা দলীয় প্রতিষ্ঠানমুখী থিয়েটার চর্চার বাইরে এক তৃতীয় ধারার নাট্যচর্যা শুরু করে। এই প্রণোদনা থেকেই ১৯৬৮ সালে তিনি 'শতাব্দী' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজও পথনাটক অথবা অঙ্গনমঞ্চের নাটকের নিয়মিত চর্চা করে চলেছে। বাদল সরকারের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৫), 'বাকী ইতিহাস' (১৯৬৭), 'পাগলা ঘোড়া' (১৯৬৭), ত্রিংশ শতাব্দী' (১৯৬৯), 'মিছিল' (১৯৭৪), 'ভোমা' (১৯৭৫), 'সুখপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৯৭৬) প্রভৃতি। ১৯৭২-এ হাওয়ার্ড ফাস্টের 'স্পার্টাকাস' উপন্যাসের নাট্যায়নও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষণ অনুযায়ী নাটকের আদি-মধ্য-অন্তের সুসমঞ্জসতা সযত্নে পরিহার, ইঙ্গিতধর্মী সংলাপের ব্যবহার, বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তুখোড় রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং যুগযন্ত্রণা-কাতর বিচ্ছিন্ন অসহায় মানুষের বেদনাই বারংবার তাঁর নাটকে উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

নট, নাট্যকার, সংগঠক, রঙ্গমঞ্চ পরিচালক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) আধুনিক নাট্য সাহিত্যের ও নাট্যকলার জগতে প্রাত:স্মরণীয়। তিনি ১৯৪৭ সালে 'দ্য শেক্সপিরিয়ান' নামের দল গড়েন।

১৯৫১ সালে গণনাট্য সঙ্ঘের সভ্য হন। পরবর্তীকালে লিটল থিয়েটার গ্রুপে কিছুদিন নাটক করার পর ১৯৬৯ সালে 'পিপল্‌স্ টিল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে 'ছায়ানট' (১৯৫৪), 'অঙ্গার', (১৯৫৯), 'ফেরারি ফৌজ' (১৯৬১), 'কল্লোল' (১৯৬৮), 'মানুষের অধিকার' (১৯৬৮), 'টিনের তলোয়ার' (১৯৭৩), 'ব্যারিকেড' (১৯৭২), 'রাইফেল' (১৯৬৮), 'দুঃস্বপ্নের নগরী' (১৯৭৫)। এছাড়া 'তিতুমীর', 'মহাবিদ্রোহ', 'টোটা', 'দাঁড়াও পথিকবর', 'ঘুম নেই', 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', 'নীল রক্ত' প্রভৃতি নাটক এবং 'দিল্লী চলো', 'মাও সে তুং', 'ভুলি নাই প্রিয়া', 'অরণ্য জাগছে', 'সমুদ্র শাসন' প্রভৃতি যাত্রাপালা আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। 'শেক্সপীয়রের সমাজচিন্তা' ও 'গিরিশ মানস' তাঁর দুটি বিখ্যাত নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ। সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁর নাটকগুলি সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ফ্যাসিবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের প্রেরণায় পাঠক ও দর্শকসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

পরবর্তীকালে বাংলা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ স্মরণীয়। ছাত্রাবস্থায় গণনাট্য সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। ১৯৬০ সালে গণনাট্য সঙ্ঘেরই একটি শাখা হিসেবে গড়ে তোলেন নান্দীকার নাট্যসঙ্ঘ। এই নাট্যসংস্থার একাধিক প্রযোজনা বাংলা থিয়েটারে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ১৯৭৭ সালে বিবিধ কারণে নান্দীকার থেকে বেরিয়ে এসে 'নান্দীমুখ' নামে আরো একটি নাট্যদল তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিভিন্ন নাটকের মধ্যে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'সেতুবন্ধন', ব্রেখটের 'থ্রি পেনি অপেরা'-অবলম্বনে 'তিন পয়সার পালা', আর্নল্ড ওয়েস্টারের 'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি'-অবলম্বনে 'মাছের ঝোল আর পাউরুটি', জোশেফ কেসারলিঙের বিখ্যাত প্রহসন 'আর্সেনিক অ্যান্ড দ্য ওল্ড লেস'-অবলম্বনে 'বীতংস', 'শের আফগান' অথবা চেকভ-অবলম্বনে 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' বা 'তামাকু সেবনের অপকারিতা' উল্লেখ্য।

পরবর্তী সময়ে অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে অনাদি বসু ('আলোর নিশানা', 'শপথ', 'জন্ম শতবর্ষ'), অমল রায় ('কেননা মানুষ', 'এদেশেও নর্ম্যান বেথুন', 'ইঁদুর দৌড়'), অসীম ঘোষ ('বাতিল', 'কাকলাস', 'পৌন:পুনিক') কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ('হজমশক্তি', 'স্পন্দন', 'মদিনের যুদ্ধ'), চিত্তরঞ্জন দাস (সন্ত্রাস, 'সমুদ্রের স্বাদ', 'যুদ্ধ শুরু আজ'), মোহিত চট্টোপাধ্যায় ('বাইরের দরজা', 'রাক্ষস', 'সোনার চাবি', 'বর্ণবিপর্যয়', 'ক্যাপ্টেন হুর্‌রা'), রাধারমণ ঘোষ ('হারাধনের দশটি ছেলে', 'অহম্ আবাম বয়ম্'), শ্যামলতনু দাশগুপ্ত ('যাদুকর', 'উপজিল' বিষহরি'), সুব্রত মুখোপাধ্যায় ('পিপাসা', 'কলুষ', 'চক্রব্যূহ', 'চৌহদ্দি পেরিয়ে'), দেবাশীষ মজুমদার ('ইমন কল্যাণ'), মনোজ মিত্র ('কাকচরিত্র', 'সন্ধ্যাতারা', 'আমি মদন বলছি', 'দম্পতি', 'গল্প হেকিম সাহেব'), রমাপ্রসাদ বণিক ('সহবাস', 'খেলাঘর, 'মানানসই', 'ভ্যাবলাই ভালো'), জোছন দস্তিদার ('কালোমাটির কান্না'), শৈলেশ গুহনিয়োগী ('রিহার্সাল', 'পলিটিক্স', ('গোলপার্ক'), সরোজ রায় ('গরুর গাড়ির হেডলাইট'), বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ('একটি অবাস্তব গল্প') প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন সংস্কৃত নাটক বা লোক আঙ্গিকে নাট-গীতি চর্চার ইতিহাস বাদ দিলেও ইউরোপীয় আদর্শে বাঙালির থিয়েটার চর্চারও দুশো বছর পার হয়েছে। রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, ক্ষীরোদপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্রের সময় পেরিয়ে আজ বাংলা নাট্যসাহিত্য বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটে নিজের মূল্য ও অবস্থান আবিষ্কারে সচেষ্ট। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা প্রসঙ্গে, রাজনৈতিক বিশ্লেষণে, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায়, পরীক্ষানিরীক্ষার নতুনত্বে বাংলা

নাটকের যে ভুবনটি তৈরি হয়েছে, আগামী দিনের নাট্যকাররা তার পরিধি ও গভীরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবেন—এমন আশা করা খুব অসমীচীন নয়।

যাত্রা :

'যাত্রা' শব্দটি প্রধানত যাওয়া বা গমন অর্থে বোঝায়। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে দেবদেবীর পুজো উপলক্ষে নাচ-গানবাদ্যযন্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রার প্রচলন ছিল। উৎসব বোঝাতে যাত্রা শব্দের ব্যবহার আজও প্রচলিত; যেমন দোলযাত্রা, রথযাত্রা, রাসযাত্রা ইত্যাদি। যাত্রা কথাটির ব্যাপক প্রচলন এবং যাত্রার সঙ্গে সংগীত ও নৃত্যের যোগসূত্রই মনে হয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের কথার যাথার্থ্য খুঁজে পাওয়া যাবে, ''যাত্রায় দৃশ্যপটাদির কোন ব্যবস্থা ছিল না। সংগীত ও উক্তি প্রত্যুক্তি দ্বারা বক্তব্য বিষয় প্রকাশ হইত। আমাদের যাত্রায় তখন সংগীতের প্রভাব বড়ো বেশি ছিল। আর ভারতের সকল জায়গাতেই দেবলীলা কীর্তনে গীতবাদ্য দেখিতে পাওয়া যাইত, এখনও যায়।" বিভিন্ন ধর্মোৎসবে নাট্যগীত অনুষ্ঠানের দেশজ প্রচেষ্টার পরিণতি হিসেবেই যাত্রা সাহিত্যের উদ্ভব।

চর্যাপদে 'বুদ্ধনাটক বিসমা হোই' পদে যে নাট্যরীতির উল্লেখ আছে, তা যাত্রারই দোসর। গীতগোবিন্দ এবং প্রধানত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যেই যে প্রাচীন লোকনাট্যের রস ঘনীভূত হয়েছিল সন্দেহ নেই। তবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলেই যাত্রা তথা কৃষ্ণযাত্রা নতুন রূপ নিল। ১৫০৯ সালে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে এবং পরে দ্বিতীয় শ্রীবাসের গৃহে কৃষ্ণযাত্রা যে অভিনীত হয়েছিল চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলের পাতা সে কথা বলছে। এই চৈতন্যের সময় থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত যাত্রার ক্ষেত্রে প্রধান বিষয়ই ছিল কৃষ্ণকথা, 'কানু বিনে গীত নেই'। তবে পাশাপাশি এ কথাও বলা দরকার যে যাত্রার মধ্যে নাট্যাঙ্গিকের স্থূল কাঠামোটুকুই গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আসলে সাংগীতিক আবেদনেরই আস্বাদন করা হত। চৈতন্যের তিরোভাবের পর কৃষ্ণযাত্রার এই সমৃদ্ধি কমে আসতে থাকে এবং অষ্টাদশ শতকে এসে যাত্রাকে লোকরঞ্জনের একটি নিম্নমানের অনুষ্ঠান হিসেবে দেখা শুরু হল। সমাচার দর্পণ, সংবাদ প্রভাকরের মতো প্রভাবশালী সাময়িক পত্রে যাত্রাকে বর্জনের কথা, এর অনৈতিক ও ক্ষতিকর প্রভাবের কথা লেখা হল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত যাত্রাকে নিন্দা করলেন।

কিন্তু যাত্রা তবু উঠে গেল না, বাংলার গ্রামাঞ্চলে আনন্দ ও ক্রমেই তা শিক্ষাদানের মাধ্যম হয়ে উঠল। নিম্নরুচির ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতা যখন গ্রাস করছিল যাত্রাকে তখন আঠারো শতকের শেষে আর উনিশ শতকের গোড়ায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথা অনুযায়ী যাত্রার 'পুনর্বিকাশ' হয়। এই 'পুনর্বিকাশ'-এর জন্য যাঁর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি শিশুরাম অধিকারী। 'শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রা পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে।' শিশুরাম ছিলেন কালীয়দমন যাত্রা প্রবর্তক। শ্রীদাম ও সুবল ছিলেন শিশুরাম অধিকারীরই শিষ্য। এ সময়ে কৃষ্ণযাত্রার পাশাপাশি 'বিদ্যাসুন্দর'ও যাত্রার অঙ্গনে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখা থেকে পরমানন্দ অধিকারীর নামও জানা যায়। পরমানন্দ বীরভূমের লোক ছিলেন। পরমানন্দ সম্বন্ধে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন— 'he used to run the whole show by acting the part of a Duti... There was not too much abundance of songs in Parma's Yatra... At the last end or that

rhymed couplets, he used to sing in the time of Kirtan... That was known as "Tukko" and Paramananda was its creator. পরমানন্দের সমসময়ে প্রেমচাঁদ বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন, জনসাধারণের কাছে 'থরকাটা প্রেমা' নামে প্রতিষ্ঠা ছিল। এই 'থরকাটা প্রেমা'র দলের 'ছোকরা' বদনের যাত্রাগান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

গোবিন্দ অধিকারীর হাতে যাত্রার পালাবদল ঘটলে; তিনি নতুন রুচির সঙ্গে তাল রেখে পালা-নাটকে অঙ্কভাগ করেছেন, কিন্তু দৃশ্যভাগ করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে গোবিন্দ অধিকারীর উল্লেখ আছে। ভক্তিরসের প্রসারের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণযাত্রাকে নতুন ছাঁদ দিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন 'রামায়ণী কথা' অবলম্বনে 'ভরতমিলন পালা'।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই কৃষ্ণযাত্রার পাশাপাশি বিদ্যাসুন্দর যাত্রাও জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। ১৮২২ সালে বরাহনগরের রামজয় মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসুন্দর যাত্রা করেন। পরে হাওড়ার ঠাকুরদাস দত্ত, ভবানীপুর বেলতলার দল, হলধরের যাত্রার দল বিদ্যাসুন্দর পালার প্রসার ঘটান। তবে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে গোপালচন্দ্র দাসের প্রযোজনায়। গোপাল তাঁর পালায় গানগুলিতে নিজে সুর দিতেন, নৃত্য পরিকল্পনাও ছিল তাঁরই। নাচের ক্ষেত্রে তিনি নতুন যে রীতি প্রবর্তন করলেন, তা অনেকটাই যেন ওড়িয়া সংস্কৃতির বঙ্গীকরণ, গোপাল নাচ ও গানকে বেঁধে একটি ব্যালে তৈরি করলেন, গোপালের বিদ্যাসুন্দর পালায় গদ্য-সংলাপের ব্যবহার ছিল না। এই গানগুলি এত জনপ্রিয় হয় যে 'গোপাল উড়ের টপ্পা' কথাটি এই সময়ে জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তাসের দেশ' নাটকে 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' গানেও তার ছায়াপাত দেখা যায়।

দুই ভাই বকু মিঞা ও সাদের মিঞা লোকযাত্রার দল গড়েন। বাগবাজারে তৈরি হয় ঝাড়ুদাস অধিকারীর দল। ১৮৭২ সালে ব্রজমোহন রায় যাত্রার দল গড়েন এবং চণ্ডীযাত্রায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সুগায়ক ব্রজমোহনের সাবিত্রী সত্যবান, অভিমন্যু বধ, কংস বধ প্রভৃতি যাত্রা যেন মহাভারতের মোড়কে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ। সাংবাদিকতা ও স্বদেশ চেতনায় উনিশ শতকের আরেকটি উজ্জ্বল নাম হরিনাথ মজুমদার, যিনি কাঙাল হরিনাথ বা কাঙাল ফিকিরচাঁদ নামেও পরিচিত ছিলেন। ফিকিরচাঁদের গান ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে-গ্রামান্তরে। বাউল গানের পাশে তিনি রচনা করেন নানান পাঁচালি-নাটক-গীতাভিনয়, বিজয়া, সাবিত্রী, কৃষ্ণকালী-লীলা, কংসবধ ইত্যাদি। এই সময়ে যাত্রা বা গীতাভিনয়ে এলেন মতিলাল রায়। ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতার দায় থেকে মুক্ত করে মতিলাল যাত্রাকে ব্যবহার করলেন লোকশিক্ষার বাহন হিসেবে এবং ভারতব্যাপী কিংবদন্তিতে পরিণত হল তাঁর যাত্রা। মতিলালের যাত্রার বিষয় ছিল বাল্মীকির রামায়ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মহাভারত। মতিলালের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, চন্দননগরের মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বা মদন মাস্টার ও মহেশ চক্রবর্তীর এবং ধনকৃষ্ণ সেনের নাম। রসিকলাল চক্রবর্তী ১৮৮৮ সালে একদল কিশোরকে সঙ্গী করে গড়ে তোলেন—'বালক সংগীত যাত্রা' দল।

বিশ শতকে যাত্রার বিষয়ে এল পরিবর্তন এবং এ পরিবর্তন অবশ্যই সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতিজাত। উনিশ শতকীয় রাধাকৃষ্ণ বা বিদ্যাসুন্দর পালার ধারাটির পাশে এল কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র। ধার্মিক পৌরাণিক পালার বদলে চারপাশের মানুষজনই হয়ে উঠতে লাগল যাত্রার চরিত্র। এ বিষয়ে পথ দেখালেন মুকুন্দদাস। তিনিই স্বদেশিয়ানায় ভরিয়ে তুললেন গ্রামবাংলার যাত্রামঞ্চ। তাঁর প্রথম যাত্রাপালা 'মাতৃপূজা' থেকেই পড়ে গেলেন রাজরোষে। স্বদেশি আন্দোলনের পাশাপাশি অত্যাচারী জমিদার, সুদখোর মহাজন হয়ে উঠল তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য। গানের সঙ্গে

বক্তৃতা মিশে এক নতুন রূপ নিল চারণকবি মুকুন্দদাসের রচনা। মুকুন্দদাসের দেখানো পথ অনুসরণ করলেন মথুর সাহা আর ভূষণ দাস। সমসময় অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ, ধর্মদাস রায়, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখেরা যাত্রাপালায় নতুন ভাবনা ও রূপের প্রকাশ ঘটালেন। এঁদের পাশাপাশি আরেকটি উজ্জ্বল নাম ব্রজেন্দ্রকুমার দে। ব্রজেন্দ্রকুমার প্রথম দিকে অনুসরণ করতেন তাঁর পূর্বসুরী ভোলানাথ রায়কে। যাত্রাপালায় পুরাণের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৪৪ সালে মন্বন্তরের পটভূমিকায় লিখলেন 'আকালের দেশ', এ পালায় ঐক্যবদ্ধ কৃষকশক্তির কাছে হার মানে রাজক্ষমতা। ছেচল্লিশের দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লিখলেন 'শেষ নমাজ' (যে পালা বিখ্যাত হয় 'বাঙালি' নামে), প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে লিখলেন 'ধর্মের বলি', 'গাঁয়ের মেয়ে', 'চাঁদবিবি' এবং ময়মনসিংহ গীতিকার আখ্যান অনুসারে 'সোনাই দিঘি'। সোনাই চরিত্রে জ্যোৎস্না দত্ত-র অভিনয়সূত্রে যাত্রায় প্রথম মহিলা শিল্পীর অংশগ্রহণ। এই যাত্রাপথেই নারীচরিত্রে পুরুষ অভিনেতার দল বিদায় নিল। তাঁর 'নটী বিনোদিনী'তে নামচরিত্রে অভিনয় করতে এসে খ্যাতির শিখরে পৌঁছোলেন বীণা দাশগুপ্তা।

১৯৬১ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে যাত্রা-উৎসব যাত্রার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা, কারণ শহুরে শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল যাত্রাশিল্প, শহরেও বসতে লাগল যাত্রার আসর, আর যাত্রার বিষয়ে ও রূপেও পড়ল নাগরিক প্রভাব। যাত্রাশিল্পে সিনেমা ও থিয়েটারের জনপ্রিয় শিল্পীদের আগমন ঘটতে লাগল। সংবাদপত্র ও অন্যান্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যাত্রা হয়ে উঠল জনপ্রিয়। প্রকরণের ক্ষেত্রে এল সিনেমা ও নাটকের নানা কৌশল। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও যুগের চাহিদাকে প্রয়োগ করলেন পালাকারেরা। এর ফলে মঞ্চে এলেন হিটলার, লেনিন, সুভাষচন্দ্র; এল কৃষক আন্দোলনের কথা, এল ভিয়েতনাম কিংবা সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।

১৯৬৭-র নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমিকায় উৎপল দত্ত জাঁকজমকহীন মঞ্চে নিয়ে এলেন তাঁর পালা 'রাইফেল' ত্রিশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিষয় করে। এরপর 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' এবং 'অরণ্যের ঘুম ভাঙছে' পরাধীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে লিখিত আর মন্বন্তরের পটভূমিকায় বাংলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নিয়ে তাঁর বিখ্যাত পালা 'সন্ন্যাসীর তরবারি'।

ছয়ের দশকে ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি পয়সা' তাঁকে যাত্রা ইতিহাসে স্মরণীয় করে দেয়। শ্রমিক, মিলমালিক, জমিদার, উচ্চ-নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার, শেক্সপিয়র-রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের কবিতার ব্যবহার—সব মিলিয়ে নতুনত্বের ছোঁয়াচ লাগে যাত্রাপালায়। সাতের দশকে তাঁর 'মা মাটি মানুষ' পালায় নায়কের মর্যাদা পেল নিরক্ষর চাষি, পরের পালা 'অচল পয়সা'তেও রয়েছে গ্রামজীবনের ছবি।

সাতের দশকের শেষের দিকে এলেন শম্ভুনাথ বাগ। তাঁর পালায় একদিকে যেমন আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব, আর্যদের ক্ষমতালিপ্সা ও অত্যাচারের ছবি, অন্যদিকে রুশ-জার্মান লড়াইয়ের পটভূমিকায় 'হিটলার', আবার কখনও 'মহেঞ্জোদাড়ো' কখনও বা 'লেনিন', পাশাপাশি 'রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা', জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে 'জ্বালা' তাঁর বিখ্যাত পালা।

এইভাবেই যাত্রাশিল্প বারবার বাঁক নিয়েছে বিষয়ে আর প্রকরণে। নিখাদ গ্রামীণ যাত্রার রূপটি আজ বর্ণবহুল আর ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তবে এই গৌরব কতটা নিজস্ব আর কতটা ধার করা, মেকি তা আলোচনার বিষয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর খেদোক্তি তাই স্মরণীয়, 'যাত্রার দুর্ভাগ্য বাংলা থিয়েটার আজকালকার যাত্রাকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করেছে।' অবশ্য এই পরিবর্তন সর্বস্তরেই, শুধু যাত্রাকে আলাদা করে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তবে এ কথা ঠিক যে জ্যোতিভূষণ চাকীর 'যাত্রা হবে রাতে' কবিতাটির ছবি আজ আর সহজপ্রাপ্য নয় :

শুনছ কি গো চণ্ডীতলা যাত্রা হবে রাতে,
ছেলের দল মেরাপ বাঁধে হাত মিলিয়ে হাতে।
বাক্স প্যাঁটরা বাদ্য ভাণ্ড একখানে সব পড়ে
নটের দল নতুন গাঁয়ে এদিক ওদিক ঘোরে।
কেউ করছে সিঁথি পাটি, কেউ চিবুচ্ছে আঁক।
কেউ বা গেছে পুকুরঘাটে, কেউ করছে পাক।
অধিকারী টানছে হুঁকো মাঝে মধ্যে কাসি,
হঠাৎ শুনি হা-হা-হা-হা মইষাসুরের হাসি।
মাচার ওপর ছোট্ট দোকান চলছে বিকিকিনি,
রাতের বেলা যাত্রা হবে মহিষমর্দিনী।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা—উপন্যাস ও ছোটোগল্প :

যে-কোনো কালপর্ব বা সময়কে আমরা সমুদ্র এবং তার ঢেউয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। আর সাহিত্যের নানা শাখা সেই ঢেউয়ের উপরে ভাসমান খেয়ার মতো, দোলা খেয়ে অগ্রসর হয়, কখনও পথ হারায়; আবার কখনও সময়ের ঝড়-তুফানকে অতিক্রম করে, নিজের দিশা ঠিক রেখে কালোত্তীর্ণ বেলাভূমিতে চিরদিনের জন্য নোঙর ফেলে। উনিশ শতককে আমরা এমনই এক তরঙ্গে-আকুল সমুদ্র হিসেবে কল্পনা করতে পারি। সেটা ছিল প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এবং পরে ইংরেজ রাজতন্ত্রের আমল। মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থার সঙ্গে নতুন চিন্তাধারার অস্ফুট বিরোধের আভাস যেমন পাওয়া যাচ্ছিল, তেমনই ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি (শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি)—তৎকালীন সমাজ, সামাজিক ভণ্ডামি, ইংরেজ রাজতন্ত্রের অসংগতি, নব্য বাবুদের ব্যক্তিজীবনের মাত্রাহীনতা, কুরুচি, নৃত্য-গীত চর্চা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, নীতিহীনতা, ব্যক্তিজীবনের স্ববিরোধ এসমস্ত কিছুকে সম্বল করে; বাংলা গদ্যসাহিত্যে নকশা জাতীয় লেখালেখির মধ্যে দিয়ে সমাজজীবন এবং মনুষ্যচরিত্রকে তুলে ধরার চেষ্টা করছিল। এগুলিকে আমরা উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত রচনা হিসেবে উল্লেখ করে আমাদের আলোচনা শুরু করতে পারি।

উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত রচনা :

১৮৫২ সালে 'The Last Day of the Week' নামক একটি ইংরাজি আখ্যানের ছায়া অনুসারে হানা ক্যাথেরিন ম্যুলেন্স নামের এক বিদেশিনী বাংলা ভাষা শিখে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' রচনা করেন। এটি একটি খ্রিস্টান পরিবারের ঘটনা। এই রচনাটির ভাষা সাধু হলেও সরস। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি একটি বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে লিখিত আখ্যান। শুধু এর চরিত্রেরা বাঙালি এবং গল্প রচনায় লেখিকার মুন্সিয়ানার কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে 'প্যারীচাঁদ মিত্র' বা 'টেকচাঁদ ঠাকুর'-এর ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল' হল প্রথম মৌলিক রচনা, যেখানে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে গল্প পরিবেশন করার চেষ্টা করা হল। এটির ভাষা সাধু হলেও তুলনায় সহজ ও বোধগম্য। তিনি তদ্ভব ও দেশি শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী থাকায় গদ্যের মধ্যে প্রাণসঞ্চার হল। 'রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে, বলদেরা গোরু লইয়া চলিয়াছে—ধোপার গাধা থপাস থপাস করিয়া যাইতেছে'—এর থেকেই বোঝা যায় তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যকে চলতি কথ্য বুলির কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর 'মদ খাওয়া বড়ো দায়, জাত রাখার কি উপায়' নামক বইটির

উপদেশমূলক কাহিনিতে ছোটোগল্পের অস্ফুট সম্ভাবনাও শোনা যায়। আর প্যারীচাঁদের এই ধারারই সার্থক উত্তরসূরী হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্রবন্ধ পর্যায়ভুক্ত তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬১-৬২ সাল) চলিতে লেখা 'শীত কালের রাত্তির শীগ্‌গির যায় না, অ্যাক ঘুম, দুঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ অ্যাক ঘুম হয়;'—এখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহার, উচ্চারণরীতি—এ সবেতেই চলিত বাংলার প্রাঞ্জল ও পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটল। 'সামাজিক ছবি আর ব্যক্তি বিশেষকে বিদ্রূপ, দুই নিয়ে হুতোমের নক্‌শা'[৫]—এরসঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখায় যেমন বাস্তবতা, কাহিনিগুণ, প্রাণবন্ত ভাষা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্ট হল, ঠিক তেমনই হুতোম আনলেন শালীনতা, চিত্রময়তা এবং বাঙালিয়ানা। এই সময়েই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭ সাল) ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দূরাকাঙ্ক্ষর বৃথাভ্রমণ' (১৮৫৬ সাল) বই দুটিতে ইতিহাসকে আশ্রয় করে কাল্পনিক কাহিনির বিস্তারে, উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত আরও দুটি রচনা প্রকাশিত হল।

এখন পরবর্তী বিষয়ে যাওয়ার আগে খুব সংক্ষেপে উপন্যাস ও ছোটোগল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটুকু স্পষ্ট করে জেনে নেওয়া যাক। উপন্যাস মূলত গদ্যে রচিত হয়, বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে; ব্যক্তিমানুষের মনের বিভিন্ন স্তর এবং স্বাতন্ত্র্যের উন্মোচনের মাধ্যমে নিজের প্রতিপাদ্যে পৌঁছায়। অন্যদিকে ছোটোগল্প সংহত আয়তনের মধ্যে জীবনের কোনো এক খণ্ড মুহূর্তকে তুলে ধরে। তার প্রতিপাদ্য নেই, নগ্ন জীবনজিজ্ঞাসা আছে। এখানে বলা দরকার, উপন্যাস সাহিত্যের বিকাশের ফলেই ছোটোগল্পের আবির্ভাব হয়। বিদেশি সাহিত্যেও তাই ঘটেছে, আর বিদেশি সাহিত্যের আদলে বাংলাতেও তাই ঘটেছে। তবে পরবর্তীকালে উপন্যাস ও ছোটোগল্পে বহু পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে, তাদের মধ্যেও অনেক বদল ঘটেছে। সে বিষয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই এবং আমরা এখন যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, সেই স্তরের জন্য এই স্বচ্ছ প্রাথমিক ধারণাটুকুই আবশ্যিক।

সুতরাং, উপন্যাসের সেই জন্ম-লগ্নে ম্যুলেন্সের পারিবারিক আখ্যান, প্যারীচাঁদের আলাল, তারও আগে ভবানীচরণের নকশাজাতীয় লেখা, হুতোমের নকশা, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ইতিহাসাশ্রিত কাহিনি বিভিন্নভাবে বাংলা সৃষ্টশীল গদ্য তথা উপন্যাসের পটভূমি প্রস্তুত করেছিল। বিশেষত, প্যারীচাঁদ ও হুতোমি গদ্যের বিদ্রূপাত্মক ছাঁদ অনেক পরবর্তীকালের বাংলা গদ্যকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এই পটভূমিকার সফল ও সামগ্রিক বিকাশ ঘটল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়, তিনিই বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা। বাংলা উপন্যাসের শাপমুক্তি ঘটল তাঁর হাতে।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সমসাময়িক বাংলা উপন্যাস :

পাশ্চাত্য তথা ইংরাজি সাহিত্যের অনুরাগী বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে স্যার ওয়াল্টার স্কট, চার্লস ডিকেন্স প্রমুখের লেখা পাঠ করেছিলেন। এছাড়াও পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাস-লক্ষণাক্রান্ত রচনার সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের গঠনকৌশল, চরিত্র নির্মাণ, ঘটনাপরম্পরা এবং জীবনবোধের বিশিষ্টতায়, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মৌলিক এবং বাহ্যিক প্রভাবমুক্ত। তাই ১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালির চিত্তমুক্তি ঘটল। এমন লেখা তৎকালের বাঙালি আগে পড়েননি। যে বিশুদ্ধ রোমান্সের সৃষ্টি হল জগৎসিংহ-আয়েষা-তিলোত্তমার প্রণয়কাহিনিকে কেন্দ্র করে তা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি। এর ঠিক পরের বছর ১৮৬৬ সালে তিনি লিখলেন 'কপালকুণ্ডলা'। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের যাবতীয় ত্রুটি ও জড়তাকে অতিক্রম করে লেখক বঙ্কিম কল্পনাশক্তির অনন্যতায় এবং রচনাশৈলীর নৈপুণ্যে বাংলা সাহিত্যের এক চিরস্থায়ী কীর্তির জন্ম

দিলেন। প্রকৃতিকন্যা কপালকুণ্ডলার সঙ্গে পথভ্রষ্ট নবকুমারের গভীর জঙ্গলে সাক্ষাৎ, নবকুমারের প্রণয়, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, নিয়তিনির্দিষ্ট মৃত্যু পরিণামের ট্র্যাজিক প্রকাশ এক আশ্চর্য নাটকীয় চমৎকারিত্ব এবং কবিত্বশক্তির সংশ্লেষে প্রকাশিত হল। মনুষ্যজীবন ও মনুষ্যপ্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্যভাগ্যের অন্তর্লীন বিরোধ-টানাপোড়েনের ফসল কপালকুণ্ডলা; লেখকের এক অনন্য সৃষ্টি। এইভাবে ঔপন্যাসিক বঙ্কিম কোনো একটি ঐতিহাসিক সময়ের পটভূমিতে বিভিন্ন উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের প্রতিস্থাপিত করে কল্পনা ও রোমান্সের সংমিশ্রণে একে একে 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'সীতারাম' প্রভৃতি ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসগুলি লিখে গেছেন। এদের মধ্যে 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ' ও 'সীতারাম' স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম এছাড়াও 'বিষবৃক্ষ', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মতো কয়েকটি বিশিষ্ট সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন। এই উপন্যাসগুলি ভবিষ্যতের বাংলা উপন্যাসের দিক্‌নির্দেশ হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। এই তিনটি উপন্যাসেরই প্রেক্ষিত ছিল সমসাময়িক পারিবারিক জীবন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেও অবৈধ প্রেমসম্পর্কের বিষয় ছিল; কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নরনারীর অবৈধ প্রণয়-কামনা-অসংযত-মানসিক দ্বন্দ্ব-রক্তক্ষরণ-সর্বোপরি ট্র্যাজিক পরিণাম তাঁকে ঔপন্যাসিক সিদ্ধির চূড়ায় নিয়ে যায়। যদিও লেখক বঙ্কিমের আদর্শবাদিতা ও নীতিবোধের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত ছিল। তবে নরনারীর জীবন এবং মনোজগত সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির কারণেই তাঁর সৃষ্ট কুন্দ-গোবিন্দলাল-রোহিণী-নবকুমারদের আবেদন বাঙালি পাঠকের কাছে আজও অমলিন।

পরিশেষে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটির কথা ঐতিহাসিক কারণে আলাদাভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেননা, পরাধীন দেশে বহু তরুণ-যুবক এই উপন্যাসটি পড়েই স্বদেশিকতা এবং জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছিল।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না, উপন্যাসের ভাষা-নির্মাণ এবং সৌন্দর্য্যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসকে যে স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন; তার সমসময়ে কিংবা অল্প কিছুদিন পরেও বাংলা উপন্যাসে তিনিই হয়ে রইলেন অদ্বিতীয়। তবে একথাও ঠিক, এমন কয়েকজন শক্তিশালী লেখক আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁদের সম্পর্কে না জানলে আমাদের আলোচনাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ইতিহাস-আশ্রিত এবং সামাজিক, বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত এই দুই খাতেই বাংলা উপন্যাস প্রবাহিত হল। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়', রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা', হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' এবং 'কাঞ্চন মালা', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'মিবার রাজ' ও 'বিদ্রোহ' আর মীর মশার্‌ফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস হিসেবে রচনাকারদের মৌলিকতায় সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া সামাজিক উপন্যাস হিসেবে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর', যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'শ্রীরাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি লেখাগুলি সুখপাঠ্য এবং উনিশ শতকীয় সমাজজীবন এবং ব্যক্তিমানসের ভাবদ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ।

এখানে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ'-এর কথা আলাদাভাবে বলা উচিত। যদিও এটি উপন্যাস নয়, ভ্রমণ কাহিনি। কিন্তু তাঁর হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ বিষয়ক অতি উপভোগ্য, গদ্য সাহিত্যের একটি পৃথক ধারার সৃষ্টি হয়েছিল।

এই সময়ের গদ্য সাহিত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক কৌতুক গল্পের জন্ম। প্যারীচাঁদ এবং হুতোমের নক্‌শার যে ধারার সূচনা, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের' কয়েকটি রচনায় যার বিস্তার এবং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর লেখনীতে যার পুষ্টি, তাঁদেরই সমসাময়িক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় তার চরম উৎকর্ষ সাধিত হল। তাঁর 'কঙ্কাবতী', 'ফোকলা দিগম্বর' নামক উপন্যাসগুলির বদলে 'ভূত ও মানুষ', 'মুক্তমালা', 'ডমরু রচিত' প্রভৃতি গল্পগুলি আজও আমাদেরকে একইরকম আনন্দ দেয়। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে বাঙালির পুরনো বৈঠকী গল্পের মেজাজ, বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক তাঁকে সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে একদিকে 'হিতবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যদিকে ত্রৈলোক্যনাথ এই দু'জনের হাতেই বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের জন্ম হল। পরবর্তীতে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের মধ্যে যে শিথিলতা ছিল তাকে আরও নিপুণ করলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। একটা পারিবারিক আবহের রূপ দিলেন তিনি। আমাদের চারপাশের বৈসাদৃশ্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে তুললেন বিভিন্ন কৌতুক গল্প। প্রায় সমসময়েই 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা হিসাবে স্বর্ণকুমারী দেবী বাঙালি নারীমনকে কেন্দ্র করে গল্প লিখতে শুরু করলেন। মেয়েদের লেখা বাংলা ছোটোগল্পে তিনিই পুরোধা। তাঁর 'যমুনা', 'গহনা', 'কেন' প্রভৃতি গল্পে মেয়েদের পুরুষকেন্দ্রিক জীবন এবং পারিবারিক অবহেলার নানান বিষাদ-করুণ ছবি ফুটে উঠল। এরপর সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, শান্তা দেবী হয়ে সীতা দেবী পর্যন্ত বারে বারে ব্যর্থপ্রেম, পুরুষের এবং পরিবারে অবহেলার কথা ফিরে ফিরে এসে বাংলা লেখিকাদের ছোটোগল্পকে পুনরাবৃত্তির চোরাবালিতে আটকে রেখেছিল। অনেক পরে, তা থেকে মুক্তি ঘটেছিল আশাপূর্ণা দেবীদের হাতে। বহু লেখকের সমাগমে বাংলা উপন্যাস যেমন লেখা হতে থাকল, তেমনই বাংলা ছোটোগল্পেরও আত্মপ্রকাশ ঘটল। কিন্তু বাংলা উপন্যাস ও গল্পকে এই অগভীর গতানুগতিকতার হাত থেকে মুক্তি দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিংশ শতকের গোড়ায় তিনি বঙ্কিম প্রভাবিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা উপন্যাসের বাঁকবদল ঘটালেন।

ঔপন্যাসিক এবং ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ও সমকাল :

প্রথমদিকে রোমান্স লিখলেও ('রাজর্ষি', 'বউঠাকুরানীর হাট') লেখক রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' প্রকাশিত হল ১৯০৩ সালে। এই উপন্যাসের নায়িকা বিনোদিনী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে তার জৈবনিক প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে তিনি যে নিরাসক্তি ও বাস্তববাদিতার পরিচয় দিলেন তা বাংলা উপন্যাসকে বঙ্কিমপ্রভাব মুক্ত করে বিশ শতকীয় 'চোখের বালি' কে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। কিন্তু 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাস থেকে শুর হল আরেক নতুন অধ্যায়। সমাজ-পরিবার-ব্যক্তির আন্তরসম্পর্ককে তিনি স্বদেশের মহাকাব্যিক পটভূমিকায় প্রতিস্থাপিত করে রাজনীতি, সমাজ সংস্কার এবং স্বাদেশিকতা প্রসঙ্গে উপন্যাসের আঙ্গিকে ব্যক্তির

ভূমিকা ও অবস্থান অনুসন্ধানে রত হলেন। সেই সময়ের (বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী বাংলা) উত্তাল সমাজ-রাজনৈতিক আবহে পরবর্তীকালে একে একে 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়'-এর মতো উপন্যাসেও সমাজ ও দেশের নিরিখে ব্যক্তির আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আত্মানুসন্ধানে ব্যপৃত থেকেছেন। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের উত্তর পর্বের উপন্যাসগুলিতে তত্ত্বচিন্তা, মননশীলতা, আধ্যাত্মিকতা, ইঙ্গিতময়তা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখনীকে বিশেষ বৈচিত্র্য দিয়েছিল; এর সঙ্গে কবিতা আত্মকথা প্রভৃতি ধরনের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুন শৈলীর। 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ' প্রভৃতি উপন্যাসের পরে 'শেষের কবিতা'য় গদ্য-পদ্যের এক বিস্ময়কর মেলবন্ধন ঘটিয়ে মানবীয় প্রেম-সম্পর্ককে তিনি এক অতুলনীয় ঐশ্বর্য দিলেন। তাই বলা যেতে পারে, রবীন্দ্র উপন্যাসধারা বাংলা উপন্যাসকে দিল আধুনিক মনোভঙ্গি, ভাষার ঐশ্বর্য এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিচিত্র সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলার বলিষ্ঠ সাহস।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে আগেই ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছি। ১৮৯১ সালে 'হিতবাদী' পত্রিকায় গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর আরম্ভ, ১৯৪০ সালে 'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্প দিয়ে তাঁর যাত্রাপথের সমাপ্তি। এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে তিনি বিচিত্র বিষয়ে অজস্র গল্প লিখেছিলেন। সেখানে 'কঙ্কাল', 'শাস্তি', 'পোস্টমাস্টার', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি'-র মতো গল্প যেমন আছে, তেমনই 'স্ত্রীর পত্র' কিংবা 'ল্যাবরেটরী'র মতো লেখাও আছে। এখানে বলা প্রয়োজন রবীন্দ্র উপন্যাসের জগতের থেকে রবীন্দ্র ছোটোগল্পের জগৎ আলাদা। সেখানে বোবা মেয়ে, নি:সঙ্গ পোস্টমাস্টার, অশিক্ষিত গ্রাম্য বধূ, নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে উন্মাদ মেহের আলি, মৃত্যুঞ্জয় মুদি, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ইঞ্জিনিয়ারের মতো কতো ধরনের মানুষের আনাগোনা। তাদের রহস্যময় মন, মনের জটিলতা আর গ্রাম-বাংলার পল্লী প্রকৃতির অপার ঐশ্বর্য। এই সবকিছুর আশ্চর্য রসায়নে তাঁর প্রথমদিকের প্রায় প্রতিটি গল্পের রস ও স্বাদ অভিনব এবং পরস্পরের থেকে আলাদা। পরে 'হালদার গোষ্ঠী', 'স্ত্রীর পত্র', 'রবিবার' 'ল্যাবরেটরী'র মতো মনন-প্রধান গল্পে তিনি আধুনিক মানব জীবনের সমস্যা আর মানুষের অন্তর্মনের জটিলতার প্রতি আলোকপাত করেছেন। তাই সামগ্রিক বিচারে একথা বলাই যায় তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার স্পর্শে বাংলা ছোটোগল্প আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়েছিল। মানব হৃদয়ের গভীরতাকে তিনি যে অনায়াস দক্ষতায় স্পর্শ করেছিলেন, তাতে তাঁকে বিশ্বের যে কোনো শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্পকারের সঙ্গে একাসনে বসানো যায়।

রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত, বাংলায় বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক গল্পের যে ধারা ত্রৈলোক্যনাথের হাতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, তা প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে সার্থকতা লাভ করল। তিনি 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদীপ', 'মনের মানুষ', 'আরতি'-র মতো বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখলেও; তার প্রকৃত সাফল্য লুকিয়ে ছোটোগল্পে। 'দেবী', 'আদরিণী'র মতো অসাধারণ ভাবগভীর গল্প লিখলেও তাঁর 'বলবান জামাতা', 'মাস্টার মহাশয়', 'রসময়ীর রসিকতা'র মতো কৌতুক কাহিনিগুলি সহজ, মার্জিত এবং নির্মল হাস্যরসে ভরা। এই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে গেলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌতুক-ব্যঙ্গের সমাহারে বহুধা বিচিত্র গল্প লিখলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার,

দেবেন্দ্রনাথ বসুরা। আর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ব্যঙ্গ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শাণিত কৌতুক-কটাক্ষের পরিচয় পাওয়া গেল প্রমথ চৌধুরীর নীললোহিত সম্পর্কে লেখা গল্পগুলিতে।

আর অন্যদিকে উপন্যাসে রবীন্দ্র-বঙ্কিম প্রবর্তিত পথের অক্ষম-তরলীকৃত অনুকরণে প্রচেষ্টা দেখা গেল, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, নিরুপমা দেবী, অনুরূপ দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের উপন্যাসে। একমাত্র পরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'অভয়ের বিয়ে', 'শুভ্রা' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি ছিল মৌলিক ও ব্যতিক্রমী। এই সময়কালেই বাংলা উপন্যাসে এক সম্পূর্ণ নতুন সামাজিক অভিঘাত সৃষ্টি করলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যসাহিত্য ও সমকালীন উপন্যাস-ছোটোগল্প :

রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-আত্মজিজ্ঞাসা আর সমাজ ও স্বদেশ ভাবনার আদর্শ, গড়পড়তা বাঙালি পাঠকের মন স্পর্শ করতে পারছিল না। এছাড়া অন্য কারো পক্ষে তাঁকে অতিক্রম করে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। ঠিক সেই সময় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী বাঙালি মনকে জয় করল। তাঁর লেখায় সমাজ অননুমোদিত প্রেম আর সামাজিক গোঁড়ামির প্রতি তীব্র কটাক্ষ নতুনরীতিতে প্রতিফলিত হল।

বাংলা উপন্যাসকে এক নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস। লেখক শরৎচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল এই লেখা। এর ঠিক দশ বছর পরে 'বড়দিদি' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ। এরপর তিনি একে একে 'বিরাজ বউ', 'বিন্দুর ছেলে', 'পল্লিসমাজ', 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন', 'বামুনের মেয়ে', 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা', 'পথের দাবী' থেকে 'বিপ্রদাস' পর্যন্ত নানা ধরনের তিরিশটি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারী চরিত্রগুলি মাতৃত্বময়ী। বাঙালি পরিবারের কেন্দ্রে আসীন যে নারী শতদহন সহ্য করেও সমস্ত কিছু ধারণ করে রাখে, শরৎচন্দ্র বাঙালির মনোভূমির সেই নারীকেই বার বার আবিষ্কার করেছেন। এক্ষেত্রে অচলা, ষোড়শী, কিরণময়ীরা বিক্ষিপ্ত ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য হতে পারে। আর শরৎচন্দ্রের পুরুষ চরিত্রেরা উদাসীন, সৃষ্টিছাড়া, স্নেহের কাঙাল এবং নিজ পৌরুষের পরিবর্তে পরের উপর নির্ভরশীল। যার সঙ্গে খাঁটি বাঙালির পুরুষের সামঞ্জস্যও অনস্বীকার্য। তিনি একদিকে স্বার্থপর, কূট মানুষদের সঙ্গে সরল, উদার, প্রাণময় ও পরোপকারী লোকেদের সংমিশ্রণে যে গ্রামীণ জীবনের ছবি আঁকলেন তাও বাংলার গ্রামজীবনের কাছাকাছি। এই ছবি আঁকতে গিয়ে গ্রামের অপমান, অত্যাচার, স্বার্থপরতা, জমিদারতন্ত্রের শোষণকে তিনি যেমন বেআব্রু করলেন, তেমনই অসহায়, নিষ্পেষিত মানুষের প্রতি তাঁর অশ্রুসজল মমত্ব, সহানুভূতি ও গভীর ভালোবাসার বোধ তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলল। তাই যে বাঙালি বুক দিয়ে 'বঙ্গভঙ্গ' রোধ করল, সে শরৎবাবুর উপন্যাসে খুঁজে পেল শতছিদ্র যৌথ সংসারের অক্ষুণ্ণ অটুট অবস্থা। তাঁর উপন্যাসেই প্রথম চাষা, চাকর, মিস্ত্রি, নায়েব, স্ত্রীলোক তাঁদের সত্যিকারের ভাষায় কথা বলে উঠল। এই জীবন্ত ভাষা উপন্যাসকে দিল গতিশীলতা ও আবেগ। এই প্রাঞ্জল গদ্যরীতি এবং মমতায় আচ্ছন্ন জীবনবোধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তীতে পরিণত করেছিল। এমন জনপ্রিয়তা আর কোনও বাঙালি গদ্যলেখকের কপালে জোটেনি।

ছোটোগল্পকার শরৎচন্দ্রের মধ্যেও আমরা এই একই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ দেখি। তাঁর 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'লালু' প্রভৃতি গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সংযোজন। এখানেও গ্রামের অসহায়, নিরন্ন, প্রান্তিক মানুষের দুর্দশা ও লাঞ্ছনাকে তিনি গভীর মমতা সহকারে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানবিক অনুভূতিকে সহজেই প্রকাশ করার এক আশ্চর্য দক্ষতা ছিল তাঁর সহজাত। আর এ প্রসঙ্গে তাঁর রসবোধ অনুভূতিকে সহজেই প্রকাশ করার এক আশ্চর্য দক্ষতা ছিল তাঁর সহজাত। আর এ প্রসঙ্গে তাঁর রসবোধ ও হিউমার সেন্সের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করতেই হয়, শ্রীকান্ত থেকে লালুর গল্পে এবং বিভিন্ন লেখায় তা ছড়িয়ে আছে, যা শরৎসাহিত্যকে এক অতুলনীয় বিশিষ্টতা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত কারণেই শরৎচন্দ্র উপন্যাস ও গল্পকে আপামর মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রাণের সম্পদে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের পরে আমরা আবার উপন্যাসের বাঁকবদল ঘটতে দেখব বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে। কিন্তু তার আগে ওই পর্বের দুজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের (রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র) দুজন নায়ককে আমরা পেলাম। অমিত রায় (শেষের কবিতা) ও শ্রীকান্ত। শ্রীকান্ত ভবঘুরে আর অমিতের মধ্যেও বাউন্ডুলেপনা আছে। তারা দুজনেই 'বাঙালি মধ্যবিত্তের পতনের যুগের নায়ক'[৬]। প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীনতাকামী বাঙালি নানাভাবে প্রতিবাদ করেছে, পাল্টাতে চেয়েছে, কিন্তু দেশ ও সমাজের ক্রমক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় তারা আরও জর্জরিত হয়েছে। অমিত ও শ্রীকান্তের ভাষ্যে কোথাও একটা এই একাকীত্ব এবং ব্যর্থতার বোধ উঁকি দিয়ে যায়। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি' উপন্যাস, সাবলীলভাবে এই ব্যর্থতার গ্লানিকে অতিক্রম করে যায়, অপু-দুর্গা নামক দুটি বালক-বালিকার বড়ো হয়ে ওঠায়, তাদের বেঁচে থাকায়; এবং জীবনের প্রতি মৌলিক কৌতূহলে।

বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপন্যাস ও ছোটোগল্প :

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি' বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। অপু-দুর্গা-সর্বজয়া-হরিহর-ইন্দির ঠাকরুনদের নিয়ে গড়া এই উপন্যাসের জগৎ এক মানবীয় সমগ্রতায় পূর্ণ। এরপর তিনি 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'কিন্নরদল' প্রভৃতি উপন্যাস লিখেছেন। বিভূতিভূষণের লেখায় প্রকৃতি ও মানুষ কখনও অচ্ছেদ্য, কখনও প্রকৃতিরই সম্প্রসারণ। তাঁর উপন্যাসে সহজ, সাধারণ, অন্ত্যজ মানুষের ভিড়। তিনি কোথাও যেন তাদের গড়ে তোলার চেষ্টা করেন না। জীবনের স্বত:স্ফূর্ত ছন্দেই তারা এমন রূপ লাভ করে। অন্যদিকে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার জগৎ মহাকাব্যিক বিপুলতায় গড়া। শ্রেণির, নানা গোত্রের, নানা স্বভাবের মানুষ সেখানে ভিড় করে। বোষ্টম-বোষ্টমী, খুনী, আসামী, বেদে, কামার, রাঢ় বাংলার বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় তাঁর লেখার উপাদানে পরিণত হয়। এইসঙ্গে বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীরভূমের ভূপ্রকৃতি এবং ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের পরিবর্তমান ইতিহাসও যেন তারাশঙ্করের সাহিত্যে একটি চরিত্র হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। তাঁর 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনি', 'কবি', 'পঞ্চগ্রাম', 'সন্দীপন', 'পাঠশালা' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে এবং অজস্র ছোটোগল্পে কোনও ব্যক্তি মানুষ বা সম্প্রদায় বা সমাজের নিরিখে,

পটবদলের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি ও ইতিহাসের রূপান্তরকে খনন করে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন। আবার লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট সাহিত্যে স্পষ্ট দুটি পৃথক অধ্যায় পরিলক্ষিত হয়। প্রথম জীবনে মানবমনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মসমীক্ষা এবং দ্বিতীয় পর্বে কমিউনিস্ট দলের সদস্য পদ নেওয়ার পরে মার্কসীয় ভাবদর্শের নিরিখে বিপ্লবী রোমান্টিক দৃষ্টি ও জিজ্ঞাসা। 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'অহিংসা', 'চতুষ্কোণ', 'চিহ্ন', 'আরোগ্য' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি হল এই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের ফসল। পুরুষ ও নারীর প্রবৃত্তি, মনোবিকার, রক্ত-মাংসের উত্তাপ, মানসিক অসঙ্গতি, যৌনতা, মতাদর্শ, রোম্যান্টিকতা এই সব বিষয়কে তাঁর চরিত্রেরা কখনও সংঘর্ষের মাধ্যমে আবার কখনও বিশ্লেষণের সাহায্যে যেন স্পর্শ করতে চায়। ভারত ইতিহাসের পর্বান্তর ও পরিবর্তমান মূল্যবোধকে তুলে ধরার পেছনে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সদাসচেষ্ট ছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন বিষয় বা আঙ্গিকের দিক থেকে না হলেও তাঁর অসামান্য গদ্যশৈলীর গুণে তিনি পরবর্তীকালের বাংলা ঔপন্যাসিকদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন।

আবার এই কালপর্বেই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহনা', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' এবং গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন'-এর (ত্রিদিবা) মতো উপন্যাসে ব্যক্তি মানুষের নিজেকে খুঁজে ফেরার যে নিরলস অনি:শেষ প্রয়াস; ব্যক্তিমনের চৈতন্যস্রোত, নব নব শিল্পমাত্রা নিয়ে প্রকাশিত হল। এরপর চারের দশকে ঔপন্যাসিক কৃতিত্বে সতীনাথ ভাদুড়ির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। 'জাগরী'র মতো রাজনৈতিক উপন্যাসে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ভারতের রাজনৈতিক চালচিত্রে একটি পরিবারের কাহিনি পরিস্ফুট হয়েছে। আর তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে ঢোঁড়াইয়ের মতো অন্ত্যজ শ্রমজীবী মানুষের জীবন, সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস, আচার, পৌরাণিকতা সমেত ভারতীয় বাস্তবতার এক বিরাট পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা এক মহাকাব্যিক নায়কের সন্ধান পাই। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে নানা ঘটনার ঘাত প্রতিধাতে সংঘর্ষরত ঢোঁড়াই যেমন নিজেকে আবিষ্কার করে, তেমনই নিজেকে আবিষ্কার করার ফলে সে বাইরের স্বরূপটাকেও খুঁজে পায়।

আর আমাদের আলোচিত এই পর্বে বাংলা ছোটোগল্প বিপুল সম্ভাবনার বহুমাত্রিক পথে প্রবাহিত হল। বাংলা কৌতুক গল্পের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল ত্রৈলোক্যনাথের হাতে, বহুস্তর অতিক্রম করে তা আরও বিশিষ্ট ও মার্জিত হয়ে দেখা দিল পরশুরাম বা রাজশেখর বসুর লেখায়। তাঁর 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'ধুস্তরী মায়া' প্রভৃতি গল্প সঙ্কলনগুলিতে দার্শনিকতা, যুক্তিবাদ এবং বুদ্ধিদীপ্ত তির্যক কটাক্ষে সংমিশ্রণ তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। এরপর এই নাগরিক মার্জিত কৌতুক নানাভাবে পল্লবিত হল রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বনফুল, সজনীকান্ত দাশ, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখের লেখায়। 'রানুর' ঘরোয়া গল্পকে কেন্দ্র করে নির্মল হাস্যরসের জোগান দিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য উত্তরসূরী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সূক্ষ্ম কৌতুক ও বৈদগ্ধ্যে আসর মাতালেন পরিমল গোস্বামী, সৈয়দ মুজতবা আলি। পরবর্তীতে গৌরকিশোর ঘোষ, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখেরা কথার কারসাজিতে রস-ব্যঙ্গ সৃষ্টির বিচিত্র পন্থায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন।

অন্যদিকে গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর 'পঞ্চশর', 'বেনামী বন্দর', 'মৃত্তিকা' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে, চরিত্রনির্মাণে, সূক্ষ্মতায় এবং গূঢ় সাঙ্কেতিকতায় অনবদ্য। জীবনের বিষাদময়তাকে তিনি আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় তুলে ধরেন। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্তরা মানুষের অন্তর্মনের যৌনতা, ক্রূরতা, লোভ, কামনা বাসনা প্রভৃতি জৈবিক শক্তির ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে মানব জীবনের নিয়তি ও অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রণ দেখিয়ে পাঠককে বিমূঢ় করেছেন। তাঁদের 'অতসী মামী', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'অসাধু সিদ্ধার্থ', 'গতিহারা জাহ্নবী' প্রভৃতি গল্পগুলিতে আমরা এসবরেই প্রতিফলন দেখি। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের গল্প মতাদর্শগত কারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক', 'ফসিল' প্রভৃতি গল্পগুলিতেও আমরা জীবনের আপাত-সুন্দর রূপের ভেতরেও যে কদর্য-কুশ্রীতা ও পাপ প্রচ্ছন্ন থাকে তা আবিষ্কৃত হতে দেখি। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর লেখালিখি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল।

এছাড়া বিষয়ের অভিনবত্বে এবং লেখনীর গুণে যাঁরা সে সময় বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়ে নানা ধরনের উপন্যাস ও গল্প লিখে বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, বনফুল এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনোজ বসুর লেখায় দরদ ও গল্প বলার ধরন (যেমন—'বনমর্মর', 'নরবাঁধ', 'নিশিকুটুম্ব' প্রভৃতি), বনফুলের গল্পের নাটকীয়তা-বিষয় ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য (যেমন—'ডানা', 'স্থাবর' প্রভৃতি), প্রবোধকুমার সান্যালের ভ্রমণ-বিষয়ক লেখা (যেমন—'মহাপ্রস্থানের পথে' 'দূরাশার ডাক' প্রভৃতি) এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসের আশ্চর্য ঐতিহাসিক আবহ তৈরির দক্ষতা, চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা (যেমন—'তুঙ্গভদ্রার তীরে', 'গৌড়মল্লার', 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' প্রভৃতি) আর অসাধারণ গোয়েন্দাকাহিনি লেখার সাফল্য 'চিড়িয়াখানা', 'মাকড়সার রস' প্রভৃতি), তাঁদের বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন দিয়েছে।

এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা বাংলা উপন্যাসের প্রায় এক শতকের পরিক্রমণ ও বিস্তার লক্ষ করলাম। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' দিয়ে যে ধারার সূত্রপাত, পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সিদ্ধি ও সম্পূর্ণতা দিলেন। বাংলা উপন্যাসের জয়যাত্রা সূচিত হল। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের হাত ধরে এবং অন্যান্য প্রতিভাবান লেখকদের চিন্তাস্পর্শে গল্প-উপন্যাস ক্রমশ মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রাণের বস্তু হয়ে উঠল। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে এসে বাঙালির সমাজ-রাজনৈতিক অবস্থানও বদলাতে আরম্ভ করল। বাংলা ছোটোগল্পও চেষ্টা করল এই ধীর পরিবর্তমান ইতিহাসকে টুকরো টুকরো ভাবে মেলে ধরতে। প্রান্তিক, অন্ত্যজ মানুষের সমাজ-জীবন সংস্কৃতিও প্রতিবিম্বিত হতে শুরু করল এই আবর্তে। সুতরাং বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নে কিছু পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও তা আত্মজিজ্ঞাসায়, সমাজভাবনায়, স্থানিক বিশেষত্বে, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে, বহুরূপতায় ও দর্শনে হয়ে উঠল মৌলিক এবং আন্তর্জাতিক। গ্রাম-শহর-নদী-জঙ্গল এমনকী প্রকৃতিপ্রান্তের মানবজীবন, মানবীয় সম্পর্ক সর্বোপরি জীবন্ত মানুষের সামগ্রিকতাকে বাংলা উপন্যাস চাইল আত্মসাৎ করতে।

স্বাধীনতা এবং পরবর্তীকালের উপন্যাস-ছোটোগল্পের গতিপ্রকৃতি :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং দেশভাগের রক্তপঙ্কিল পথে এল ভারতের স্বাধীনতা। মূল্যবোধের অধ:পতন এবং অবক্ষয়ের অভিঘাতে বাংলা উপন্যাসের স্বাভাবিক বিকাশ ও গতিশীলতা রুদ্ধ হল। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত'-এর মতো আলগা চটকদারিত্বে ভরা কিছু উপন্যাস লেখা হল। আর প্রমথনাথ বিশীর 'লালকেল্লা', বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর ধারায় ইতিহাসের চিহ্ন লক্ষণযুক্ত অতীতাশ্রয়ী উপন্যাস লেখার একটা ঘরানা তৈরি হল। এসময় আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' কিছুটা তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর লেখায় শৈলবালা ঘোষ জায়া, শান্তা দেবী, সীতা দেবী কিংবা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীদের লেখালেখির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা সময়ের পদচিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল। কেননা সেখানে ব্যক্তির সঙ্গে প্রেক্ষাপটের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মিলন গড়ে তোলায় লেখিকা মুন্সিয়ানা দেখালেন। পরে লেখা 'সুবর্ণলতা' এবং 'বকুলকথা' উপন্যাস সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। দৃষ্টিভঙ্গির এই স্বাতন্ত্র্যের সার্থক উত্তরাধিকার ভিন্নভাবে প্রকাশিত হল আরও পরে লীলা মজুমদার ও প্রতিভা বসুর লেখায়। শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের পরিবারকেন্দ্রিক কাহিনি লিখলেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'তিথিডোর' উপন্যাসে। কিন্তু সমকালীন সময়ের অভিঘাতে, ধ্বস্ত জীবনের অসহায়তা ব্যক্ত হয়ে উঠল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর প্রমুখের লেখায়। বাঙালি কি চিরতরে হারিয়ে ফেলল তা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন'-এ সর্বকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে রইল। রমেশচন্দ্র সেন এর 'কুরপালা' উপন্যাসে দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর লড়াইয়ের ছবি জীবনের ছন্দকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করল। সমরেশ বসু তাঁর ছোটোগল্পে গঙ্গার পাড় থেকে ধুলোকাদা মাখা ঘিঞ্জি খাপড়ার চালওলা বস্তিকে তুলে এনে দেখালেন মানুষের সংকট এবং জীবনসত্যের অপরিবর্তনীয়তা। 'আদাব' গল্পে অমানবিক অবস্থা ও পরিবেশেও মানবিকতার কাহিনি বিবৃত হল। অসীম রায় তাঁর 'গোপাল দেব', 'দ্বিতীয় জন্ম' প্রভৃতি উপন্যাসে অননুকরণীয় গদ্যে ফুটিয়ে তুললেন অস্তিত্বের সংকট, অর্থহীনতা, এবং আপাত তাৎপর্যহীন জীবনকে সমগ্রে বুঝে নেওয়ার তাৎপর্য। মধ্যবিত্ত মনের বিচ্ছিন্নতা, সংকট আর মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের অবনমন নানা ভাবে ও রূপে প্রকাশিত হল সন্তোষ কুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শিলালিপি', সমরেশ বসুর 'শ্রীমতি কাফে', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল' উপন্যাসে। এঁদের ছোটোগল্পেও বিচিত্র কাহিনির মোড়কে এই টানাপোড়েন ফিরে ফিরে ধরা দিল। এ বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেডমাস্টার', 'পালঙ্ক', 'পতাকা', নবেন্দু ঘোষের 'কল্কি', 'ত্রাণকর্তা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু', 'তিতির' প্রভৃতি গল্পের নাম করা যায়। আবার এই সময়েই তিতাসের ঢেউয়ের মতো ধীর আলগা স্রোতে মালো পাড়ার জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর সঙ্গে অন্তর্লীন জীবিকার ছবিকে কাব্যের স্তরে পৌঁছে দিলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' ও অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' নদীকেন্দ্রিক শ্রমজীবী মানুষের আখ্যান হলেও তা কখনই 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। সমরেশ বসুর প্রথম পর্বের লেখায় মানুষ-প্রকৃতি-সমাজের পারস্পরিক টানাপোড়েন মুখ্য বিষয় ছিল, কিন্তু পরের দিকে তিনি যখন মানুষের ব্যক্তিক সংকট, আত্মসমীক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন তখন তাঁর উপন্যাস হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ,

তীব্র ও গভীর। এ প্রসঙ্গে 'স্বীকারোক্তি', 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসের কথা বলা যায়। এছাড়া এই সময়ের কথার উপসংহার টানতে হলে কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা', 'অনিলা সুন্দরী', 'তাহাদের কথা' প্রভৃতি উপন্যাসের চিত্রকাব্যময় গদ্যভাষা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার বৈচিত্র্য ও সমাজ সচেতনতা এবং আশাপূর্ণা দেবীর 'কার্বন কপি', 'জয়', 'মলাটের মুখ', 'ঘুষ', 'মাথা ধরা' প্রভৃতি গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবার জীবনের পরিবেশ, সমস্যা এবং নির্মম সত্য যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেকথা আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয়। এরপরই একে একে মহাশ্বেতা দেবী, মতি নন্দী, কবিতা সিংহ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের মতো একদল তরুণ লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিত্বমূলক লেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও কিছুকাল।

বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়দের পরে সম্পূর্ণ পৃথক ও নতুন রীতির গল্প-উপন্যাস লেখার কাঠিন্য, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাস ও গল্পে এক সাময়িক বন্ধ্যাত্ব ও নতুনত্বের অভাব সৃষ্টি করেছিল (অসীম রায়ের মতো কয়েকজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রমের কথা আলাদা)। তবে বিচিত্রকর্মা, অনুসন্ধিৎসু এবং বলিষ্ঠ লেখকদের স্বতন্ত্র পথ খোঁজার নিরন্তর প্রয়াসে তা দূর হল। ক্রমে বাংলা গল্প-উপন্যাস আবার শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করল জীবনের দ্বন্দ্ব-অবক্ষয়-সংকটকে পরিবর্তমান সময়ের নতুন জল-মাটিতে পুনরাবিষ্কারের মধ্য দিয়ে।

শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রসঙ্গে :

পৃথিবীর যে-কোনো ভাষাতেই প্রাথমিকভাবে নীতিশিক্ষামূলক ছোটো ছোটো লেখা দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন মিটত। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিদ্যালয়ে যখন বাংলা ভাষার পঠন পাঠন শুরু হল, তখন কীভাবে তা পড়ানো হবে এটিই ছিল প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অক্ষর পরিচয়ের জন্য 'বর্ণপরিচয়' এবং সদ্য পড়তে শেখা পড়ুয়ার দ্রুত পঠনের জন্য 'কথামালা', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'বোধোদয়'—প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক লিখলেন। একই সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা', অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকের নাম। তবে শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনে, এর বেশির ভাগ লেখাই হত অন্যভাষা থেকে অনূদিত, প্রচলিত কাহিনিনির্ভর বা সংস্কৃত রচনার ভাবানুবাদ। অর্থাৎ শিশুমনের উপযুক্ত মৌলিক রচনার জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হল। অক্ষর পরিচয়ের বইকে আরও মনোরম ও শিশুমনের উপযোগী আর সচিত্র করে তুললেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'হাসিখুশি', 'হাসিরাশি', 'ছবি ও গল্প', 'হাসিমেলা' প্রভৃতি। তখনও কিন্তু শিশুদের উপযুক্ত গল্প-কবিতা-ছড়া সেভাবে লেখা হয়নি; তবে শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন বা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কলমে কিশোর-কাহিনি রচিত হতে দেখা গেল। এঁদের রচনায় আরোপিত শিক্ষামূলক বিষয়ের পরিবর্তে কিশোর বয়সের নানাবিধ সমাজ-অভিজ্ঞতা রূপায়িত হল। সেখানে নানান উপকথা, আজগুবি বিষয়, ভূতের গল্প, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার দেখা মিলল।

বাংলা শিশুসাহিত্য যাঁর চেষ্টায় স্বাবলম্বী হয়ে উঠল, তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তিনি একই সঙ্গে রূপকথা-উপকথা-প্রচলিত কাহিনি (যেমন 'টুনটুনির বই', 'পানতাবুড়ি', 'সাক্ষীশেয়াল' প্রভৃতি), দেশ-বিদেশের লেখার অনুবাদ, তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞানমূলক রচনা এবং খাঁটি বাঙালিয়ানায় সমৃদ্ধ বহু লেখা লিখলেন। পরবর্তীকালে অনেকেই যেমন সুকুমার রায়, সুখলতা রাও, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁকে অনুসরণ করে বাংলা শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। বিশেষ করে সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' বইটির কথা উল্লেখ করতেই হয়। প্রচলিত বাংলা ছড়া বা কবিতার ঐতিহ্যের বাইরে বেরিয়ে তিনি উদ্ভট বা ননসেন্স কবিতার এক আশ্চর্য জগৎ তৈরি করলেন। তাঁর লেখা নাটক, বহু কাহিনি, ইস্কুলের গল্প, মণীষী ও অভিযাত্রীদের জীবনী বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে। রায়চৌধুরী পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যে সুখলতা রাও, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার এবং সত্যজিৎ রায় বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে অনেকগুলি নতুন ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করলেন। ছোটো মেয়েদের অভিজ্ঞতার গল্প, কল্পবিজ্ঞানের গল্প, মজার গোয়েন্দা কাহিনি প্রভৃতির সংযোজনে শিশুর কল্পনার জগৎকে অসামান্য ব্যাপ্তি এনে দিলেন।

একদিকে শিশুমনের লাগামছাড়া কল্পনা যেমন শিশু সাহিত্যে স্থান করে নিল, তেমনই প্রচলিত রূপকথার গল্প, ছড়া, ব্রতকথা, পাঁচালীর গল্প প্রভৃতি সংগ্রহের উদ্যোগ দেখা দিল। যার প্রতিফলন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রভৃতিতে লক্ষ করা যায়। এই রূপকথা বলার ধরনটি আরও আধুনিক হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় ফুটে উঠল। প্রসঙ্গত তাঁর 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনি', 'নালক', 'বুড়ো আংলা'র নাম করা যায়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে নানান সমাজ-রাজনৈতিক আন্দোলন শিশুসাহিত্য, বিশেষত কিশোর সাহিত্যের ধারাকে প্রভাবিত করেছে। ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতার চেতনা, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কিশোর চরিত্রগুলির মধ্যে প্রকাশিত হল। এই প্রবণতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনির্মল বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের রচনায় লক্ষ করা গেল। এঁদের লেখায় চঞ্চল, দুঃসাহসী, কখনও বা বেপরোয়া, প্রতিষ্ঠানবিরোধী অন্য এক ধরনের মুক্তিকামী ভালো আদর্শ তরুণের 'টাইপ' তৈরি হল।

এখানে বলা উচিত, বাংলা সাহিত্যে প্রথিতযশা প্রায় সকলেই শিশু-কিশোরদের জন্য কিছু-না-কিছু লিখেছেন। এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'সে', 'খাপছাড়া'—এ ধরনের বই ছাড়াও পঠন পাঠনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতেন বলেই 'সহজ পাঠ'-এর মতো পাঠ্যপুস্তকও তিনি লিখেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী, আশালতা সিংহ, সাবিত্রী রায় প্রমুখের রচনায় শিশু-কিশোরেরা তাঁদের বহু-বিচিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আর এই ধারা এখনও সমানে চলেছে।

পত্রপত্রিকার কথা :

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকেই ছোটোদের গুরুত্ব দিয়ে অনেক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কেশবচন্দ্র সেনের বালকবন্ধু (১৮৮২) থেকে তার শুরু। এরপর 'সখা', 'বালক', 'মুকুল', 'সাথী', 'সন্দেশ' 'মৌচাক', 'রামধনু', 'পাঠশালা', 'রংমশাল', 'শুকতারা', 'কিশোর ভারতী', 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান', 'আনন্দমেলা' প্রভৃতি পত্রপত্রিকাগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখকদের শিশুদের জন্য লিখতে উৎসাহ জুগিয়েছে।

তথ্যসূচি :

১. 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধ, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, বুদ্ধদেব বসু, নাভানা

২. 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধ, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, বুদ্ধদেব বসু, নাভানা

৩. 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধ, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, বুদ্ধদেব বসু, নাভানা

৪. 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধ, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, বুদ্ধদেব বসু, নাভানা

৫. সটীক হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা, সম্পাদনা অরুণ নাগ, সুবর্ণরেখা

৬. বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

চতুর্থ অধ্যায়

লৌকিক সাহিত্যের নানা দিক

'লোক' শব্দে বোঝায় নিবিড় সন্নিবিষ্ট, দীর্ঘ ঐতিহ্যশালী কোনো জনসমষ্টি এবং এই জনসমষ্টির সামূহিক কৃতিকেই একত্রে বলা যায় লোকসংস্কৃতি। নামহীনতা লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, কোনো কোনো সময়ে কিছু গানে বা কাব্য-কবিতায় লেখকের ভনিতা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোককৃতিগুলির রচয়িতার নাম জানা যায় না। লোকসংস্কৃতির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল যুগপৎ ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দুটি ভিন্ন স্তরে সত্তাবান হয়ে ওঠা। অর্থাৎ, লোকসংস্কৃতি একদিকে যেমন তার শিকড়কে চারিয়ে দেয় জাতির অতীত ও সমষ্টিগত স্মৃতির গভীরে, তেমনই তার ডানা মেলা থাকে সমসাময়িক বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে। পরিবর্তনশীলতা এবং সংরক্ষণ—এ দুই-ই লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ। লোকশিল্পীরা একদিকে যেমন তাঁদের গোষ্ঠী ও ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ, তাঁদের প্রত্যেকের স্বকীয় সৃষ্টিশীলতা এবং নিজস্ব নান্দনিকতার প্রকাশ-ও আবার তাঁদের শিল্পে একই সঙ্গে প্রকাশ পায়। লোকসংস্কৃতির যে-কোনো ধারায়, তা সাহিত্য, সংগীত, চারু বা কারুশিল্প, যাই হোক না কেন, সমস্ত ক্ষেত্রেই তাই প্রকৃতপক্ষে একটি গোটা জাতির জীবনভাবনা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন সেখানে ঘটে থাকে।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বাংলা লোকসাহিত্যের, বা বলা যায়, লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রকাশের চারটি প্রধান ধারা (ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, কথা) নিয়ে আলোচনা করব। লোকসংস্কৃতির অন্য ধারাগুলি নিয়ে বিস্তারিতভাবে দ্বাদশ শ্রেণিতে তোমরা পড়বে। কবে, কোথায়, কে বা কারা এগুলি রচনা করেছিলেন তা জানা সম্ভব নয়, সংগতও নয়। এগুলি উদ্ভাবিত হওয়ার পর একটি জাতির ব্যাবহারিক জীবনে এবং চিন্তা ও কল্পনার জগতে এদের চিরস্থায়ী স্থান তৈরি হয়েছে, সেই কারণেই কোনো ব্যক্তি-রচয়িতার নাম ব্যতিরেকেই এগুলি হয়ে উঠেছে জাতির অক্ষয় সম্পদ।

কথা

বলা আর শোনা। অমনই স্ফূরিত হল কথা। যে বলল আর যে শুনল, তাদের সহিতত্বের সূচনা হল এই বিন্দুটিতে। সৃষ্টি হল সাহিত্যের সম্ভাবনা। পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যই মৌখিক ও স্মৃতিধার্য। স্মরণে রাখার সুবিধের জন্যেই অনেকাংশে তা পদ্যের ভাষায় গ্রথিত, কেন না ছাপাখানাও তখন নেই আর পুথি নকল খুবই শ্রম ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ভালো লিপিকর পাওয়া ছিল দুষ্কর, আর তাছাড়া পড়বেই বা কে? অল্প কিছু অভিজাত ছাড়া বেশিরভাগ মানুষের যে অক্ষরজ্ঞানই নেই। ফলে যে মানুষটি ছন্দে, সুরে, মামুলি ও দৈনন্দিন ভাষাকে অলৌকিক সৌন্দর্য দান করেছেন, যাঁর রচনা স্মৃতিধার্য হয়ে উঠছে অক্লেশে—সেই কবিকে সকল সমাজেই অত্যন্ত উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছে। এমনকি সেই গানের গায়ককেও। কিন্তু তাঁরাও যে সংখ্যায় নেহাতই অপ্রতুল। অথচ মানুষের মনের খিদে উদগ্র, কেবল পদ্যে নয়, তার চিরপরিচিত, অভ্যস্ত গদ্যভাষায় সে শুনতে চায় কথা। যে কথায় মিশে যায় স্মৃতি, সত্তা আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। একটি জাতির অভিজ্ঞতা, আত্মানুসন্ধান, গৌরববোধ, স্বদেশচেতনা, গভীর বেদনা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। সর্বোপরি তাকে এসে প্রাণ দেয় কল্পনা ও সরসতা। পৃথিবীর প্রতিটি শিশুমানুষ যেমন গল্পের তাগিদে কেবলই বলে চলে—"তারপর? তারপর?" সভ্যতার শৈশবে

মানুষও তেমনই এই 'আর একটু বেশি', এই 'ভূমা'-র সন্ধানে তার অভিজ্ঞতা ও কল্পনা, স্মৃতি ও স্বপ্নকে মন্থন করে একের পর এক কথা-শরীর নির্মাণ করেছে। তৈরি হয়েছে ভুবনজোড়া এক অখণ্ড কথাবিশ্ব।

কথা সাহিত্যের এই মৌখিক ধারাটিকেই আমরা চিহ্নিত করতে পারি লোককথা বলে। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে অদ্যাবধি আমাদের লোকশিল্পীদের যাবতীয় কাহিনিমূলক রচনাই এই লোককথা-র অন্তর্গত। তা হতে পারে রূপকথা, উপকথা, পশুকথা, নীতিকথা, ব্রতকথা অথবা পুরাণকথা, হতে পারে লোকশ্রুতি কিংবা কিংবদন্তি।

যেসব গল্পে জীবজন্তু-পশুপাখিই প্রধান, ইংরাজিতে তাদের Animal Tale বলা হয়। আদিম সমাজের সঙ্গে প্রকৃতির অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক ছিল বলেই লোককথার সমস্ত শাখার মধ্যে এই ধারাটিই সর্বপ্রধান। Animism বা সর্বপ্রাণবাদ, Animalism বা পশুত্বে দেবত্ব আরোপ এবং Totemism বা কোনো প্রাণীকে বংশের আদিপুরুষ সাব্যস্ত করে তার পরিচয়ে বংশ পরিচয় নির্দিষ্ট করার প্রথা গোটা পৃথিবীতেই চালু ছিল। এখনও এই বিশ্বাসগুলির ভগ্নাবশেষ আমাদের সংস্কার ও অবচেতনে রয়ে গেছে। স্বভাবতই জীবজন্তুর গল্পে মানুষ নিজের প্রকৃতিকেই আরোপ করেছে। এ ধরনের কাহিনিকে উপকথা বা পশুকথা বলে চিহ্নিত করা যায়। এই ধরনের গল্পের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য—কৌতুক সৃষ্টি আর নীতি প্রচার। বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে রচিত হলেও কোনো বিশেষ দেশকালের প্রতি আনুগত্য নয়, শাশ্বত মানবজীবনের প্রেক্ষাপটেই এই গল্পগুলির রসাস্বাদন সম্ভব। এই গুণেই উপকথাগুলি যুগ থেকে যুগান্তরে এবং দেশ থেকে দেশান্তরে পরিভ্রমণে সমর্থ। যেসব উপকথায় উপদেশ বা নীতি সংযুক্ত থাকে তাদের ইংরেজিতে Fables বলা হয়। বাংলায় বলা যায় নীতিকথা। ঈশপের গল্প, বাংলা হিতোপদেশ বা সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র নীতিকথার উদাহরণ।

লোককথার প্রধান আর একটি শাখা রূপকথা। সচরাচর এদের আয়তন দীর্ঘ, বিভিন্ন বিষয় ও শাখা কাহিনির সমাহারে জটিল, সম্পূর্ণ অবাস্তব ও স্বপ্নিল পরিবেশে, অনির্দিষ্ট স্থান ও অস্পষ্ট কল্পিত চরিত্র অবলম্বনে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য সব রোমাঞ্চকর ঘটনাই এইসব কাহিনির উপজীব্য। ইংরেজিতে Fairy Tale প্রতিশব্দটি থাকলেও রূপকথায় পরিদের অস্তিত্ব মোটেই আবশ্যিক নয়, বস্তুত বাংলা রূপকথায় পরিদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, যেটুকু আছে তাও উত্তর-ইসলাম যুগের আমদানি। এদিক থেকে জার্মান Marchen (ম্যরশেন) বা ফরাসি Conte Populaire শব্দ দুটি বাংলা রূপকথা-র ভাবটিকে অনেকাংশে ফুটিয়ে তোলে। রাক্ষস-খোক্ষসের পুরীতে 'অজানি দেশের না জানি কী' খুঁজতে, অনেকদিন নাকি অল্পদিন ধরে ভাগ্যহত রাজপুত্র বা সাধারণ দরিদ্র নায়কের অসাধ্যসাধন, ভিন্ন ভিন্ন রাজকন্যাকে বিবাহ, দৈব সাহায্য, ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা এবং পরিণামে প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে নায়কের চিরকাল সুখে থাকার কামনায় পৃথিবীর সমস্ত রূপকথা নির্মিত হয়। আলেকজান্ডার এইচ. ক্রাপের মতে "By fairy tale we mean a continued narrative generally of a certain length, practically always in prose, serious on the whole, though humour is by no means excluded, centring in one hero or heroine; usually poor and destitute at the start, who, after a series of adventure in which the supernatural element plays a concious part, attains his goal and lives happilly ever after." সমস্ত লোকসাহিত্যে একমাত্র রূপকথাতেই নরবলি, রাক্ষস দ্বারা নরমাংস ভক্ষণ

প্রভৃতির উল্লেখে একে প্রাগৈতিহাসিক বর্বর যুগে আদিম সমাজের প্রথম রসসৃষ্টির প্রয়াস বলে মনে করা হয়ে থাকে। পরবর্তী সময়ে উচ্চতর ও জটিলতর সময়ের বিভিন্ন রসোপকরণ এতে এসে মেলে বলেই উপন্যাস বা রোমান্সের মতো অবিমিশ্র বিশিষ্ট কোনো সমাজজীবনের পরিচয় রূপকথায় আশা করা উচিত নয়।

লোককথার একটি বিশিষ্ট শাখা ব্রতকথা। বাংলার লৌকিক দেবতাদের অবলম্বন করে এগুলি রচিত, আদিম সংস্কার ও উচ্চতর সংস্কৃতির মিশ্রণের ফল এই ব্রতকথাগুলি, প্রবল অনিষ্টকারী দেবতাকে প্রসন্ন করে তাঁর দ্বারা প্রভূত কল্যাণসাধনের বিশ্বাসই ব্রতকথাগুলির মাধ্যমে প্রচারিত হয়। উপকথায় যেমন পশুপাখির উপর মানবতা আরোপ করা হয়ে থাকে, ব্রতকথাতেও তেমনি নানা মানবিক দোষগুণের আলোকেই দেবতাদের চিত্রিত করা হয়। এই ব্রতকথাগুলিকে ভিত্তি করেই উচ্চতর সাহিত্য মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি। রূপকথা বা উপকথাগুলিই যেন ব্যাবহারিক প্রয়োজনে ব্রতকথায় পর্যবসিত হয়েছে। রূপকথার কাজ অবসর বিনোদন, ব্রতকথার কাজ গার্হস্থ্য মঙ্গলসাধন; রূপকথার অসম্ভাব্যতা আমাদের suspension of disbelief বা অবিশ্বাস্য নিরাকরণের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ব্রতকথায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার পিছনে যুক্তি হিসাবে দেবতার হস্তক্ষেপের উল্লেখ থাকে, এছাড়া ব্রতকথা ও রূপকথা-উপকথার কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই।

লোককথার আর একটি শাখা novella, বাংলায় একে রোমাঞ্চকথা বলা যায়। স্টিথ থম্পসনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, novella-র ঘটনাগুলি বাস্তব জগতের নির্দিষ্ট স্থানকালে ঘটলেও এখানে অদ্ভুত সমস্ত ঘটনা ঘটে, তবে তা লোকের বিশ্বাসের সীমারেখাকে অতিক্রম করে না। নাবিক সিন্দবাদের কাহিনি, খলিফা হারুন আল রশিদের কাহিনি, আলিফ-লায়লা বা বোকাচ্চিওর ডেকামেরন ওই জাতীয় সাহিত্য। বাংলার 'সায়ফুল মুলক বদিউজ্জামান'-জাতীয় কাহিনিতে রূপকথা ও রোমাঞ্চকথার সংমিশ্রণ দেখা যায়, একে বলা যায় Novella Marchen।

লোককথায় আর একটি উল্লেখযোগ্য শাখা বীরকথা বা Hero tale। একটিমাত্র কেন্দ্রীয় দুঃসাহসী ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বীর চরিত্রকে অবলম্বন করে একাধিক কাহিনি তৈরি হলে তাকে বীরগাথা বলা যায়। হারকিউলিস বা থিসিয়াসের গ্রিক কাহিনি বা সংস্কৃত বেতাল পঞ্চবিংশতির বিক্রমাদিত্যের কাহিনি বীরকথার উদাহরণ। রুশ বগাতিরদের কাহিনিও এর মধ্যে পড়বে। আবার অলৌকিকতা না থাকা সত্ত্বেও রবিনহুড বা রঘু ডাকাত প্রমুখ বাংলার ডাকাতদের কাহিনিও বীরকথার অন্তর্গত হতে পারে।

লোককথার একটি বিশিষ্ট শাখা, পুরাণকথা। ইংরাজি Myth শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোকপুরাণ', 'লৌকিক পুরাণ', 'লৌকিক পুরাকাহিনি', 'পুরাণকথা', 'পুরাকথা' প্রভৃতি শব্দের অবতারণা ঘটেছে। যদিও আমাদের দেশে অষ্টাদশ পুরাণ বা পরবর্তীতে অর্বাচীন যে পুরাণগুলি প্রচলিত রয়েছে তার সঙ্গে Myth-এর কিছু পার্থক্য আছে। আমাদের দেশে পুরাণসাহিত্য মূলত আর্য-প্রাগার্য সংস্কৃতির মিলনের দ্যোতক, কোনো বিশিষ্ট দেবতার লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশক এবং ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। Myth-এ ধর্মের বন্ধন নয়, বিশ্বাস এবং অতীত বিশ্বের কাহিনিই প্রধান। Myth প্রসঙ্গে ফোকলোর অভিধানে বলা হয়েছে— "A shortly presented tale as having actually occured in a previous age, explaining the cosmological and supernatural traditions of a people, their gods, heroes, cultural traits, religious beliefs etc. Thus myths tell of the creation of man, of animal, of landmarks; they tell why a certain animal has its characteristics (e.g. why

the bat is blind or files only at night), why or how certain natural phenomena came to be (e.g. why the rituals and ceremonies began and why then continue." দেশের বা সমাজের আদি মানুষের আবির্ভাব, পৃথিবীর সৃষ্টি, দেবদেবীর জন্মগ্রহণ, মানুষের বিবর্তন, সনাতন ধর্মের আবির্ভাব, স্রষ্টার মূল ও প্রকৃতি, আকাশ-মর্ত্য ও পাতালে মানব-দেবতা ও অন্যান্য জীবের জন্ম, লোকাচারগুলির উৎস, সেগুলি পালনের প্রয়োজনীয়তা—এই বিষয়গুলি নিয়েই সকল দেশের পুরাকাহিনির কাঠামো গড়ে উঠেছে।

লোককথার শাখায় আর এক শ্রেণির রচনার নাম করা যায়। জার্মান ভাষায় একে বলা হয় sage, বাংলায় এর নাম করা যায় স্থানিক কথা। বিশেষ কোনো স্থানকে কেন্দ্র করে এ ধরনের কাহিনি গড়ে ওঠে। এতেও থাকে নানা অবাস্তব ব্যাপার স্যাপার, তবে তা সত্য বলেই বিশ্বাস করা হয়।

লোককথার শ্রেণিবিন্যাসে রঙ্গকথা নামে আরও একটি ধরন পাওয়া যায়, পৃথিবীর সর্বত্রই ছোটো ছোটো কাহিনিতে হাসি-তামাশা, চুটকি-রঙ্গ-রসিকতা প্রকাশ করা হয়। ইংরাজিতে এসব কাহিনিকে Jest, Humorous Anecdotes এবং Merry Tales বলা হয়। এছাড়া বোকা লোকদের নিয়ে বিদ্রুপ, লোক ঠকানোর সচরাচর অশ্লীল যেসব কাহিনি পাওয়া যায় তাকে বলে Numskull tale। এই ধরনের কাহিনি কখনো-কখনো বিশেষ নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করে একটি বিস্তৃত কাহিনি-পরম্পরা তৈরি করে, কখনও প্রশংসিত, কখনও নিন্দিত হয় এই প্রবঞ্চক নায়ক/নায়িকারা। পাজি পিটার, টেটন বুড়ো, খোজা নাসিরুদ্দিন বা ঢাকার কুট্টিদের গল্প এই শ্রেণির অন্তর্গত, গোটা পৃথিবীতেই এই ধরনের কাহিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

লোকপ্রবাদ ও প্রবচন

'প্রবাদ' শব্দটি উচ্চারণমাত্রে তোমাদের অনেকেরই হয়তো প্রথমেই মনে পড়বে লি ফক-এর সৃষ্টি পৃথিবী বিখ্যাত কমিকস্ 'অরণ্যদেব' বা ফ্যান্টমের একটি বিখ্যাত পাঞ্চলাইন—'প্রাচীন অরণ্য প্রবাদ'। আমরা কথায় কথায় প্রায়ই বলে থাকি 'প্রবাদপ্রতিম'। কারণ প্রবাদ প্রায় পুরাণের মতোই শক্তিশালী। একটি পুরাণে যেমন একটি দেশের, একটি জাতির, একটা বড়ো কালপর্বের প্রেক্ষাপটে তার সমগ্র অস্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে, একটি প্রবাদেও তেমনই একটি জাতির ভূয়োদর্শন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার নির্যাস একটিমাত্র বাক্য বা বাক্যাংশে প্রতিফলিত হয়, এক-একটি পুরাণে যেমন সেই সেই জাতির নাড়িকে বোঝা যায়, প্রত্যেকটি প্রবাদই সেইরকম সেই ভাষা গোষ্ঠীর, সেই জাতির মানুষকেও চিনিয়ে দিয়ে যায়। আবার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ভাবগত মিল আমাদের আপাত বিভিন্নতা সত্ত্বেও মানব-অভিজ্ঞতার সাদৃশ্যকেই সমর্থন করে। প্রবাদ সম্বন্ধে আরও একটা কথা চালু আছে। প্রত্যেকটি প্রবাদই সত্যি। কেননা প্রবাদ কোনো একজনের রচনা নয়, কখনোকখনো খুব শক্তিশালী কবি-সাহিত্যিকের কোনো কোনো পংক্তি প্রবাদের মর্যাদা পেলেও প্রবাদের একটা মূল বৈশিষ্ট্য তার রচয়িতার নামহীনতা। এই নামহীনতা অবশ্য লোক সংস্কৃতিরই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি প্রবাদেই তাই রয়েছে বহুদিনের বহু মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতাপ্রসূত জীবন ও জগৎ, সময় ও সমাজকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার বেদনা ও উত্তাপ। কখনও সেখানে মিশেছে তির্যক ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ শ্লেষ। কখনও করুণা ও আত্মসমালোচনা, কখনও বা নিরপেক্ষ দর্শকের গভীর নিরাসক্তি। আপাত অর্থে পরস্পরবিরোধী প্রবাদগুলিও তাই সমানভাবে সত্য। দুটি আলাদা পরিস্থিতিতে 'দুষ্ট গোরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো' এবং 'নাই মামার

চেয়ে কানামামা ভালো' প্রবাদ দুটি একইসঙ্গে সত্যি হয়ে উঠতে পারে। আর এইখানেই প্রবাদের অমরত্বের সম্ভাবনা। যে মুহূর্তে একটি নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন মানুষের মধ্যে ভাষা ব্যবহারে একটি প্রবাদের প্রয়োগ হবে, সেই প্রবাদটি বহু বহু প্রাচীন হলেও সেই মুহূর্তটিতেই আবার নতুন করে বেঁচে উঠল, তা হয়ে উঠল শাশ্বত ও সর্বজনমান্য।

প্রবাদগুলিতে নানা সময়েই বিভিন্ন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ জড়িত থাকে। ব্যক্তিনাম ও স্থাননামও অনেক সময়ে হয়ে ওঠে প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত। তবে কিনা বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা টপকে ব্যাপক সাধারণীকরণের এবং নতুন নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হতে পারার ক্ষমতাই একটি প্রবাদের জনপ্রিয়তা ও অস্তিত্বের বিষয়টি নির্ধারণ করে। এককথায় প্রবাদ হবে সংক্ষিপ্ত, সরল, রূপক-অলংকার বহুল, সহজ, প্রাচীন, এবং সর্বোপরি সত্য। তবে কিনা লোকোক্তি মাত্রেই প্রবাদ নয়, 'চুরি করা মহাপাপ' নীতিবাক্য মাত্র, প্রত্যক্ষ জীবননির্ভর এবং সরস নয় বলেই তা প্রবাদ হয়ে উঠতে পারেনি।

'প্রবচন' শব্দটি নিয়েও কিছু আলোচনার অবকাশ আছে। বাংলায় 'বচন' শব্দটির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়—যেমন, ডাকের বচন, খনার বচন, বৃদ্ধের বচন, চাণক্য বচন প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে প্রবাদ বলতে আমরা এখন যা বুঝি এক সময় বচন শব্দ দিয়েই তা বোঝানো হত। রবীন্দ্রনাথ যদিও অন্য মতের পোষক। প্রভাত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে দেখি তাঁর মতে প্রবাদ কথাটির মধ্যে একটি গল্পের ভাব আছে, কিন্তু প্রবচন ছাঁটা-কাটা কথা মাত্র, আনন্দ-দুঃখ বা কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ছাড়া তার আর অন্য কিছু পরিবেশনের নেই। যদিও বর্তমানে প্রবাদ ও প্রবচন প্রায় সমার্থক এবং পরিপূরক শব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। সেই অর্থে কৃষি-বিষয়ক খনার বচন বা লৌকিক জ্যোতিষ বিষয়ক ডাকের বচনও ব্যাবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকেই সহজ-সরল অথচ সালংকারভাবে প্রকাশ করে বলে এগুলিকেও প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কোনোকালে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা কথিত হলেও প্রবাদ মাত্রেই সর্বসাধারণের নির্বিশেষ সম্পত্তি। বস্তুত একটি প্রবাদের সাফল্য, এমনকি অস্তিত্ব নির্ভর করে লোকমানসের সরল, স্বাভাবিক সমর্থনের উপর। বিষয়বস্তু নয়, এই সাফল্যের ভিত্তি সহজ প্রকাশভঙ্গি, সাধারণ বুদ্ধির সরল চমৎকারিত্ব, সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা এবং প্রয়োগের সার্থকতায়। শব্দের স্বল্পতা এবং অর্থের আধিক্য প্রবাদের একটি সাধারণ লক্ষণ। সেই দিক থেকে প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বা বাগ্‌ধারার সঙ্গেও প্রবাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলা প্রবাদের বিষয়বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে তার একটি রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

দেবদেবী বিষয়ক : রাখে হরি মারে কে?

একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ।

পৌরাণিক চরিত্র-বিষয়ক : একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর।

সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ?

ইতিহাস প্রসিদ্ধ চরিত্র বিষয়ক : রাণী ভবানী আর ফুল জেলেনী।

খায় লয় চাঁদ রায়ের, নাম লয় কেদার রায়ের।

সমাজ-বিষয়ক : তেলক কাটলেই বোষ্টম হয় না।

বাইরে কোঁচা লম্বা, ভেতরে অষ্টরম্ভা।

পরিবার-বিষয়ক : মেয়ে বাঁচলে জামাইয়ের আদর।

ভালো কথা পড়ল মনে আঁচাতে আঁচাতে/

ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।

মানবদেহ বিষয়ক : কান টানলে মাথা আসে।

সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।

আচার-আচরণমূলক : আমার নাম যমুনা দাসী, পরের খেতে ভালোবাসি।

কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।

গার্হস্থ্য জীবনে ব্যবহৃত বস্তু বিষয়ক : শূন্য কলসির আওয়াজ বেশি।

ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়।

নিসর্গ প্রকৃতি বিষয়ক : আমড়াকাঠের ঢেকি, কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

মেঘ না চাইতে জল।

কৃষিকর্ম সংক্রান্ত : লঙ্কা পুঁতো গুড়ো, বেগুন পুঁতো বুড়ো।

চার আল উঁচু, মাঝখানে নিচু।

খাদ্যবস্তু সংক্রান্ত : দুধের সাধ ঘোলে মিটানো।

নেই কাজ তো খই ভাজ।

পশু-পক্ষী বিষয়ক : বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া,

শকুনের নজর ভাগাড়ের দিকে।

বাদ্যযন্ত্র-বিষয়ক : খাই দাই ডুগডুগি বাজাই।

সানাইয়ের পোঁ ধরা।

বিলাসোপকরণ বিষয়ক : গোদা পায়ে আলতা-খাঁদা নাকে নথ।

মায়ের গলায় দড়ি/বউকে পরায় ঢাকাই শাড়ি।

প্রেম বিষয়ক : যার সঙ্গে মজে মন/কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

যদি হয় সুজন/তেঁতুলপাতায় নজন।

স্থাননাম বিষয়ক : মুখে পান, হাতে চুন/তবে জানবে মানভূম।

চাল, চিঁড়ে, গুড়/তিন নিয়ে দিনাজপুর।

ব্যক্তিগত-বিষয়ক : লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন

হরি ঘোষের গোয়াল।

লোক শিক্ষামূলক : আগে পা পরে গা/মাথায় দিয়ে নাইতে যা।

আলো হাওয়া বেঁধো না/রোগ ভোগ সেধো না।

লোক সিদ্ধান্তমূলক : নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি/পরের বেলায় দাঁতকপাটি

যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

লোক সাংবাদিকতা বিষয়ক : গুলি, খিলি, মতিচুর/এই তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর।

কাগজ, কলম, কালি/তিন নিয়ে বালি।

বিবিধ : গাইতে গাইতে গায়েন/বাজাতে বাজাতে বায়েন। (অধ্যবসায়)

তিন মাথা যার, বুদ্ধি নাও তার। (অভিজ্ঞতা)

পড়েছি মোগলের হাতে/খানা খেতে হবে সাথে। (জোরজুলুম)

বাহির বাড়ি লণ্ঠন/ভিতর বাড়ি ঠন ঠন। (বাহ্যাড়ম্বর)

মুখ খুব মিঠে/নিম-নিশিন্দা পেটে। (কপটতা)

একের বোঝা, দশের লাঠি। (সংঘশক্তি)

কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজি। (প্রতারণা)

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা। (অবাস্তব)

হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। (আইন)

জোর যার মুলুক তার। (সামন্ত শাসন)

ছড়া

ছেলেভুলানো ছড়ার বিশেষত্বের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত-সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে, সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় এবং মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য; তাহারা মানব মনে

আপনি জন্মিয়াছে।...” ছড়ার জগৎ যে মূলত শিশুমানবের জগৎ এবং সেই জগতের আস্বাদকও মূলত শিশুই—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শিশুমানুষ যে চোখ দিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখে তা সতত সঞ্চরণশীল এবং সদা অনুসন্ধিৎসু। সমস্ত পৃথিবীটাই তার কাছে নতুন বলে গভীর অভিনিবেশে কোনো একটিমাত্র বিষয় বা বস্তুতে মনঃসংযোগ করবার প্রবৃত্তি তার নেই, সদা পরিবর্তনশীল জীবননাট্যের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিও বরং তার সদাজাগ্রত কৌতূহলী চোখ এড়ায় না। এম. ব্লুমফিল্ড লিখেছেন, “The popular rhyme is a striking example of the poetic primitive, going back in its construction and psychological essence almost to the primitive archaic times, and at the same time it is frequently an expression of new attitudes among the masses of the people.” ছড়াগুলি ‘poetic primitive’, কোনো বিশেষ বার্তা বা মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তা রচিত নয়, অর্থপূর্ণ সংলগ্নতার কোনও দায়-ও তার নেই। শিশুর সদাচঞ্চল দৃষ্টিপাতের মতোই এখানেও টুকরো টুকরো পরস্পরবিচ্ছিন্ন অজস্র ছবির সমাহার। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মত অনুসারে বিভিন্ন অবদমিত ইচ্ছা ও স্বপ্ন-প্রতীকেরই প্রকাশ ঘটে আদিম ছড়াগুলিতে, পরবর্তী সময়ে তা হয়ে উঠতে পারে আরও সুজটিল, অর্থপূর্ণ ও সচেতন। যে-কোনো জনপ্রিয় ছড়া নিয়ে আলোচনা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে,
চাঁই মিরগেল ঝাঁঝর বাজে।।
বাজতে বাজতে পলো ঢুলি।
ঢুলি গেল কমলা ফুলি।।
কমলাফুলির টিয়েটা।
রাঙা মামার বিয়েটা।।

প্রায় সকলের পরিচিত এই ছড়াটির প্রথম দুই কি তিন লাইনে যে ছবিগুলি পাই শেষ তিন পঙ্‌ক্তির ছবিগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক খুঁজে বের করা মুশকিল। আপাতভাবে কোনো যুক্তি এখানে নেই, আর সম্ভবত যুক্তিবোধের ধার শিশু খুব একটা ধারেও না। এই টুকরো ছবিগুলির মতোই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছড়ার অন্তর্নিহিত ছন্দসৌন্দর্য এবং সুরনিরপেক্ষ ধ্বনিসম্ভূত শব্দসংগীত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে ‘‘জল পড়ে/পাতা নড়ে’’—এই ছন্দোবদ্ধ পঙ্‌ক্তি দুটির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে শব্দের এই নিজস্ব ধ্বনিমাধুর্যের আস্বাদনজাত শিহরণের বর্ণনা দিয়েছেন। ‘পথের পাঁচালী’-র বালক অপুকেও দেখব প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের দেওয়া শ্রুতলিখনে ‘সীতার বনবাস’-এর অংশবিশেষের বিন্দুমাত্র অর্থবোধ না হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র তার শব্দঝংকারে কীভাবে মোহিত হয়েছিল। বস্তুত, শিশুর কাছে এই ছন্দ-সংগীতের অহৈতুকী আবেদনই মুখ্য। অর্থই যে অনর্থের মূল তা না জেনেও পৃথিবীর কোনো শিশুই ছড়ার অর্থ নিয়ে খুব ভাবিত নয়, সেই অর্থে সমস্ত সার্থক ছড়ার মূল রস অদ্ভুত। এডওয়ার্ড লিয়র বা সুকুমার রায়ের বহু-বহু পূর্বেই আমাদের মা-দিদিমারা আমাদের শৈশবের আকাশকে খাঁটি ননসেন্সের আলোয় ও রসে মাখামাখি করে দিয়েছেন। অন্যদিক থেকে বলা যায় ছড়াই হল সংগীতের পূর্ব পর্যায় (আজকের হিপহপ বা র‍্যাপ শুনে একথা আরও বেশি করে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, কেবল কথাটা উলটো করে বলতে হবে, এই আর কি)। শুধু তাই নয়, ধাঁধা-প্রবাদ-মন্ত্র প্রভৃতির মধ্যে যে ছন্দোসৌন্দর্য তা-ও লোকবিজ্ঞানীদের মতে ছড়ার প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে।

অধিকাংশ ছড়ারই মূল উদ্দেশ্য শিশুর মনোরঞ্জন। হয় তা ঘুমপাড়ানি, নয়তো মনভোলানো। মা-দিদিমা-ঠাকুমারা এগুলির রচয়িতা। কিন্তু এ ছাড়াও কিছু ছড়া আছে যা মূলত খেলার সঙ্গে যুক্ত। শৈশব-কৈশোরের অহেতুক আনন্দ, অপার বিস্ময়বোধ, অস্ফুট প্রকাশসামর্থ্য এবং অসংলগ্ন উদ্দাম ও স্বাধীন সৃজনশীলতায় এগুলি জীবন্ত ও বর্ণময়। এই ছড়াগুলিও ছেলে ও মেয়েদের খেলার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চরিত্রগতভাবে আলাদা হয়ে যায়। আর কিছু ছড়া আছে যা একান্তভাবেই মেয়েদের নিজস্ব ভুবনটির থেকে উৎসারিত। আমাদের সমাজব্যবস্থায় প্রধানত অবদমিত নারীহৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রকাশ এবং অনেকাংশে ইচ্ছাপূর্তির প্রতিফলন হয়ে উঠেছে এই ছড়াগুলি। এই প্রবন্ধে 'মেয়েলি ছড়া' নামে কয়েকটি শ্রেণিতে কিছু ছড়া বিন্যস্ত করা হল। তোমাদের অঞ্চলে প্রচলিত এই রকমের আরও বেশ কিছু ছড়া সংগ্রহ করে লিখে ফ্যালো দেখি।

ঘুম পাড়ানি ছড়া :

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি
মোদের বাড়ি এসো,
খাট নেই, পালঙ্ক নেই
খোকার চক্ষু পেতে বোসো।
এই গালে দিনু চুমো দে রে ওই গাল,
ঘুমে ঘোর খোকা মোর চুমোর মাতাল।।

ছেলে ভুলানো ছড়া :

সোনা সোনা ডাক ছাড়ি,
সোনা নেইকো বাড়ি,
মনা মনা ডাক ছাড়ি
মনা আছে বাড়ি।
আয়রে মনা আয়,
দুধ মাখা ভাত কাগে খায়।

ছেলে খেলা ছড়া :

(১)

আইগন বাইগন তাড়াতুড়ি
যুদ মাস্টার শ্বশুর বাড়ি,
রেল (রেন) কাম, ঝমা ঝম্,
পা পিছ্‌লা আলুর দম্।
ইস্টিশানে মিষ্টি গুড়
সখের বাদাম গোলাপ ফুল।

(২)

আড়ি আড়ি আড়ি
কাল যাব বাড়ি
পরশু যাব ঘর
কি করবি কর
হনুমানের ল্যাজ ধরে
টানাটানি কর।

মেয়েলি ছড়া :

(১)

এলাডিং বেলাডিং সইলো,
একটি খবর আইলো।
কী খবর আইলো,
রাজা একটি বালিকা চাইলো।
কোন্ বালিকা চাইলো,
আরতি বালিকা চাইলো,
নিয়ে যাও, নিয়ে যাও,
দিয়ে যাও দিয়ে যাও বালিকাকে—।

(২)

আম পাতা জোড়া জোড়া,
মারবো চাবুক চড়ব ঘোড়া।
ওরে বিবি সরে দাঁড়া,
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া খেপেছে,
বন্দুক ছুড়ে মেরেছে।
অলরাইট ভেরি গুড
মেম খায় চা বিস্কুট।।

ধাঁধা

যখন কেউ কোনো ধাঁধার উত্তর জানতে চায় তখন উত্তরদাতার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ভাষা ও শব্দের উপর দখল এবং ব্যাপকভাবে জীবন সম্বন্ধে গভীর ও ব্যাপ্ত জ্ঞানের পরীক্ষাই তখন তার কাছে কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু ধাঁধার সৃষ্টি ও বিবর্তনের ইতিহাস আরও বর্ণময় এবং রহস্যজনক। ইংরাজি 'riddle' বা 'enigma' শব্দদুটির বিশ্লেষণে একটি চমকপ্রদ দিক ফুটে ওঠে। প্রাচীন ইংরাজি ক্রিয়ামূল 'raedan' থেকেই পরবর্তী সময়ে এসেছে ইংরেজি 'rede' বা জার্মান 'rat(n)en' এবং প্রাচীন গ্রিক 'aineo' শব্দ থেকে এসেছে ল্যাটিন 'aenigma', ফরাসি 'enigme' বা ইংরাজি 'enigma' শব্দ। সর্বক্ষেত্রেই শব্দগুলির আদি অর্থ—উপদেশ প্রদান। সংস্কৃত 'প্রহেলিকা'

শব্দই আধুনিক হিন্দি বা উর্দুতে 'পহেলি' এবং বাংলায় 'হেঁয়ালি' শব্দের রূপ নিয়েছে। সিলেট অঞ্চলে ধাঁধাকে বলা হয় 'পই', টাংগাইলে 'শিলোক' বা 'ঠল্লুক'। কিন্তু শুধু উপদেশ প্রদানের কামনাই নয়, ধাঁধার সঙ্গে যুক্ত আছে আরও গভীরতর অভিপ্রায়। জেমস্ জর্জ ফ্রেজার তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত 'The Golden Bough' বইতে দেখিয়েছেন যে গোটা পৃথিবীতেই আদিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ধাঁধার সঙ্গে মন্ত্র বা ম্যাজিকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বিশ্বাস করে। পারসি 'ম্যাজি' (পুরোহিত)-শব্দ থেকে এসেছে ম্যাজিক শব্দ, যার অর্থ প্রাকৃতিক বা দৈহিক দৈব-দুর্বিপাককে বিদূরিত করার করণকৌশল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এখনও বৃষ্টি আবাহনে, বীজরোপণ বা ফসলের মরসুমে, দৈব-দুর্বিপাকে, বন্যায়-দুর্ভিক্ষে, বিবাহে কিংবা প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধাঁধা জিজ্ঞেস করার এবং উত্তর দেওয়ার প্রথা আছে। বিশ্বাস, ধাঁধার উত্তর দিতে পারলে আপদ-বালাই দূর হবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনও সুখসমৃদ্ধিময় হয়ে উঠবে। এই অর্থে আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত ধাঁধা বা হেঁয়ালিগুলির বীজ নিহিত রয়েছে মানুষের একসময়ের বিশ্বাস ও আচরণের সর্বপ্রাণবাদ ও সমপ্রক্রিয়ার ম্যাজিকের ধারণায়। তবে কি না সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাশভঙ্গি বদলেছে। অ্যান্ড্রু ল্যাং বলেন, "They (riddles) were very ancient and had been handed down, with a gradual refining, from ages of savagery to ages of civilization". [Andrew Lang, Introduction to Cox. Ciuderella. pp-xiff; op, cit. Thoepson, The Folletales. p. 322]। ধাঁধাগুলি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাহিত হয়, স্মৃতিধার্য হয়ে ওঠে এবং বহু শতাব্দী ধরে টিকে থাকে। স্মরণে রাখার সুবিধের জন্যেই তা ক্রমে সংক্ষিপ্ত, সরস ও চমকপ্রদ হয়ে ওঠে এবং কথা বা প্রবাদের মতোই মানুষের সমষ্টিগত ও সুবিন্যস্ত চিন্তনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় প্রকাশভঙ্গিমার মর্যাদা পায়। তবে ধাঁধার মৌখিক রূপের মতোই তার লিখিত নিদর্শনও কিছু কম প্রাচীন নয়। খ্রি. পূ. ১০০০ বছরের সময়ে রচিত ঋগ্বেদেও ধাঁধার নিদর্শন আছে। 'বৎসরকে' বেদ-গ্রন্থগুলিতে বহুস্থলেই 'দ্বাদশ শলাকাবিশিষ্ট চক্র' বলা হয়েছে। পারস্যের কবি ফিরদৌসির 'শাহ্নামা' গ্রন্থেও এই ধাঁধার উল্লেখ আছে। মহাভারতেও প্রচুর ধাঁধার নমুনা রয়েছে। বকরূপী ধর্মের যুধিষ্ঠিরকে করা প্রশ্ন সর্বাগ্রে মনে আসবে। গ্রিস দেশের থিব্সে রাজা অয়দিপাউসকে করা স্ফিংক্সের প্রশ্নও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই ধাঁধাটি আশ্চর্যজনক মনে হলেও একই রূপে বাংলাভাষাতেও রয়েছে।

সকালবেলা চারপায়ে হাঁটে
দুপুরবেলায় দুই পায়ে হাঁটে
বিকালবেলায় তিন পায়ে হেঁটে
দেশে চলে বাবাজি। —(উত্তর : মানুষ)

কথিত আছে খ্রিস্ট পূর্ব নবম শতকে গ্রিক মহাকবি হোমার জোঁক-সম্বন্ধীয় একটি ধাঁধার উত্তর না দিতে পেরে লজ্জায় প্রাণত্যাগ করেন। আরব দেশেও চতুর্দশ শতকের হাজি খলিফা বা বসোরা অঞ্চলের আল হারিরি উৎকৃষ্ট ধাঁধার জন্য সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছিলেন। আরব্য উপন্যাস, ইহুদি গ্রন্থ, বাইবেল, স্পেনীয় ক্রবাদুর সাহিত্য, পারস্য সাহিত্য—সর্বত্রই ধাঁধার অজস্র নমুনা পাওয়া যাবে। পারস্য সাহিত্যে কবি ফিরদৌসির 'জাল' এবং আরব্য সাহিত্যের 'বাদশা সোলেমান ও রানি বিলকিসের ধাঁধা' বিশেষ উল্লেখ্য, একাদশ শতাব্দীতে লিখিত সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে'ও রাজা বিনীতমতির ধাঁধার উত্তর না দিতে পারায় রাজকন্যার আত্মসমর্পণের কাহিনি পাওয়া যায়। বস্তুত কঠিন ধাঁধার উত্তর দিয়ে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্বলাভ কিংবা পণ্ডিতরা অসমর্থন হওয়ার পরে এক অশিক্ষিত মানুষের কঠিন ধাঁধার উত্তর দিয়ে ফেলা অথবা কঠিন হেঁয়ালির উত্তর প্রদানে রাজপুত্রকে রাজকন্যার গোপনে সাহায্য—গোটা পৃথিবীর কথাসাহিত্যেই এই মোটিফগুলি খুব

জনপ্রিয়। বলা বাহুল্য কথা ও প্রবাদের মতোই বহু ধাঁধাও বিশ্বজনীন। ধাঁধাগুলি এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিভ্রমণ করেছে না পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের চিন্তার সাযুজ্যই এর কারণ, তা এককথায় বলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও চর্যাপদ-সহ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থেও ধাঁধার ব্যবহার সুপ্রচুর। আগের কথার রেশ ধরেই বলা যায়, এই সব ধাঁধার অনেকগুলিই পৃথিবীর অন্যত্রও প্রচলিত থাকতে দেখা যাবে। চণ্ডীমঙ্গলের বাকশক্তিসম্পন্ন শুকপাখির ধাঁধা—

বিধাতা নির্মাণ ঘরে নাহিক দুয়ার।
তাহাতে পুরুষ এক বৈসে নিরাহার।।

যখন পুরুষবর হয় বলবান।
বিধাতা সৃজন ঘর করে খান্ খান্।। — (উত্তর : ডিম)

পারস্য ভাষার 'তুতীনামা'-র তোতাকেও এই একই ধাঁধা বলতে দেখা যাবে। ড. আশরাফ সিদ্দিকী দেখিয়েছেন,

বন থেকে বেরুল টিয়ে।
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।।

—ধাঁধাটি সামান্য কথাভেদে চব্বিশ পরগনা, ঢাকা আর চট্টগ্রামে 'আনারস', পাবনা, রাজশাহিতে 'কলার থোড়'; বীরভূম, মুরশিদাবাদে 'পেঁয়াজ' এবং টাঙ্গাইলে 'লাঙলের ফাল'—অর্থে প্রচলিত রয়েছে। আরও আশ্চর্য এই যে, এই ধাঁধাটিই ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, আয়ার্ল্যান্ড এবং আমেরিকার নানা অংশে কখনও 'পাখি' কখনও 'শিকারি', কখনও বা 'সন্ন্যাসীর' উপমায় উপস্থিত হয়েছে।

প্রচলিত ও লৌকিক ধাঁধাগুলি কখনো-কখনো ছন্দোমাধুর্যে পরম রমণীয় হয়ে ওঠে।

থাল ঝন্ ঝন্ থাল ঝন্ ঝন্ থাল নিল চোরে।
বৃন্দাবনে আগুন লাগলো কে নিভাইতে পারে।। —(উত্তর : রোদ)

কখনও তা প্রবল আক্রমণাত্মক ও অপমানজনক,

কান্দার উপর কান্দা।
যে না ভাঙ্গাইতে পারে তার বাপ ভাই সহ বান্দা।। —(উত্তর : কলার ছড়ি)

কখনও বা মাত্র দুটি-তিনটি লাইনে বিরাট মহাজাগতিক একটি ছবি আঁকা হয়ে যায়।

রাজার বেটা মরিয়া রইছে, দেখিবার নাই।
রাজার উঠান পরিয়া রইছে, ঝাড়িবার নাই।
হাজার ফুল ফুটিয়া রইছে, তুলিবার নাই। —(উত্তর : চাঁদ, আকাশ, তারা)

কখনও বা তা গভীর দার্শনিকতার ইঙ্গিতবাহী।

উঠতে সূর্য নমস্কার।
পড়তে সূর্য নমস্কার।।

এই ধাঁধার উত্তর, কলার থোড়। সূর্যের দিকে মুখ করে যার জন্ম, বৃদ্ধি, বংশবিস্তার—মৃত্যুও তার তেমনই সূর্যমুখী, প্রায় একটি জাপানি ছবির মতোই মিতায়তনিক ও সংহত এই দুটি পঙ্‌ক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয় জীবনের সংক্ষিপ্ততা ও অসারতা এবং মৃত্যুর অমোঘ বাস্তবতাকে। এইভাবেই আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ধাঁধাগুলি। পুরনো অনেক ধাঁধাই হারিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু সময় নিজস্ব দাবিতে নতুন নতুন ধাঁধার জন্মও দিচ্ছে, দেখা যাক তোমাদের প্রজন্মের এথিকাল হ্যাকাররা সেইসব ধাঁধা ক্র্যাক্ করতে পারো কি না। ধাঁধার বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ এবং কিছু ধাঁধার ফিরিস্তি দেওয়া রইলো; তোমাদের অঞ্চলে প্রচলিত ভিন্ন কোনো ধাঁধা যদি খুঁজে পাও তবে তোমরাই লিস্টটা আর একটু বড়ো করে তুলতে পারবে।

জীব-জন্তুর সঙ্গে তুলনা :

১. ছোট্ট প্রাণী হেঁটে যায়
আস্ত পা-টা গিলে খায়।—জুতো

২. মুখ নাই কথা বলে
পা নাই হেঁটে চলে।—ঘড়ি

৩. সব কিছু পেরিয়ে যায়
নদীর কাছে গিয়ে ভিরমি খায়।—পথ

পাখির সঙ্গে তুলনা :

বেলে হাঁসে আড্ডা পাড়ে
কে কতটি গণতে পারে?—তারা

জন্তুর সঙ্গে তুলনা :

বাড়িতে আছে কাঠের গাই
বছর বছর দুধ খাই।—খেজুর গাছ

লোকের সঙ্গে তুলনা :

১. একটু খানি গাছে
রাঙা বউটি নাচে।—মরিচ

২. এক মায়ের দুই ছেলে
কেউ কাউকে দেখতে নারে।—চক্ষু

গাছের সঙ্গে তুলনা :

এক হাত লম্বা গাছটা
ফল তাতে পাঁচটা।—হাত ও আঙ্গুল

কোনো বস্তুর সঙ্গে তুলনা :

১. ঘর আছে দরজা নাই
মানুষ আছে কথা নাই।—ডিম

২. আল্লার কি কুদরৎ
লাঠির মধ্যে সরবৎ।—ইক্ষু

কার্যাবলির সঙ্গে তুলনা :

১. আমার আছে তোমার আছে
বাবার আছে তাহার আছে
দাদার আছে দিদির আছে
তবু ত পাঁচ মিনিটের বেশি রাখার সাধ্য নাই।—শ্বাসপ্রশ্বাস

২. সাগরেতে জন্ম তার লোকালয়ে বাস
মায়ে ছুঁলে পুত্র মরে একি সর্বনাশ।—লবণ

পরস্পর বৈপরীত্যের আরোপ :

হাত নাই পাও নাই দেশে দেশে ঘুরে
তার অভাব হলে লোক অনাহারে মরে।—টাকা

পরিশিষ্ট : এক

প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)

- সটীক অনুবাদ
- সাক্ষাৎকার গ্রহণ
- প্রতিবেদন রচনা
- স্বরচিত গল্পলিখন

প্রদত্ত চারটি বিষয়ের মধ্যে যে-কোনো একটি তোমায় বেছে নিতে হবে একাদশ শ্রেণির জন্য। প্রতিটি বিষয়ে আলাদা আলাদা করে বিস্তৃত পরামর্শ, নমুনা (দুটি ক্ষেত্রে) ও নির্দেশিকা দেওয়া হল, তোমাদের বোঝার সুবিধের জন্য। তবে নমুনাগুলি আদর্শ হিসেবে বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করবে। কখনোই আদর্শটিকে অনুকরণ করতে যেয়ো না। প্রকল্পের নির্বাচন থেকে খাতায় চূড়ান্ত রূপদান পর্যন্ত, এর প্রতিটি ধাপেই তোমার স্বকীয়তার প্রতিফলন ঘটবে। তাই নিজের চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা, সৃষ্টিশীলতা এসবেরই মৌলিক বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চেষ্টা করো প্রকল্পের খাতায়। প্রকল্প তৈরি করার সময় যে-কোনো স্তরে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সক্রিয় সাহায্য ও পরামর্শ নেবে। আবার প্রকল্পের খাতা জমা নেওয়ার সময় শিক্ষিকা/শিক্ষক মহাশয়া মহাশয় তোমার প্রকল্প খুঁটিনাটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই মূল্যায়ন সম্পূর্ণ করবেন, তাই সে বিষয়ে প্রস্তুত থাকতেও ভুলো না।

প্রকল্প—বিষয় (১) [মূল ভাষা থেকে অনুবাদ করতে হবে। ১০০০-৩০০০ শব্দের মধ্যে। সময়সীমা ৬ মাস। অনুবাদ করা যাবে (ক) প্রবন্ধ, (খ) চিঠি, (গ) সাক্ষাৎকার, (ঘ) ঐতিহাসিক নথি, (ঙ) গল্প এবং (চ) নাটক। লেখক এবং লেখা সম্পর্কে টীকাসহ অনুবাদটি করতে হবে]

সটীক অনুবাদ :

ছোটোবেলা থেকেই আমরা মাতৃভাষায় গল্প, কবিতা, ছড়া, চিঠি অন্যদের কাছে শুনি বা পড়ে থাকি। এরপর আস্তে আস্তে ইংরাজি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষা শিখে যাওয়ার পর, সেই সমস্ত ভাষায় লেখা গল্প, কবিতা প্রভৃতির সঙ্গেও পরিচিত হই। অন্যান্য ভাষায় লেখা সাহিত্যের ভাষার বর্ম ভেদ করতে পারলে, তার ভাব বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না। কেননা চিরায়ত সাহিত্যের আবেদন বিশ্বজনীন। যদিও দেশ-কাল-সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ভাষা এসবের ব্যবধান থাকে। কিন্তু সব দেশে সবকালে প্রকৃতির সৌন্দর্য, ব্যাপ্তি এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন-পদ্ধতি ও বেঁচে থাকার আবেগ প্রকাশের অনুভূতিতে এমন এক অন্তর্লীন সামঞ্জস্য রয়েছে, যা ভাষাভেদেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আর এইজন্যই বহুদূর দেশের গল্প, কবিতা বা ছড়া অনায়াসে আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায়, আমাদের আলোড়িত করে। ধরো সকলের জানা এই ছড়াটি—

Twinkle Twinkle little star,

How I wonder what you are!

Up above the World so high

Like a diamond in the sky;

—এ আমাদের বেশ প্রিয়! পড়তে পড়তেই ছোটোবেলার সেই সুর, তাল, লয় যেন মনের মধ্যে আবেশ সৃষ্টি করে। এই আবেশে যদি লিখে ফেলি—'ঝিকমিক ঝিকমিক ছোট্ট তারা,/তুমি যে কেমন আমি ভেবেই সারা!/ অনেক ওপরে এই পৃথিবী পেরোলে/হিরের টুকরো যেন আকাশে জ্বলে!' লক্ষ করে দ্যাখো নিজের ভাষায় ওই ছড়াটিকে আমরা আরও নিজের বলে ভাবতে পারি এবং নতুন করে আবিষ্কার করি। এটাই অনুবাদের আনন্দ। অনুবাদ এভাবেই অপেক্ষাকৃত দূরের বিষয়কে আমাদের জন্য সরস, কাছের বিষয়ে রূপান্তরিত করে। আমাদের প্রিয় ও পছন্দের সাহিত্যকীর্তিকে নতুন করে বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এছাড়া অনুবাদের আর একটা দিক হল এর মাধ্যমে অপরিচিত কিংবা স্বল্প পরিচিত অঞ্চল বা দেশের সমাজ-ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। আর এখানেই আসে সটীক অনুবাদের প্রসঙ্গ। সটীক বা টীকাসহ বলতে কী বোঝায়? একটু স্পষ্ট করে বলি।

যে-কোনো ভাষার গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা অর্থাৎ সাহিত্য হল সেই দেশের সমাজ-ইতিহাস ও সংস্কৃতির ফসল। তাই সেই সাহিত্যে এমন অনেক ব্যক্তি, বিষয়, প্রসঙ্গ এসে উপস্থিত হয় যা অনেকেরই অজানা। অনেকক্ষেত্রে আমাদের কাছেও সম্পূর্ণ অপরিচিত। তখন সেগুলিকে স্পষ্ট করে জানার বা বোঝার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের অভিধান ও সহায়ক বইয়ের সাহায্য নিতে হয়। তারপরে আমরা পুরোটা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করতে পারি। যে-কোনো ভালো অনূদিত বইয়ে দেখবে এইসব বিষয়, ব্যক্তি, প্রসঙ্গ সম্পর্কিত শব্দ বা শব্দসমূহের পাশে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা চিহ্নিত থাকে এবং অধ্যায় বা বইয়ের শেষে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাসহ শব্দ বা শব্দসমূহের পাশে সংক্ষিপ্ত বিবরণ

লেখা থাকে। যা পড়ে আমরা অজানা বিষয়গুলি জেনে নিয়ে, স্পষ্ট ধারণা লাভ করি। এইজন্য অনুবাদ সবসময় সটীক হওয়া প্রয়োজন। সটীক অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমাদের যা যা করা উচিত—

- মূল থেকে অনুবাদ করার অর্থ, যে ভাষায় গদটি লেখা সেই ভাষাটি আমায় জানতে হবে। সেক্ষেত্রে ইংরাজি, হিন্দি প্রভৃতি আমার জানা ভাষার কোনো পছন্দের গদ্য আমি নির্বাচন করব। তা পাঠ্যবইয়ের হলেও চলবে। গদ্যের অনূদিত অংশ টীকাসহ ন্যূনতম শব্দসংখ্যা যেন পূরণ করে।

- দীর্ঘ রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে তাকে সংক্ষিপ্ত করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে সুষ্ঠু সম্পাদনার প্রয়োজন। যাতে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে মূল ভাবের বিকৃতি না ঘটে বা অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট না হয়। তাই এ সমস্যা এড়ানোর জন্য পরিমিত আয়তনের গদ্য নির্বাচন করাই শ্রেয়।

- মাধ্যমিক স্তরে বঙ্গানুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) করায় তোমরা মূল ভাষা থেকে আক্ষরিক অনুবাদ কিংবা ভাবানুবাদ করার ব্যাপারটি জানো। এই স্তরে যেহেতু সাহিত্যের অংশ অনুবাদ করতে হবে, তাই মূলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা যেমন জরুরি, তেমনই ভাবনার বিশুদ্ধতা রক্ষা করার প্রতিও সচেতন থাকতে হবে। আমরা চেষ্টা করব এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে।

- প্রতিটি ভাষার নিজস্ব বিশিষ্টতা, সৌন্দর্য ও মাধুর্য আছে। তা অন্য ভাষার থেকে আলাদা। তাই যে কোনো ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার সময় আমরা বাংলা ভাষার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য অনুসারেই অনুবাদ করব।

- প্রাথমিকভাবে যে ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করব, সেই ভাষায় লেখা কিছু ছড়া বা টুকরো গদ্যের অংশ অনুবাদ করে বিষয়টিকে রপ্ত করব। এইভাবে কিছুদিন চর্চা করে শিক্ষিকা/শিক্ষকের পরামর্শ নেব। প্রয়োজনীয় ভুল-ত্রুটি শুধরে নেব। তারপর আমার নিজের নির্বাচিত পছন্দের গদ্যাংশ অনুবাদে হাত দেব। প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন অভিধানের সহায়তা নেব। প্রথম খসড়া তৈরি করে শিক্ষিকা/শিক্ষককে (মূল রচনাটি সহ) দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ নেব। এইভাবে পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে চূড়ান্ত খসড়া তৈরি হবে।

- প্রথম খসড়া তৈরি করার সময়েই অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত বিষয়, ব্যক্তি বা প্রসঙ্গের সংখ্যাসহ তালিকা প্রস্তুত করে নেব। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বই ও অভিধানের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তৈরি করব। যা টীকার আকারে অনুবাদের শেষে যুক্ত করতে হবে। একইসঙ্গে মূল ভাষায় লেখাটি যে লেখকের তাঁরও পরিচিতি দিতে হবে।

- সবসময়ে সব অনুবাদের ক্ষেত্রেই বিস্তৃত টীকার প্রয়োজন ঘটে না। তাই টীকার বিষয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

- অনুবাদটি যেন সরস ও সুপাঠ্য হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। একই সঙ্গে মূল পাঠের বিশুদ্ধতাও বজায় রাখতে হবে। এই দুটি গুণ রক্ষিত হলে অনুবাদ হবে সার্থক এবং অনুবাদক ও পাঠকের কাছে আনন্দদায়ক।

- প্রকল্পের খাতায় মূল ভাষার পাঠটির পাতার পাশেই থাকবে অনূদিত পাঠের পাতা। আর শেষে লেখক পরিচিত এবং প্রাসঙ্গিক টীকা সমূহ। প্রথমে কোনো সংক্ষিপ্ত ভূমিকার প্রয়োজন হলে (শিক্ষিকা/শিক্ষকের বিবেচনা অনুসারে) তাও লিখতে হবে। ভূমিকায় গদ্যটি নির্বাচনের কারণ, গদ্যের বিষয় প্রভৃতি দিক-নির্দেশ থাকতে পারে।

- তোমাদের বোঝার আরও সুবিধার জন্য মূল পাঠ-সহ এমনই দুটি গদ্যের সটীক অনুবাদ তোমাদের জন্য দেওয়া হল—

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক G. K. Chesteston-এর *'ON LYING IN BED' প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্ত ও সম্পাদিত মূল লেখাটি প্রথমে রইল এবং তার পরে এই অংশের বাংলা অনুবাদ।*

G. K. Chesterton

ON LYING IN BED

Lying in bed would be an altogether perfect and supreme experience if only one had a coloured pencil long enough to draw on the ceiling. ... To that purpose, indeed, the white ceiling would be of the greatest possible use; in fact it is the only use I think of a white ceiling being put to.

But for the beautiful experiment of lying in bed I might never have discovered it. For years I have been looking for some blank spaces in a modern house to draw on. ... I examined the walls; I found them to my surprise to be already covered with wall-paper, and I found the wall-paper to be already covered with very uninteresting images. ... Everywhere that I went forlornly with my pencil or my paint brush, I found that others had unaccountably been before me, spoiling the walls, the curtains, and the furniture with their childish and barbaric designs.

* * * *

Nowhere did I find a really clear space for sketching until this occasion when I prolonged beyond the proper limit the process of lying on my back in bed. ... I am sure that it was only because Michaelangelo was engaged in the ancient and honourable occupation of lying in bed that he ever realised how the roof of the Sistine Chapel might be made into an awful imitation of a divine drama that could only be acted in the heavens.

Misers get up, early in the morning and burglars, I am informed, get up the night before. It is the great peril of our society that all its mechanism may grow more fixed while its spirit grows more fickle. A man's minor actions and arrangements ought to be free, fiexible, creative; the things that should be unchangeable are his principles, his ideals. But with us the reverse is true; our views change constantly; but our lunch does not change. Now, I should like men to have strong and rooted conceptions, but as for their lunch, let them have it sometimes in the garden, sometimes in bed, sometimes on the roof, sometimes in the top of a tree. ... A man can get used to getting up at five o'clock in the morning. A man cannot very well get used to being burnt for

his opinions; the first experiment is commonly fatal. Let us pay a little more attention to these possibilities of the heroic and the unexpected. I dare say that when I get our of this bed I shall do some deed of a almost terrible virtue.

For those who study the great art of lying in bed there is one emphatic caution to be added. Even for those who can do their work in bed (like journalists), still more for those whose work cannot be done in bed (as, for example, the professional harpooners of whales), it is obvious that the indulgence must be very occasional. But that is not the caution I mean. The caution is this: if you do lie in bed, be sure you do it without any reason or justification at all. I do not speak, of course, of the seriously sick. But if a healthy man lies in bed, let him do it without a rag of excuse; then he will get up a healthy man.

বিছানায় শুয়ে থাকা প্রসঙ্গে

জি. কে. চেস্টারটন[১]

সিলিঙে ছবি আঁকার জন্য যদি একটা রঙিন, লম্বা পেনসিল থাকতো, তাহলে বিছানায় শুয়ে থাকাই হয়ে উঠতো সবচেয়ে নিখুঁত এবং উচ্চমানের অভিজ্ঞতা।... এভাবেই ছাদের সাদা সিলিঙকে সবচেয়ে আনন্দময় করে তোলা যায়, আর সত্যি বলতে গেলে; সিলিঙের ব্যবহারিক সম্ভাবনা একমাত্র এটাই বলে মনে হয়।

আমার যদিও বিছানায় শুয়ে থাকার আমুদে অভিজ্ঞতা না থাকলে, আমি এই সত্য আবিষ্কার করতে পারতাম না। তাই বেশ কিছু বছর ধরে ছবি আঁকার জন্য, আমি একটি নতুন বাড়ির ফাঁকা দেয়াল খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। দেয়ালগুলো পেয়ে খুঁটিয়ে দেখে অবাক হলাম সব ইতিমধ্যেই অজস্র আকর্ষণ-হীন সচিত্র কাগজের আস্তরণে ঢাকা পড়েছে।... সর্বত্র আমি অভাগার মতো তুলি পেনসিল নিয়ে গিয়ে দেখি, আমার আগেই অন্যেরা দেয়াল, পর্দা, আসবাব এইসব নিজেদের শিশুসুলভ ও অসভ্য কারুকার্যে ভরিয়ে সম্পূর্ণ নষ্ট করে বসে আছে।

* * * *

সত্যিই কোথাও আমি ছবি আঁকার একটা প্রকৃতই পরিষ্কার জায়গা খুঁজে পেলাম না যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজের বিছানায় শুয়ে থাকার যে সময়সীমা, সেটাকে আরও দীর্ঘায়িত করলাম।... এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম মাইকেল অ্যাঞ্জেলো[২] শুধুমাত্র বিছানায় শুয়ে থাকার মতো আদিম এবং সম্মানীয় পেশার সঙ্গে জড়িত থাকার ফলেই উপলব্ধি করেছিলেন, কীভাবে সিস্টিন চ্যাপেলের[৩] ছাদটাকে স্বর্গীয় নাটক কিংবা স্বর্গেই ঘটতে পারে এমন সম্ভাবনাময় নাটকের জন্য ব্যবহার করা যায়।

কিপটেরা খুব সকালেই ঘুম থেকে ওঠে, আবার শুনেছি চোরেরা নাকি উঠে পড়ে রাত থাকতেই। আমাদের সমাজের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক এটাই সামাজিক ব্যবস্থাগুলি যতই দৃঢ় হয়, সমাজ-মানস ততই অস্থির হতে থাকে। মানুষের এইসব তুচ্ছ কার্য-কলাপ এবং তার বিন্যাস মুক্ত, নমনীয় এবং সৃষ্টিশীল হওয়াই উচিত, বরং যা অপরিবর্তনীয় তা হলো মানুষের নীতি ও আদর্শ। কিন্তু সাধারণত এর উল্টোটাই ঘটে। তাই আমাদের দুপুরের খাওয়ার সময়ের কোনো বদল ঘটে না অথচ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি প্রতিনিয়তই বদলে যায়। তবে আমি অবশ্যই চাই মানুষের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির শেকড় যাতে গভীর এবং সুদৃঢ় হয়, বরং তাঁরা দুপুরের খাবার, কখনও বাগানে বা বিছানায় কিংবা ছাদে; আবার কখনও গাছের মগডালে চেপেও সারতে পারে।... একজন

মানুষ অনয়াসে ভোর পাঁচটায় ওঠা অভ্যেস করতে পারে। কিন্তু একজন মানুষ কখনই নিজের মতামতের জন্য আগুনে পুড়ে যাওয়া অভ্যেস করতে পারে না, কেননা এ বিষয়ে প্রথম পরীক্ষাই তার মরণোন্মুখ শেষ পরীক্ষায় পর্যবসিত হবে। এবার কিছু অপ্রত্যাশিত ও নায়কোচিত সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাক তাহলে। আমার মনে হচ্ছে; আমি এই বিছানা থেকে উঠে পড়লে সাংঘাতিক ভালো কিছু করে ফেলতে পারি।

এখন যাঁরা বিছানায় শুয়ে থাকা নামক মহৎ শিল্পে মনোনিবেশ করতে চান, তাঁদের উদ্দেশে একটি জোরালো সাবধানবাণী সংযোজন করা প্রয়োজন। এমনকি সেইসব মানুষেরা যাঁরা বিছানায় থেকেও নিজেদের কাজ করতে পারেন (যথা সাংবাদিককুল), যাঁরা বিছানায় থেকে কোনোভাবেই কাজ করতে পারেন না (তথা হারপুন চালিয়ে সমুদ্রে শিকার করেন যাঁরা); স্পষ্টতই তাঁদের কদাচিৎ এই প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঠিক এ ধরনের সাবধানবাণী আমি শোনাতে চাইছি না। সাবধানবাণীটি হলো এরকম : যদি অকারণ বিছানায় শুয়ে থাকো, সেটাকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করতে যেও না। অবশ্যই খুব অসুস্থ মানুষদের কথা আমি এখানে বলছি না। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কোনো সুস্থ সবল মানুষ বিছানায় শুয়ে থাকার পেছনে যদি কোনো ফালতু অজুহাত খাড়া না করে, তাহলে সে স্বাস্থ্য সমেত তাঁর শয্যা ত্যাগ করে।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. [লেখক পরিচিতি] জি. কে. চেস্টারটন : (জন্ম : লন্ডন ২৯ শে মে ১৮৭৪, মৃত্যু ১৪ই জুন ১৯৩৬) ইংরাজি সাহিত্যের একজন কৃতী লেখক। এছাড়া সাংবাদিকতাও করেছেন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস সবেতেই সমান দক্ষ। আর্থার কোনান ডয়েলের সঙ্গে পাশ্চাত্যে গোয়েন্দা গল্পের প্রথম রূপকারদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর গোয়েন্দা গল্প-মালা-ফাদার ব্রাউন নামক এক পাদ্রিকে ঘিরে, যা এখনও জনপ্রিয়। সমালোচকদের মতে চেস্টারটনের লেখায় স্প্যানিশ লেখক সার্ভান্ত ও ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের প্রভাব আছে। 'The innocence of Father Brown', 'The ballad of white horse' তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই।

২. মাইকেল অ্যাঞ্জেলো : (জন্ম ১৪৭৫, মৃত্যু ১৫৬৪) কালজয়ী ইতালিয়ান শিল্পী ও ভাস্কর। রেনেসাঁর সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ইতালির বিভিন্ন জায়গায় তাঁর তৈরি ভাস্কর্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। 'পিয়েতা', 'ব্যাকাস', 'ম্যাডোনা অ্যান্ড দ্য চাইল্ড', 'ডেভিড' প্রভৃতি ভাস্কর্যগুলি আজও আমাদের বিস্মিত করে। সিস্টিন চ্যাপেলের ছাদে তিনি বাইবেলের কাহিনি এঁকেছেন, যা দেখতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এখনও রোমে যান।

৩. সিস্টিন চ্যাপেল : রোমের ভ্যাটিকান সিটিতে অবস্থিত ছোট্ট খ্রিস্টীয় ভজনালয়। এটি ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। এর ছাদে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বাইবেলের কাহিনি এঁকেছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পীদের অলঙ্করণও সিস্টিন চ্যাপেলের দেয়ালে আছে।

৪. হারপুন : সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি শিকার করার জন্য ব্যবহৃত বর্শার মতো ধারালো অস্ত্রবিশেষ।

হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার মুন্সি প্রেমচন্দের ***'बड़े भाइ साहेब'*** *গল্পটির মূল লেখার সঙ্গে রইল তার বাংলা অনুবাদ।*

बड़े भाई साहब

—मुन्सी प्रेमचन्द

मेरे भाई साहब मुझसे पाँच साल बड़े थे, लेकिन केवल तीन दरजे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरु किया था; जब मैंने शुरु किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसन्द न करते थे। इस भवना की बुनियाद को खूब मजबूत बनाना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। एक साल का काम दो साल में करते थे। कभी-कभी तीन साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने?

मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र नौ साल की थी, वह चौदह साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा, जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून सो समझूँ।

वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तसवीरें बनाया करते थे। कभी-कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य दस बीस बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार-बार सुन्दर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द-रचना करते, जिसमें न कोई सामंजस्य होना। मसलन एक बार उनकी कापी पर मैंने यह इबारत देखी—स्पेशल, अमीना, भाइयों-भाइयों, दरअसल, भाई-भाई, राधेश्याम, श्रीयुत् राधेश्याम, एक घंटे तक-इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का अर्थ निकालूँ लेकिन असफल रहा, और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह नवीं जामात में थे, मैं पांचवीं में। उनकी रचनाओं को समझाना मेरे लिए छोटे मुँह बड़ी बात थी।

मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ सा था। मौका पाते ही होस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिला तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़ कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार, उसे आगे-पीछे चलाते हुए मोटरकार का आनंद उठा रहे हैं; लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देख कर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता-कहाँ थे? हमेशा यह सवाल उसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुँह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्द में मेरा सत्कार करें।

'इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, तो जिन्दगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आयेगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हँसी-खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो राम गैरा नत्थू खैरा भी सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ दिन-रात आँखें फोड़नी पड़नी है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं। और क्या है कहने आ जाती है। बड़े-बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने धोंधा हो कि मुझे देख कर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आँखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कुसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कुसूर है। इतने मेले-तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। हमेशा पढ़ता हूँ। उसपर भी एक-एक दरजे में दो-दो-तीन साल पड़ा रहता हूँ, फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यों खेल-कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो दो-तीन साल लगते हैं। तुम उम्र भर इस दरजे

में पड़े सढ़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवाँनी है, तो बेहतर है, घर चले जाओ, मजे से गुल्ली-डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपये क्यों बरबाद करते हो?

मैं यह लताढ़ सुनकर आँसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था अपराध तो मैनें किया, लताढ़ कौन सहे? भाई-सहब उपेदश की कला में निपुण थे। ऐसी'-ऐसी लगती बात कहते, युक्ति-बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े-टुकड़े हो जाते और हिम्मत टुट जाती। इस तरह, जान लगा कर मेहनत करने की शक्ति मैं करने न पाता था। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता-क्यों न घर चला जाऊँ। जो काम मेरे बूते से बाहर है, उसमें हाथ डाल कर क्यों अपनी जिन्दगी खराब करूँ। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और इरादा कहता कि आगे खूब जी लगा कर पढ़ूँगा। चटपट एक टाइम-टेबिल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाये, कोई स्कीम तैयार किये, काम कैसे शुरु करूँ? टाइम-टेबिल में खेल-कूद की मद बिलकुल उड़ जाती। प्रात: काल उठना, छ:बजे मुँह-हाथ धो, नाशता कर पढ़ने बैठ जाना। छ: से आठ तक अंग्रेजी, आठ से नौ तक हिसाब, नौ से साढ़े नौ तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। साढ़े तीन बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, चार से पाँच तक भूगोल, पाँच से छ: तक ग्रामर, आधा घंटा होस्टल के सामेन ही टहलना, साढ़े छ: हिन्दी, दस से ग्यारह तक विविध विषय, फिर विश्राम।

मगर टाइम-टेबिल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरु हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के-हल्के झोंके, फुटबाल की उछल-कूद, कबड्डी दाव-घात, वाली-बॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम-टेबिल वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फ़जीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भगाता, उनकी आँखों से हटने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बन्धन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल-कूद का तिरस्कार न कर पाता।

বড়দা

মুন্সি প্রেমচন্দ'

আমার দাদা আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো, কিন্তু পড়েন মাত্র তিন ক্লাস উপরে। তিনিও সেই বয়সে পড়া শুরু করেন, যখন আমি করি। কিন্তু বিদ্যার্জনের মহত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি তাড়াহুড়োর পক্ষপাতী নন। যার উপর তাঁর আকাশচুম্বী প্রসাদ দাঁড়াবে, সেই ভাবনার ভিতটিকে তিনি খুব শক্ত করে নিতে চান। এক বছরের কাজ তিনি দু'বছরে সারতেন। কখনো কখনো তিন বছরও নিতেন। ভিত মজবুত না হলে বাড়ি টেকসই হবে কী করে?

আমি ছোটো, বয়স ন'বছর, তিনি বড়ো বয়স চৌদ্দ। আমার বিষয়ে খেয়াল রাখা এবং নানা ব্যাপারে সাবধান করার পুরো অধিকার তাঁর ছিল। আর আমার ভদ্রতা ও সজ্জনতা এমনই ছিল, তাঁর আদেশকে আইন বলে মান্য করতাম।

তিনি প্রচুর পড়াশুনা করতেন। সব সময় বই খুলে বসে থাকতেন। সম্ভবত মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেবার জন্য কখনো খাতায় কখনো বইয়ের পাতার মার্জিনে পাখি, কুকুর, বেড়াল প্রভৃতির ছবি আঁকতেন। কখনো একটি নাম, একটি শব্দ অথবা বাক্য দশ-বিশ বার করে লিখে ফেলতেন। কখনো বা একটি শ্লোক সুন্দর অক্ষরে বার বার নকল করতেন। মাঝে মাঝে এমন বাক্য রচনাও করতেন যাতে না থাকত কোনো অর্থ আর না সামঞ্জস্য। উদাহরণ স্বরূপ—একবার তাঁর খাতায় লেখা পেলাম—'সাশাল, আমিনা, ভাই ভাই, দরঅসল (বাস্তবে), রাধেশ্যাম, শ্রীযুক্ত রাধেশ্যাম একঘণ্টা ধরে'—তারপর একজন মানুষের ছবি আঁকা। আমি অনেক চেষ্টা করেছি এই ধাঁধার রহস্য ভেদ করার, কিন্তু পারিনি। আর তাকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহসে কুলোয়নি। তিনি নবম শ্রেণির ছাত্র, আর আমি মাত্র পঞ্চমের।

তাঁর লেখার অর্থোদ্ধার আমার পক্ষে ছোটো মুখে বড়ো কথার সামিল। পড়াশুনায় আমার মন একেবারে বসতো না। বই নিয়ে ঘন্টা খানেক বসাও পাহাড় মনে হতো। সুযোগ পেলেই হস্টেলের বাইরে, মাঠে চলে যেতাম, কখনো কাঁকড় ছুঁড়তাম, কখনো কাগজের প্রজাপতি ওড়াতাম। কোনো বন্ধু পেয়ে গেলে তো কথাই নেই।—কখনো পাঁচিলে চেপে লাফাচ্ছি, কখনো গেটের সোয়ার হয়ে সামনে-পিছনে মোটর হাঁকিয়ে কানের আনন্দ লাভ করছি। কিন্তু কামরায় ঢুকে দাদার সেই রুদ্ররূপ দেখে প্রাণ শুকিয়ে যেত। তাঁর প্রথম প্রশ্নই হতো—''কোথায় ছিলে?'' সর্বদা এই প্রশ্নটি এই ধ্বনিতে উচ্চারিত হতো। আর তার জবাব হতো আমার মৌনতা। জানি না কেন আমার মুখ থেকে এটুকুও বেরতো না,—''বাইরে একটু খেলছিলাম।'' আমার মৌনভাবে বলে দিত যে, ''আমার অপরাধ স্বীকার করছি।'' স্নেহ ও রাগ মিশিয়ে আমাকে আদর করা ছাড়া দাদার কাছে আর কোনো ওষুধও ছিল না। ইংরেজি পড়লে সারাজীবন পড়তেই থেকে যাবে, অক্ষর পরিচয়ও হবে না। এইভাবে ইংরেজি পড়া কোনো হাসি তামাশা নয় যে, যার ইচ্ছা হবে সেই শিখে নেবে। তাহলে তো রাম-শ্যাম-যদু-মধু সবাই ইংরেজিতে পন্ডিত হয়ে যেত। দিন রাত চোখের পরিশ্রম ও রক্ত জল করতে হয়, তবে গিয়ে এ বিদ্যা আয়ত্ত হয়, আয়ত্ত কি হয়! হ্যাঁ, বলার মতো হয়ে যায়। বড়ো বড়ো পন্ডিতও শুদ্ধ ইংরেজি লিখতে পারেন না। বলা তো দূরের থাক। বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি কেমন আহম্মক যে আমাকে দেখেও শিখছো না। আমি যে কত পরিশ্রম করি তা তো তুমি নিজের চোখেই দেখছো, যদি না দেখো তো তোমার চোখের দোষ, তোমার বুদ্ধির দোষ। এতো মেলা হয়, তামাশা হয়, আমাকে কখনো কোথাও যেতে দেখেছো? ক্রিকেট ও হকির ম্যাচ তো লেগেই আছে। আমি পাশ দিয়েও যাই না। সব সময় পড়তে থাকি। তবুও এক এক ক্লাসে দু তিন বছর পড়ে থাকি। তা সত্ত্বেও তুমি কী করে আশা কর যে এইভাবে খেলাধুলো করে সময় কাটিয়ে পাশ করতে পারবে? আমার তো দু তিন বছরই লাগবে তুমি জীবনভোর এই ক্লাসেই পড়ে থাকবে। যদি তুমি এইভাবে জীবন কাটাতে চাও তো ভালো হয়—তুমি বাড়ি চলে যাও আর মনের আনন্দে ডাঙ্গুলি খেলো গিয়ে। বাবার কঠিন শ্রমে আয় করা টাকা কেন নষ্ট করছো? এই তিরস্কার শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। জবাব আর কী ছিল? অপরাধ করেছি আমি, বকুনি খাবে কে? দাদা ছিলেন উপদেশ দানের শিল্পে সুদক্ষ। এমন সব খোঁচাভরা কথা বলতেন, এমন এমন যুক্তিবাণ নিক্ষেপ করতেন যে আমার হৃদয়টা খান-খান হয়ে যেত। সব উৎসাহ ফুরিয়ে যেত। তাঁর মতো প্রাণপাত করে পড়াশুনার শক্তি আমার ছিল না, সেই নৈরাশ্যের মুহূর্তে মনে হতো বাড়ি চলে গেলেই হয়। যে কাজ আমার শক্তির বাইরে, তাতে হাত দিয়ে নিজের জীবন কেন নষ্ট করি। বরং মূর্খ থাকায় আমার সায় ছিল, কিন্তু ঐরকম পরিশ্রম? নৈব নৈব চ। আমার তো মাথা ঘুরে যেত। ঘণ্টা দু-ঘণ্টার পর নিরাশার মেঘ কেটে যেত, আমি নিশ্চিত করে নিতাম যে এবার খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করবো।

চটপট একটি রুটিন তৈরি করে নিতাম। প্রথমে কোনো খসড়া তৈরি না করে, কোনো স্কিম তৈরি না করে কাজ শুরু করবো কী করে? রুটিনে খেলা-ধুলার কোনো স্থান থাকত না। ভোরে উঠে ছ'টার মধ্যে হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে পড়তে বসে যাওয়া; উঠে ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত ইংরেজি, আটটা থেকে নয়টা গণিত, নয়টা থেকে সাড়ে নয়টা ইতিহাস, তারপর আহার ও বিদ্যালয়। সাড়ে তিনটেতে স্কুল থেকে ফিরে এসে আধ ঘন্টা বিশ্রাম। চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ভূগোল, পাঁচটা থেকে ছয়টা গ্রামার, আধঘণ্টা হোস্টেলের সামনে পায়চারি। সাড়ে ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত ইংরেজি কম্পোজিশন, তারপর আহার করে আটটা থেকে নয়টা পর্যন্ত অনুবাদ। নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত হিন্দি। দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত বিবিধ বিষয়। তারপর বিশ্রাম।

কিন্তু রুটিন তৈরি করা এক এবং তা মেনে চলা আর। প্রথম দিনই তার অবহেলা শুরু হয়ে যেত। মাঠের মনোরম শ্যামলিমা, বাতাসের স্নিগ্ধ মধুর স্পর্শ, ফুটবলের লাফালাফি, হাডুডু-র মারপ্যাঁচ, ভলিবলের সেই গতিপূর্ণ স্ফূর্তি—আমাকে অজ্ঞাত এবং অনিবার্যভাবে টেনে নিয়ে যেত। সেখানে পৌঁছেই আমি সবকিছু ভুলে যেতাম। সেই প্রাণঘাতী রুটিন, সেই চোখ নষ্ট করা বই—কোনো কিছুই মনে থাকত না। আর তার ফলে বড়দাও তিরস্কার এবং উপদেশ দানের সুযোগ পেয়ে যেতেন। আমি তাঁর সঙ্গ এড়িয়ে চলতাম, তাঁর দৃষ্টি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতাম। ঘরে এমনভাবে পা-টিপে টিপে ঢুকতাম যেন টের না পান। তিনি চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেই আমার প্রাণ উড়ে যেত। মনে হতো যেন একটা খোলা তলোয়ার সব সময় মাথার ওপর ঝুলছে। তা সত্ত্বেও যেমন মৃত্যু ও বিপদের মাঝখানেও মানুষ মায়া ও মোহের বন্ধনে জড়িয়ে থাকে আমিও তিরস্কার ও শাসানি সহ্য করেও খেলাধুলো চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

(কৃতজ্ঞতা : রামবহাল তেওয়ারি)

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. [লেখক পরিচিতি] মুন্সি প্রেমচন্দ : (জুলাই ৩১, ১৮৮০—অক্টোবর ৮, ১৯৩৬) প্রকৃত নাম ধনপৎরাই শ্রীবাস্তব। প্রথমে লিখতেন 'নবাব রাই' নামে, পরে প্রেমচন্দ নামে লিখে খ্যাতি পান। জন্ম বেনারসের কাছে লম্হি গ্রামে। উল্লেখযোগ্য রচনা 'গোদান', 'সদ্গতি', 'শতরঞ্জ কী খিলাড়ী', 'কর্মভূমি' প্রভৃতি।

প্রকল্প—বিষয় (২) [লোকায়ত আঙ্গিক/সাহিত্য/রাজনীতি/ক্রীড়া/নাচ/গান/কলাক্ষেত্রের যে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের (অন্তত জেলাস্তরে পরিচিতি থাকতে হবে) সাক্ষাৎকার নিতে হবে। অন্তত ২০টি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে হবে।]

সাক্ষাৎকার গ্রহণ :

সাধারণভাবে আলাপ-আলোচনা আর সাক্ষাৎকার কিন্তু এক নয়। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে উপযুক্ত ও যথাযথ প্রস্তুতিসহকারে স্পষ্ট কোনো উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ আলাপচারিতাকেই আমরা 'সাক্ষাৎকার' বলে থাকি। উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট মানুষদের সাক্ষাৎকার মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হলে বা দৃশ্য শ্রাব্য মাধ্যমে সম্প্রচারিত হলে সাধারণ মানুষের কৌতূহল বিবৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্য এবং তাঁদের বিশ্লেষণ সম্পর্কেও তাদের ধারণাও তৈরি হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সমাজ, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, খেলাধূলা বিভিন্ন বিষয়েই সাক্ষাৎকার

থেকে নানান দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত পাওয়া যায়। মূলত সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করেই একজন সাংবাদিক ও তাঁর সংবাদটি গড়ে তোলেন, কেননা এটাই হলো তথ্য অনুসন্ধানের প্রকৃষ্ট পথ। সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব সাংবাদিক/সাক্ষাৎকারগ্রহীতার কথা বলার দক্ষতা ও কৌশল, প্রশ্নকরণে পটুত্ব, মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান, ধৈর্যশীলতা, মানব চরিত্র বোঝার ক্ষমতা, প্রসঙ্গ-অনুসারী আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্পৃহা ও সক্ষমতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ধীরস্থির মানসিকতা, আস্থা অর্জনের ক্ষমতা, একই সঙ্গে যাচাইয়ের ক্ষমতা, প্রয়োজনে গুরুত্ব বা ধরন অনুযায়ী সাক্ষাৎকারকে সংবাদ সাক্ষাৎকার, মতামত সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার, সম্প্রদায়গত সাক্ষাৎকার কিংবা সাংবাদিক সম্মেলন বা আলোচনাভিত্তিক সাক্ষাৎকার—ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে। সাক্ষাৎকারদাতার অনুমতি নিয়ে সাক্ষাৎকার প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করতে হয়। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে রেকর্ডার অথবা লিখিত প্রশ্নাবলি থাকা আবশ্যিক। মনে রাখতে হবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা না করে সাক্ষাৎকারদাতাকে কথা বলতে উৎসাহিত করাই একজন প্রকৃত সার্থক সাক্ষাৎকার প্রার্থীর কাজ।

শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব তাঁদের নিজগুণে আমাদের আকৃষ্ট করেন। তাঁরা সাহিত্য, সিনেমা, নাচ, গান, নাটক, খেলা প্রভৃতি নানান ক্ষেত্রের মানুষ। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই নিষ্ঠা, প্রতিভা ও সাধনার বলে স্ব স্ব ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ এবং উদ্ভাসিত করে থাকেন। তাই এঁদের জীবন-সৃষ্টিশীলতা-দক্ষতা আমাদের ভাবায়, ভালো লাগায়, আলোড়িত করে আর তাঁদের সম্পর্কে কৌতূহলী করে তোলে। এই সমস্ত মানুষদের ছোটোবেলার কথা, সেই সময়কার পরিবেশ, জীবনের চমকপ্রদ বিভিন্ন ঘটনা, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে নিজের প্রস্তুতি ও প্রতিভার বিকাশ সম্পর্কে বিশদে জানতে পারলে আমরা বিস্মিত হই। আর যে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের এইসব বিশিষ্ট নানা দিক নিয়েই গড়ে ওঠে সাক্ষাৎকার।

সাক্ষাৎকার মানেই সাক্ষাৎকার-দাতা এবং সাক্ষাৎকারীর খোলামেলা আলাপচারিতা। কথায় কথায় স্বনামধন্য সেই মানুষটির ভেতরে লুকিয়ে থাকা অসাধারণত্বগুলোকে আবিষ্কারের চেষ্টা। তাই একদিকে কারও সাক্ষাৎকার নেওয়া মানে যেমন সেই মানুষটাকে আবিষ্কার করা, ঠিক তেমনই সাক্ষাৎকারীর মনেও থাকা উচিত আবিষ্কারের আনন্দ। আর যে কোনো সার্থক সাক্ষাৎকারে এই গুণ দুটি আমাদের কখনই চোখ এড়ায় না। সুতরাং, কারও সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে কয়েকটি বিষয়ে সচেতন থেকে আমরা নিজেদের তৈরি করে নেব—

- সাক্ষাৎকার-দাতা যে ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত, সেই বিষয়ে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা গড়ে নেওয়া। অর্থাৎ কোনো ফুটবলারের সাক্ষাৎকার নিতে হলে ফুটবল খেলা বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা জরুরি। একইভাবে গায়িকা/গায়কের সাক্ষাৎকার নিতে হলে গান সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান না থাকলে চলবে না।

- যে ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেব তাঁর সম্পর্কে নির্দিষ্ট 'হোম-ওয়ার্ক' সেরে নেওয়া। 'হোম-ওয়ার্ক' কীভাবে করব? সেই ব্যক্তির কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা, পরিচিত হওয়া। ধরা যাক কোনও লোকশিল্পীর সাক্ষাৎকার নেব, তিনি মৃৎশিল্পী হলে তাঁর হাতের কাজগুলি দেখা, তাঁর স্বাতন্ত্র্য বুঝতে চেষ্টা করা, জীবনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে আগাম খোঁজখবর নেওয়া। আবার কবি বা লেখকদের ক্ষেত্রে তাঁদের লেখা বইগুলি পড়া, প্রবহমান ধারার নিরিখে তাঁর সৃষ্টিশীলতার বৈশিষ্ট্য বুঝতে চেষ্টা করা। এছাড়াও সেই ব্যক্তির অন্যান্য সাক্ষাৎকার পড়া। যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং কথোপকথনে নতুনত্ব আসে। তবে মনে রাখা উচিত আমরা আমাদের জানা বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, প্রিয় ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার নিতেই পছন্দ বোধ করি।

- এই প্রস্তুতি-পর্ব শেষ হলে, সাক্ষাৎকারের জন্য একটা প্রশ্নমালা তৈরি করে ফেলা প্রয়োজন। প্রশ্নমালা অনুসারেই কথায় কথায় আলাপচারিতা জমে উঠবে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে প্রশ্নমালা যেন কখনই কথোপকথনের সাবলীলতাকে নষ্ট না করে, তাই পরিস্থিতি অনুসারে প্রশ্নমালায় রদ-বদল ঘটাতে হতে পারে। কেননা সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের পরিবর্তে এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের মানবিক ও সৃষ্টিশীল নানা দিকগুলিকে আবিষ্কার করাই সাক্ষাৎকারীর প্রধান উদ্দেশ্য।

- একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবসময় মাথায় রাখতে হবে, প্রাঞ্জল ভাষায় পুরোটা লেখার সময় সাক্ষাৎকার-দাতার বক্তব্য বা মতামত যেন কখনই বিকৃত না হয়।

- একইভাবে সাক্ষাৎকার-পর্ব সমাধা হলে দুটি খাতায় দুটি নমুনা তৈরি করে, একটি বিদ্যালয়ে জমা দাও আর একটি নিজের সংগ্রহে রাখো।

  তোমাদের বোঝার আরও সুবিধার জন্য বিখ্যাত দু'জন মানুষের সাক্ষাৎকারের এমনই (দুটি) নমুনা রইল তোমাদের জন্য।—এমন হতে পারে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিত্ব হয়ত তোমার জেলায়/এলাকায় নেই। কিন্তু কৃতী, গুণী, কর্মচঞ্চল এমন মানুষ আছেন যাঁর সাধনা, প্রতিভা ও কর্মকুশলতা অন্য কারো চেয়ে কম নয়। এখন তুমিই হতে পারো তাঁর সাক্ষাৎকার-প্রার্থী।

- সাক্ষাৎকার-দাতা যদি একাদিক্রমে গান, গল্প, নাটক, কবিতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পারঙ্গম হন; অর্থাৎ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব হন, সেক্ষেত্রে কোনও বিশেষ দিক বা বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রশ্নমালা তৈরি করে আলাপচারিতা চালানো সহজ ও সমীচীন হবে। নয়তো কথায় কথায় নানা বিক্ষিপ্ত বিষয় এসে পড়লে কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে যায়, সাক্ষাৎকার দিশাহীন হয়ে পড়ে।

একটি নমুনা সাক্ষাৎকার : ক্রীড়া সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্যের মুখোমুখি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

‘স্পোর্টস মানে কখনও ধুলো; কখনও রক্ত, কখনও ট্রফি’—সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, এপ্রিল, ২০১০

(আই পি এলে চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে ইন্টারভিউটা নেওয়া। তখন চিপকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হেরে অসহনীয় হয়ে পড়েছে নাইটদের অবস্থা। সেই সময় চেন্নাই-কলকাতা আকাশপথে বাংলা নববর্ষের আগের বিকেলে পাওয়া গেল বিষণ্ণ সৌরভকে।)

গৌতম : চিদাম্বরমের জন্য একটা ইংরেজি অভিব্যক্তি এখন বাজারে খুব চলছে। ‘হোয়্যার ডাজ দ্য বাক স্টপ’? চূড়ান্ত দায়িত্বটা কার? নাইটদের হারের জন্য দায়িত্ব কে নেবেন?

সৌরভ : আমাদেরই নিতে হবে। ক্যাপ্টেনকে নিতে হবে। টিমকে নিতে হবে। বিশেষ করে ক্যাপ্টেন হিসেবে আমাকেই ঘাড়ে নিতে হবে। জিতলে প্রশংসা যদি নিতে পারি, হারলে সমালোচনাটাও নিতে হবে।

গৌতম : শাহরুখ বলেছেন, হারের সমস্ত দায় তাঁর। ‘টুইট’-এ লিখেছেন, দায়ভার সব তিনি গ্রহণ করলেন।

সৌরভ : না, না শাহরুখ নেবে কেন? ও তো খেলেনি। দায়ভার নিচ্ছি আমরা। খেলেছি তো আমরা। ও তো মাঠে নামেনি।

গৌতম : হারতে হারতে ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলি ব্র্যান্ডটায় মরচে পড়ে যাচ্ছে না? ভয় হচ্ছে না সেই পালিশটা ঘষটে যাবে?

সৌরভ : স্পোর্টস মানে সারাক্ষণ ট্রফিতে পালিশ করা নয়। স্পোর্টস হল জীবন। সত্যিকারের জীবন। যেখানে ধুলো আছে, দৌড় আছে, ঘাম আছে, গায়ে কালিমাখা আছে। আবার ট্রফি জেতাও আছে। দু’টোর সঙ্গেই মানাতে হবে।

আপনি যদি মনে করেন শুধু ট্রফি হাতে তুলবেন, সম্ভব নয়। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সারাক্ষণ। কখনও পড়বেন। কখনও রক্তাক্ত হবেন। আবার কখনও জিতবেন। আমিও তাই। চেষ্টা করে যাচ্ছি। হয়তো এ বার পারিনি। কখনও হয়তো পারব। আজ হয়নি, কাল হবে।

গৌতম : কিন্তু নাইট সামর্থকেরা তো অধৈর্য হয়ে পড়ছেন। তিন বছর ধরে প্রতীক্ষায় তাঁরা। টিমটা সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারছে না।

সৌরভ : প্রথম বছর টিম ভালো ছিল না। গত বছরের গল্প জানেন। নতুন করে বলার দরকার নেই। এ বার আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক ছিল। প্রস্তুতি হয়েছিল। টিম ঠিক হয়েছিল। ট্রেনিং যথেষ্ট ছিল। পরিবেশ ঠিক ছিল। রিজার্ভ বেঞ্চ ভালো ছিল। আমি ভাবতেই পারিনি এ বার ব্যর্থ হব।

অথচ বড়ো ম্যাচগুলোতে আমরা খেলতেই পারিনি। এটাই জীবন। সব সময় যা চাইবেন তা পাবেন না।

গৌতম : বাইরে সাতটা ম্যাচ খেলে এ বার কে কে আর-এর ফল ১-৬। মোহালি ছাড়া সর্বত্র হেরেছে। ব্যাখ্যা কী?

সৌরভ : বোর্ডে যথেষ্ট রান তুলতে পারিনি।

গৌতম : মানসিক কোনও ভীতি কাজ করেছে?

সৌরভ : পারিনি। আসল আসল ম্যাচগুলোতেই হেরে গিয়েছি। টুর্নামেন্টে এগোতে হলে আপনাকে বড়ো ম্যাচগুলো জিততে হবে।

গৌতম : অতীতে ভারত অধিনায়ক থাকার সময় ব্যাটসম্যান গাঙ্গুলি অনেক সময় ক্যাটেন গাঙ্গুলিকে উতরে দিয়েছে। অরেঞ্জ ক্যাপে আপনি তিন নম্বরে অথচ সেটা হল না কেন?

সৌরভ : ওই যে বললাম, আসল আসল খেলাগুলো হেরে গিয়েছি।

গৌতম : আপনার হিতৈষীরা অনেকে মনে করছেন, এই ফর্ম্যাটে আরও খেলা চালিয়ে গেলে আপনি নিজের সুনামের প্রতি চরম অবিচার করবেন। অবসর নেওয়াটা যেমন গৌরবজনক হয়েছিল সেই রোশনাই চলে যাবে।

সৌরভ : আমি মনে করি না। নিরাপদ আর সহজ থেকে জীবন চালানোটা আমার কাছে স্থিতাবস্থা। সে তো করাই যায়। আমি সে ভাবে ভাবি না। বহু বছর আগে আপনি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, পাকিস্তান যাচ্ছেন। পাকিস্তান থেকে তো কোনও ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন জিতে ফেরেনি। তাঁদের মতো ফিরে এসে আপনার অধিনায়কত্বও না চলে যায়।

আমি বলেছিলাম, ও ভাবে ভাবছিই না। গ্রেগ চ্যাপেলের সময় যখন সাউথ আফ্রিকায় কামব্যাক করলাম, আমায় ভালোবেসে এক ফটোগ্রাফার বলেছিল, তোকে যদি ওখানে না ফিরিয়ে ইন্ডিয়ায় খেলাত ভালো হতো। ওরে বাবা সাউথ আফ্রিকার মাঠ! আমি বলেছিলাম, ওখানে তো কী? রান পাওয়ার হলে সাউথ আফ্রিকাতেই পাব।

আপনারা কেউ কেউ বলেছেন, গত বছরই কেন টি-টোয়েন্টি থেকে রিটায়ার করলাম না? এই পর্যায়ের ক্রিকেটে আমার পক্ষে রান করা সম্ভব নয়। এ সব শুনে তো ছেড়েই দিতে পারতাম। কী দরকার ছিল ঝুঁকির মধ্যে যাওয়ার। কিন্তু যদি ছাড়তাম, নিজেকে কি টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটসম্যান হিসেবে এ ভাবে প্রমাণ করতে পারতাম?

গৌতম : আপনি যাই বলুন, নাইট সমর্থকেরা কিন্তু একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

সৌরভ : আমি জানি ওঁরা খুব হতাশ হয়েছেন। তা হলে এবার আমাদের কথা ভাবুন। আমাদের—প্লেয়ারদের কী মনের অবস্থা। টিমের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে তাদের কী করুণ পরিস্থিতি।

গৌতম : অতঃপর কী হবে?

সৌরভ : কী আবার হবে? পরের দু'টো ম্যাচ জেতার চেষ্টা করতে হবে। যাতে সম্মান নিয়ে শেষ করা যায়।

গৌতম : এই কথাটাই খুব ট্র্যাজিক নয়?

সৌরভ : ট্র্যাজিক মুহূর্ত বলে স্পোর্টসে কিছু নেই। প্রত্যেকটা ব্যর্থতাই হতাশজনক মুহূর্ত। যেটা আপনাকে শেখায়, আপনি যথেষ্ট ভালো ছিলেন না। আবার সেটাই ধাক্কা দিয়ে সোজা করে দেয়। বুঝিয়ে দেয় পরের দিন আপনাকে যথেষ্ট ভালো হতে হবে।

গৌতম : নিজের ভাবমূর্তি নিয়ে ভাবছেন না? সেটা গোল্লায় যাচ্ছে কি না?

সৌরভ : কীসের ভাবমূর্তি? স্পোর্টস কি ভাবমূর্তি রক্ষার ডিজাইনিং নাকি? স্পোর্টস আপনাকে শেখায় ব্যর্থতা নিয়ে পড়ে না থাকতে। প্রতি বার যখন মাঠে নামবেন প্রতিদিন নিজের না পারাগুলোকে পিছনে ফেলে নামবেন। আমার ধারণা সব সফল লোকেরাই তাই করেন। ব্যর্থতার কথা ভেবে নামেন না।

কোম্পানি মনে করুন আপনাকে ওয়াঘা সীমান্তে কভার করতে পাঠাল। প্রথম দিন স্টোরি পেলেন না। দ্বিতীয় দিন স্টোরি পেলেন না। তো তৃতীয় দিন কি এডিটরকে ফোন করবেন? যে, না আমি পারব না। নাকি কামড়ে পড়ে থাকবেন! স্টোরি আসবেই। আজ না হোক কাল।

গৌতম : ভারতীয় দলেও এভাবে ভাবতেন?

সৌরভ : নিশ্চয়ই। জীবনেও এভাবে ভাবি। আমি জানি সব সময় সফল হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে কী হবে? লর্ডস টেস্টে সেদিন খেলতে নামার সময় যদি আমি ভাবতাম, এই রে উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ চলে যেতে পারে, তা হলে লাইফের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরিটাই হত না। জীবনে যদি ব্যর্থ হওয়ার এত ভয় থাকে আপনার দ্বারা কিছু হবে না। কোনো ম্যাচে কভার ড্রাইভ মারতে গিয়ে আউট হয়েছিলেন পরের দিনও যদি ভাবেন, না বাবা কভার ড্রাইভ মারব না তা হলে চলবে কী করে? আপনাকে ভাবতে হবে কভার ড্রাইভ মারব। আজ রান হবে। স্পোর্টস তাই।

গৌতম : তা হলে আপনি আই পি এল চেষ্টা চালিয়ে যাবেন?

সৌরভ : নিশ্চয়ই। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তো দু'বছর ধরে কিছু জিততে পারেনি। শচিন তো রান পাচ্ছিল না। তাতে কি হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসেছিল? মাঠেই তো ফেরত এল। মাঠেই তো প্রমাণ করল। আমিও সেভাবে দেখি। প্রত্যেকটা ব্যর্থতাকে আমি মনে করি নতুন চ্যালেঞ্জ। আমরা ব্যর্থ হয়েছি ঠিকই। একই সঙ্গে আমরা সুযোগ পাচ্ছি পরেরবার ব্যর্থতাটা শুধরে নেওয়ার।

(কৃতজ্ঞতা : গৌতম ভট্টাচার্য)

সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি সত্যজিৎ রায়

পরম পথিক সত্যজিৎ রায়

(আলংকারিক ও প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের নিজের মতামত আমরা এই সাক্ষাৎকারে পড়ব)

সঞ্জীব : আপনি ছিলেন চিত্রশিল্পী। শান্তিনিকেতনে আপনি প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর কাছে চিত্রাঙ্কন শিখেছেন। জীবন শুরু করেছেন চিত্রশিল্পী হিসেবে।

সত্যজিৎ : আমি ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিলাম; কিন্তু আমি যে চিত্রশিল্পী হব, সেটা আমার মাথায় ছিল না। আঠারো বছর বয়েসে বি এ পাশ করার পর, অত তাড়াতাড়ি চাকরির কথা ভাবতে চাইনি, আর আমার মায়ের একটা অনেক দিনের শখ ছিল যে আমি শান্তিনিকেতনে যাই, রবীন্দ্রনাথ তখনও বেঁচে, তাঁর সান্নিধ্যে কিছুটা কাল কাটিয়ে আসি। কলাভবনে নন্দলালবাবুর কাছে আঁকাটা শিখে আসি। আমি নিজে চিত্রশিল্পী হবার কথা কোনওদিনই ভাবিনি। আমি ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিলুম, বিশেষ করে আর্ট হিস্ট্রি সম্পর্কে, আমাদের শিল্পের পশ্চাৎপটটা কী, সেই জ্ঞান সংগ্রহের ভয়ানক একটা ইচ্ছে আমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যায়। আমাদের

ট্র্যাডিশানটা কী। ফাইন আর্টস শেখার ইচ্ছে আমার ছিল না। আর্টের লাইনে যেতে হলে আমি কমার্শিয়াল আর্টকেই বেছে নিতাম; কিন্তু আমি জানতাম, আমাদের আর্টের ট্র্যাডিশানটা জানা থাকলে আমার সুবিধে হবে। আমার কাজ আরও সহজ হবে। এই ভেবেই আমার শান্তিনিকেতনে যাওয়া। শান্তিনিকেতনের পাঁচ বছরের কোর্স, আমি আড়াই বছর থেকে চলে আসি। রবীন্দ্রনাথ তো মারাই গেলেন। আমরা থাকতে থাকতেই। আর আমিও নন্দলালবাবুকে, মাস্টারমশাইকে বললুম যে, মাস্টারমশাই আমি তো কমার্শিয়াল আর্টের দিকে যাব, আর এখানে তো কমার্শিয়াল আর্ট শেখানো হয় না, এখানে ফাইন আর্টস শেখানো হয়, আর সেই ফাইন আর্টসের মোটামুটি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমার হয়ে গেছে, আমি তাহলে এইবার একটা চাকরির ব্যবস্থা দেখি কলকাতায় গিয়ে। মাস্টারমশাই সে কথা শুনে রাজিও হলেন। তার মানে আমি আমার কোর্সের মাঝামাঝি সময়ে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় চলে এলাম। কলকাতায় এসে বেশিদিন আমাকে বসে থাকতে হয়নি। আমি ছ মাসের মধ্যে চাকরি পেয়ে গেছি, বিজ্ঞাপনের আপিসে। ডি জে কিমারের এজেন্সিতে। একেবারে জুনিয়ার আর্টিস্ট হয়ে ঢুকি। সেখান থেকে বেশ মোটামুটি চটপট উন্নতি করে, আমি শেষটায় বছর সাতেকের মধ্যেই আর্ট ডিরেক্টার হয়ে গিয়েছিলাম। তা এই তো হলো গিয়ে ঘটনা।

সঞ্জীব : চিত্রকলায় সেই সময় আপনি একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। তাই নয় কি?

সত্যজিৎ : করেছিলাম, সেটা তোমার ওই ইন্ডিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। শান্তিনিকেতন থেকে আমি ক্যালিগ্রাফি শিখে এসেছিলাম। তাছাড়া বিজ্ঞাপনে কী ভাবে ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশান ঢোকানো যায় সে চেষ্টা আমি করেছিলাম। ফলে আমার কাজের চেহারা একটু অন্যরকমের হতো।

সঞ্জীব : তাহলে দেখুন, যে কাজেই আপনি হাত দিয়েছেন সেই কাজেই আপনার প্রতিভার স্পর্শ লেগেছে। ছবি আঁকা তো একটা ভয়ঙ্কর রকমের প্রাণের জিনিস, নেশার জিনিস, সেই সময় আপনার করা বইয়ের মলাট একটা আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল।

সত্যজিৎ : হ্যাঁ। বইয়ের মলাট। সেটা অবশ্য একটা আলাদা ব্যাপার, ওর সঙ্গে আমার বিজ্ঞাপন আপিসের কোনও যোগ ছিল না। দিলীপকুমার গুপ্ত আমাদের বিজ্ঞাপন, আপিসের অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার ছিলেন, তিনিই করলেন সিগনেট প্রেস। তাঁর অনুরোধেই আমি বইয়ের মলাটের কাজ করতে শুরু করি। আর বইয়ের ব্যাপারটা যখন আরম্ভ হলো, তখনই আমি এই যে ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশান বা শান্তিনিকেতনের ট্র্যাডিশান, সেই ট্র্যাডিশান আমি বইয়ের মলাটে প্রয়োগ করলাম, যা আগে কখনও হয়নি। সেই রকম কয়েকটা নতুন জিনিস আমি দিতে সক্ষম হয়েছিলাম।

সঞ্জীব : আচ্ছা, এ কথা কি আমি বলতে পারি, আপনি বইয়ের মলাটে হাত দেবার আগে বাংলা প্রকাশন জগৎ বইয়ের মলাট ঠিক কী হওয়া উচিত তা জানত না।

সত্যজিৎ : না, একধরনের ডিগনিফায়েড কাজ হতো বিশ্বভারতীর বইয়ের মলাটে। রবীন্দ্রনাথের বই ছাপার ব্যাপারে বিশ্বভারতী বিশেষ যত্ন নিতেন। তবে হ্যাঁ, সেখানেও যে সেন্‌সে আমি বইয়ের মলাট শুরু করেছিলাম, সে সেন্‌সে কিছু ছিল না।

সঞ্জীব : সে তো হতো একেবারেই প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। কোরা জমির ওপর লেখা।

সত্যজিৎ : হ্যাঁ, হ্যাঁ। তার ওপর লেখা। মাঝে মাঝে জাপানি ধরনের ছবি বা রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা দিয়ে মলাট করা হতো। পরিশেষ, সঞ্চয়িতা, শেষের দিকের কিছু বই।

সঞ্জীব : সে খুবই কম।

সত্যজিৎ : খুবই কম। সে বেশি না।

সঞ্জীব : কিন্তু আপনি যখন বইয়ের মলাটের জগতে এলেন।

সত্যজিৎ : আমি যখন বইয়ের মলাটের জগতে এলাম; তখন আমি বোধ হয় একটা, মলাট যে তখন হতো না তা নয়, কিন্তু মলাটে তখন এত যত্ন নেওয়া হতো না। মলাটের পেছনে তখন এত চিন্তা হতো না। সেটা আমরা দিয়েছি।

সঞ্জীব : আপনার জীবনের সবচেয়ে উত্তীর্ণ, সবচেয়ে হিট মলাট বোধ হয়, সেই নামাবলীর ডিজাইন দিয়ে।

সত্যজিৎ : পরমপুরুষ।

সঞ্জীব : আজ্ঞে হ্যাঁ, পরমপুরুষ, মনে পড়ছে?

সত্যজিৎ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ, সেটা আমার মনে আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তখন আমার মাথা খুলে গেছে। তখন আমি নানা রকম জিনিস করছি। কবিতার বইয়েও আমি নানা রকম জিনিস করেছি। জীবনানন্দের বইতে করেছি, বিষ্ণু দে-র বইয়ে করেছি। সুধীন দত্তের বইয়েতে করেছি। একটার পর একটা, একটার পর একটা কাজ করে গেছি। কাজ হতোও প্রচুর। সিগনেট তখন কবিতার বইয়ের একটা বাজার তৈরি করেছিল। তার আগে তো কবিতার বই বিশেষ বিক্রি হতো না। সিগনেট আসার পর থেকেই কবিতার বইয়ের কাটতি বেড়েছিল। ফলে আমাকেও কাজ করতে হতো প্রচুর। প্রচুর কাজ করেছি; এবং তার মধ্যে ভালো কাজ নিশ্চয় কিছু বেরিয়েছে।

সঞ্জীব : তখন আপনার জীবনের দুটো দিক।

সত্যজিৎ : বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের একটা দিক।

সঞ্জীব : আর একটা হলো বইয়ের মলাট, প্রকাশনার।

সত্যজিৎ : হ্যাঁ, বইয়ের মলাটের একটা দিক, প্রকাশনার দিক।

সঞ্জীব : ভেতরের ইলাস্ট্রেশানও অনেক করেছেন।

সত্যজিৎ : ভেতরের ইলাস্ট্রেশনও অনেক করেছি, অনেক সময় করেছ।

সঞ্জীব : আপনার জীবনের এই পিরিয়ডটা কত বছরের?

সত্যজিৎ : তা দশ থেকে বারো বছর তো হবেই। বারো বছর বলা যেতে পারে; কারণ নাইনটিন ফর্টি থ্রিতে আমি চাকরিতে ঢুকি, নাইনটিন ফর্টি ফোর, ফর্টি ফাইভ থেকে আমি সিগনেটের কাজ আরম্ভ করি। নাইনটিন ফিফটি ফাইভ পর্যন্ত আমি ডি জে কিমারের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এবং তারপরে... তারপর তো আমার ছবির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। পথের পাঁচালি হয়ে গেছে। নাইনটিন ফিফটি টুতে পথের পাঁচালি হয়েছে। পথের পাঁচালি শেষ হয়েছে ফিফটি ফাইভে এবং মুক্তি পেয়েছে। সেই সময় আমি বিজ্ঞাপনের কাজটা ছেড়ে দি। বিজ্ঞাপনের কাজের ওপর খুব একটা আস্থা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম, আমার ভালো লাগত না কারণ, বিজ্ঞাপন করতে গেলেই, ওই একটি 'ক্লায়েন্ট' নামক বস্তুর সম্মুখীন হতে হয়, এবং তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী জিনিসটাকে তৈরি করতে হয়। ওইটাই আমার ভালো লাগত না। আমার যেটা মনে হয়েছিল, যে আমি স্বাধীনভাবে কাজ করব, আমি যেটা করব সেটার ওপর আর কেউ খবরদারি করবে না।

সঞ্জীব : কলম চালাবে না।

সত্যজিৎ : কলম চালাবে না বা কোনও রকম হুকুম জারি করবে না।

সঞ্জীব : ফর্টি থ্রি আর ফিফটি ফাইভ।

সত্যজিৎ : ফিফটি ফাইভ, ফিফটি ফাইভে পথের পাঁচালি ভালো চলার পর আমি ডি জে কিমারের চাকরি ছেড়ে দি।

সঞ্জীব : ফর্টি থ্রিতে আপনার বয়েস কত ছিল?

সত্যজিৎ : বাইশ।

সঞ্জীব : বাইশ আর ফিফটি ফাইভ, তার মানে বারোটা বছর। বারো বছরে এত সব ঘটে গেল। তারপর সিগনেট প্রেসে মনে হয় নানা রকম গোলমাল হয়ে গেল।

সত্যজিৎ : সিগনেটে তো তারপরেই সব গোলমাল হয়ে গেল।

সঞ্জীব : তার মানে যেখানে আপনি সবচেয়ে ভালোবেসে কাজ করতেন, সেই জায়গাটা গেল।

সত্যজিৎ : হ্যাঁ। সেই জায়গাটা গেল; কিন্তু ততদিনে আমার ফিল্ম আরম্ভ হয়ে গেছে।

সঞ্জীব : ফিল্ম আরম্ভ হয়ে গেছে এবং নতুন হরাইজন খুলে গেছে।

সত্যজিৎ : একেবারে।

সঞ্জীব : আচ্ছা আপনি যখন ছবি করার কথা ভাবলেন, পথের পাঁচালি, তখন নিশ্চয় চিন্তা করেছিলেন, কেন পথের পাঁচালি! কেন অন্য বই নয়! আপনি বারে বারেই বলেছিলেন, আপনার উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ।

সত্যজিৎ : উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ বটেই, তবে সেটা পথের পাঁচালির বেশ কিছু আগে। সে হল ফর্টি এইট, ফর্টি নাইনের কথা। তখন আমি ঘরে বাইরের কথা চিন্তা করেছি।

সঞ্জীব : পথের পাঁচালি কী ভাবে আপনার নির্বাচনে এল?

সত্যজিৎ : পথের পাঁচালির চিন্তা এল ছবি আঁকতে গিয়ে। সত্যি কথা বলতে কী, পথের পাঁচালি আমি তখনও পড়িনি। সত্যিই পড়িনি। যখন ছবি আঁকর প্রশ্নটা উঠল। সিগনেট প্রেস পথের পাঁচালির একটি কিশোর সংস্করণ আম আঁটির ভেঁপু নাম দিয়ে বার করার সিদ্ধান্ত নিল। ছবি আঁকার ভার পড়ল আমার ওপর। আমার যদ্দূর মনে পড়ছে, দিলীপ গুপ্ত সজনীকান্ত দাসকে দিয়ে ছোটোদের মতো করে লেখালেন, আর আমাকে বললেন, ছবি আঁকতে। সেই ছবি আঁকার জন্যে পুরো পথের পাঁচালিটা আমাকে পড়তে হলো। পড়তে হয়েছিল মানে এই নয় যে একটা দায়িত্ব নিয়ে পড়া।

সঞ্জীব : মানে ছবি করব বলে সিরিয়াসলি পড়া।

সত্যজিৎ : না, তা না, বেশ আনন্দ নিয়েই পড়েছিলাম, আর পড়তে পড়তেই মনে হয়েছিল, এ থেকে খুব ভালো একটা ছবি হয়।

সংক্ষেপিত

(কৃতজ্ঞতা : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়)

প্রকল্প বিষয়—৩ [ছ'মাসের দৈনিক সংবাদপত্রের খেলার পাতার কাটিং সংগ্রহ এবং তার ভিত্তিতে নিজের দেশ বা রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে উত্থান-পতন বিশ্লেষণ করে অবস্থান মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন লিখতে হবে। ন্যূনতম শব্দ সংখ্যা ১০০০।]

প্রতিবেদন রচনা :

প্রতিবেদন সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা তোমাদের আছে। কেননা এই বিষয়টির সঙ্গে তোমরা মাধ্যমিক স্তরেই পরিচিত হয়েছ। সাধারণত দৈনিক সংবাদপত্রের জন্য লিখিত হওয়ায় প্রতিবেদনের একটি নির্দিষ্ট গঠন-কৌশল আছে। আর তা তোমাদের জানা। তোমরা অনেকেই নিয়মিত সংবাদপত্রের খেলার পাতা পড়ো। এবার আমরা সংবাদপত্রে প্রকাশিত এইসব খেলার প্রতিবেদনের সাহায্যেই আমাদের প্রকল্প প্রতিবেদনটি তৈরি করব। কীভাবে? ধাপে ধাপে এগোন যাক।

- প্রথমে স্থির করে নিতে হবে কোন্ খেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে আমার প্রতিবেদন। আমাদের প্রত্যেকেরই এক বা একাধিক খেলার প্রতি আগ্রহ, আকর্ষণ রয়েছে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স, টেনিস, দাবা, ভলি নানা রকম। এক্ষেত্রে যে খেলার নিয়মকানুন আমি জানি এবং নিজেও খেলেছি এমন খেলা নির্বাচন করাই হবে বাঞ্ছনীয়। আর একই সঙ্গে ঠিক করে নিতে হবে সেই খেলায় পশ্চিমবঙ্গ নাকি ভারতবর্ষের উত্থান-পতন নিয়ে আমি প্রতিবেদন লিখব।

- ধরা যাক আমি ভারতীয় ক্রিকেট, ভারতীয় টেনিস, ভারতীয় হকি কিংবা বাংলার ফুটবল, বাংলার সাঁতার, বাংলার টেনিস এমন কিছু একটা বেছে নিলাম। (মহিলা বা পুরুষ যে কোনও একটা বিভাগ নিয়েই কাজ করা যাবে।)

- নির্বাচন পর্ব শেষ হলে, আমরা পরের ধাপের কাজে হাত দেব। লক্ষ্য করে দেখা যাবে জাতীয় পর্যায়ের কোনো প্রতিযোগিতা হোক, বিশ্ব ক্রম পর্যায়ের কোনো প্রতিযোগিতা হোক, দুই বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক দেশের কোনো প্রতিযোগিতা বা সিরিজ যাই হোক না কেন, মূল পর্যায়ের খেলা শুরু হওয়ার আগে প্রতিটি রাজ্য বা দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিপর্ব থাকে। সংবাদপত্রে নিয়মিত এইসব প্রস্তুতি শিবিরের খবর বেরোয়। নিজের দেশ বা রাজ্যের প্রস্তুতি, অনুশীলন, কোচ, অধিনায়ক, খেলোয়াড় এবং অন্যান্য সাহায্যকারী ব্যক্তির মতামত যেমন বেরোয় তেমনই প্রতিপক্ষ শিবিরেরও একইরকম খবর বেরোয়। আমরা নিয়মিত সংবাদপত্র থেকে নিজের নির্বাচিত খেলা ও দলের (রাজ্য/দেশ) এই খবরগুলির কাটিং সংগ্রহ করে প্রকল্পের খাতার জন্য সংগ্রহ করব। এবং সংবাদপত্রের সন-তারিখ-সহ আটকাব। এর সাহায্যে খেলা শুরু হওয়ার আগে উভয় পক্ষের মানসিকতা, অবস্থা, রণকৌশল সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠবে।

- এরপর খেলা শুরু হওয়ার পরে রোজ সাংবাদিকদের বিশ্লেষণ-সহ বিস্তারিত ম্যাচ রিপোর্ট সংগ্রহ এবং তা প্রকল্পের খাতায় আটকানোর পালা। এখানে একক কিংবা দলগত যে ধরনের খেলাই হোক না কেন খেলোয়াড় বা খেলোয়াড়দের অবদান, নৈপুণ্য, চাপের মুহূর্তে না হারার মানসিকতার প্রতিফলন প্রভৃতি বিষয়গুলি ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে। আবার দলগত খেলার ক্ষেত্রে দলীয় সংহতি, দলগত প্রচেষ্টা, অধিনায়কের নেতৃত্বদানের গুণাবলি ও দক্ষতার সঙ্গে অন্যান্য খেলোয়াড়দের

ব্যক্তিগত নিষ্ঠা, ত্যাগ ও নৈপুণ্যের দিকগুলি সংবাদপত্রের পাতায় যেভাবে প্রকাশিত হবে; তাও জোগাড় করে খাতার মধ্যে জুড়ে দিতে হবে।

- একইসঙ্গে মনে রাখতে হবে সাম্প্রতিককালে সব খেলার ক্ষেত্রেই কোচ, ক্রীড়া মনোবিদ, ফিজিওথেরাপিস্ট, চিকিৎসক, প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং অন্যান্য সাপোর্ট স্টাফদের মতামত-পরামর্শ-সাক্ষাৎকার, খেলা চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রের পাতায় বেরোয়। এখনকার খেলায় এগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনও সফল খেলোয়াড় বা জয়ী দলের সাফল্যের পেছনে এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমার নির্বাচিত খেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই ধরনের মানুষদের বিবৃতি, মতামত, সাক্ষাৎকার কিংবা কলাম দেখলে তাও সংগ্রহ করব।

- এই সমস্ত কাটিং সংগ্রহ করার সময় কোনও বিশেষ ম্যাচ বা খেলোয়াড় সম্পর্কে যদি তোমার কোনও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ থাকে, যা হয়ত সংবাদপত্রে পেরোয়নি, তা আলাদা কাগজে ম্যাচের নাম-তারিখসহ লিখে রাখতে পারো। যা তোমার চূড়ান্ত প্রতিবেদন লেখার সময় ব্যবহার করলে প্রতিবেদনে অভিনবত্ব আসবে।

- প্রকল্পের খাতাটি কেমন হবে—

✓ নির্বাচিত খেলার নাম।

✓ নিজের দেশ/রাজ্য (কী নির্বাচন করেছ?)

✓ বিগত ছ'মাসের সেই খেলার তালিকা। (যেখানে দেশ/রাজ্য অংশগ্রহণ করেছে)।

✓ প্রথম থেকে খেলা অনুসারে প্রস্তুতি পর্ব—ম্যাচের বিবরণ—ফলাফল—বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মতামত/সাক্ষাৎকার—এসবের এক বা একাধিক সংবাদপত্রের কাটিং (পাতার ওপরে সংবাদপত্রে নাম-তারিখ-সহ) পরপর সাজিয়ে ছ'মাসের গতিপ্রকৃতি ফুটিয়ে তোলা।

[প্রয়োজনে কিংবা খাতার সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খেলায় সফল খেলোয়াড়দের ছবিও দিতে পারো]

✓ এইভাবে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পের খাতাটি তৈরি হয়ে গেলে চোখের সামনেই নিজের দেশ/রাজ্যের ওই সময়কাল জুড়ে উত্থান কিংবা পতনের অর্থাৎ ক্রীড়া মানচিত্রে তার গতি-প্রকৃতির রেখাচিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

✓ এবার খাতায় ব্যবহৃত পেপার কাটিংগুলির নিরিখে, খাতার শেষে সহজ সরল ভাষায় উপযুক্ত শিরোনামসহ নিজের নামে প্রতিবেদনটি লিখে ফেলব।

———

প্রকল্প বিষয় — ৪ [বিদ্যালয় জীবনের কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে (মৌলিক) এক বা একাধিক স্বরচিত গল্প লিখতে হবে।]

স্বরচিত গল্প লিখন :

মানুষের গল্প শোনার আগ্রহ চিরকালীন। আমরা প্রায় সকলেই গল্প শুনতে ও বলতে ভালোবাসি। সত্যি কথা বলতে যে কোনো ভারী বিষয় গল্পের ছলে বলা হলে আমাদের সহজ লাগে। কেননা গল্পের সঙ্গে মানুষের জীবনের সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের প্রতিদিনকার নানা ঘটনায়, বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় কতো গল্প লুকিয়ে থাকে। আবার রোজ হয়ত নতুন নতুন গল্পের সম্ভাবনাও তৈরি হয়। এই ধরো বিদ্যালয় জীবনের শেষ স্তরে এসে, একবার যদি ফিরে তাকিয়ে নিজের শৈশব ও কৈশোরের বিদ্যালয় জীবনের কথা ভাবা হয়, এমন দু'একটা ঘটনা মনে পড়বেই যা গল্পের মতো ফিরে ফিরে আসে। এরকম কোনো একটা ঘটনাকে কেন্দ্রে রেখেই তো গল্প লিখে ফেলা যায়। আবার এমন কোনো ঘটনা-মুহূর্তও গল্পের বিষয় হয়ে উঠতে পারে, যার বয়স হয়ত মাত্র কয়েকদিন। তবে বিদ্যালয় জীবনের ঘটনাহীন দৈনন্দিনতাকেও গল্পের বিষয়বস্তু করে তোলা যায় শুধুমাত্র লেখনীর গুণে। সুতরাং যে কোনো পন্থাই অবলম্বন করা যেতে পারে। কিন্তু ছোটোগল্প লেখার কিছু কৌশল আছে, লেখার সময় সেগুলো খেয়াল রাখতে হবে। কেননা গল্প বিষয়টি অত্যন্ত প্রাচীন হলেও ছোটোগল্প নামক ফর্মটি সাহিত্যের আধুনিক যুগের সন্তান। ছোটোগল্প নিয়ে লেখক ও সমালোচকদের নানা মত রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের 'ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা/ছোটো ছোটো দুঃখকথা/নিতান্তই সহজ সরল; কিংবা পাশ্চাত্য সমালোচকের ভাষায়— 'A short story must contain one and only one informing idea...' প্রভৃতিও হয়ত অনেকে পড়ে থাকবে। কিন্তু ছোটোগল্পের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে, আমরা ছোটোগল্প লেখার সময় যে দিকগুলি খেয়াল রাখবো তা একবার সংক্ষেপে স্পষ্ট করে দেখে নিই—

- পরিমিত পরিধির মধ্যে, কয়েকটি সুনির্দিষ্ট চরিত্র ও কোনো একটি কেন্দ্রীয় ঘটনাকে অবলম্বন করে ছোটোগল্প গড়ে ওঠে এবং বিকশিত হয়। বহু চরিত্র এবং বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা গল্পের গতিকে ব্যাহত করে। তাই চরিত্র, ঘটনা ও বিষয় নির্বাচনে বিচক্ষণতা দেখানো প্রয়োজন। আর আবেগ সংহত রেখে বাহুল্যবর্জিত ভাষায় গল্প লেখার চর্চা করতে হবে।
- চরিত্র ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আকস্মিকতা, নাটকীয়তা এবং শেষে এমন এক ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত; যাতে গল্প পাঠ শেষ হলেও তার রেশ পাঠকের মনে থেকে যায়।
- গল্পের প্রধান গুণ নিহিত থাকে, তার কাহিনি অংশের মধ্যে; তাই নিজের ভাষায় গুছিয়ে কাহিনি লেখার কৌশল অভ্যেস করতে হবে।
- উপস্থাপনা, প্রয়োগ ও কল্পনাশক্তির বৈচিত্র্যে খুব সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা গল্পও অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং সুখপাঠ্য হয়, তাই এইসব দিকগুলোকেও গল্প লেখার সময় মাথায় রাখতে হবে।
- সর্বোপরি স্বরচিত ছোটোগল্প লেখার মতো বিষয়টি আসলে সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টিশীলতার জায়গা। তাই বিভিন্ন পরামর্শ জানা থাকলেও শেষ পর্যন্ত নিজের ভাবনা, কল্পনাশক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং লেখনী-শক্তির উপরেই গল্পের সার্থকতা নির্ভর করবে।

- তুমি স্বাধীনভাবে খোলামনে নিজের ভাষায় এক/একাধিক গল্প লিখে শিক্ষিকা/শিক্ষক মহাশয়ের পরামর্শ নাও। প্রয়োজনে কয়েকবার লেখো। সুযোগ থাকলে বিদ্যালয় পত্রিকা/দেয়াল পত্রিকায় জমা দাও। আরো অনেকের মতামত পাবে। তার ভিত্তিতে নিজের বিবেচনা অনুসারে পরিমার্জন করো এবং শেষে প্রকল্পের গল্প হিসেবে জমা দাও।
- বাংলা সাহিত্যের অনেক প্রথিতযশা লেখক বিদ্যালয় জীবনকে কেন্দ্র করে বহু অসাধারণ গল্প লিখেছেন। আমরা একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম, পড়া না থাকলে, পড়ে দেখো। তারপর নিজের মৌলিক রচনায় হাত দাও।

গল্প	লেখক
পাগলা দাশু	সুকুমার রায়
নন্দলালের মন্দ কপাল	সুকুমার রায়
গিন্নি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জেনারেল ন্যাপলা	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
বন্ধু	প্রেমেন্দ্র মিত্র
হেড মাস্টার	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
যোগেন পণ্ডিত	বনফুল
নতুন ছেলে নটবর	লীলা মজুমদার
বন্ধু বাৎসল্য	আশাপূর্ণা দেবী
অঙ্ক স্যার, গোলাপিবাবু আর টিপু	সত্যজিৎ রায়
না-পাহারার পরীক্ষা	শঙ্খ ঘোষ
মিস দত্তের ক্লাস	বাণী রায়
মানিকজোড়	সুনির্মল বসু
একটা ইস্কুলের গল্প	বুদ্ধদেব বসু
মুখ দেখে	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
প্ল্যানচেট	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট : দুই

প্রুফ সংশোধন রীতি ও পদ্ধতি
(নির্দেশিকা ও নমুনা)

নির্দেশিকা

নিজের হাতে লেখা যে কোনো রচনাই হলো পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপি যখন ছাপার জন্য পাঠানো হয় তাকে আমরা চলতি কথায় 'কপি' বলে থাকি। ছাপাখানায় মুদ্রণের সময়ে বিভিন্ন কারণে (যেমন হাতের লেখার অস্পষ্টতা, বানান সম্পর্কিত অসাবধানতা, অসতর্কতা, ব্যস্ততা ইত্যাদি) প্রায়ই নানারকমের ভুল থেকে যায়। কিন্তু এ ধরনের ভুল থাকা কাম্য নয়।

মুদ্রণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ভুল সংশোধনের প্রক্রিয়াটির পোষাকি নাম 'প্রুফরিডিং'। এবার আমাদের জানার বিষয়টি হলো প্রুফ সংশোধনের নির্দিষ্ট রীতি ও পদ্ধতিটি ঠিক কেমন! এরই সঙ্গে কোনো রচনার বিষয় অনুসারে শিরোনাম নির্দেশ এবং অনুচ্ছেদ-বিভাজনের কৃৎ-কৌশলটিও আমাদের শিখে নিতে হবে।

প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে যে যে বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে :

- ভুল বানানগুলিকে চিহ্নিত করে নিয়ে সংশোধন করতে হবে। মান্য বানানবিধি অনুসরণ করে এ কাজটি করতে হবে।
- যতি চিহ্নের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। (যেমন '।', ',','.', '!', '?' '-', '—', '/', ''/", ':', ':—'ইত্যাদি) কোনো ক্ষেত্রে যতিচিহ্ন বাদ পড়ে থাকলে বা তার ভুল ব্যবহার হয়ে থাকলে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিতে হবে।
- পাণ্ডুলিপির কোনো অংশ প্রুফে বাদ পড়ে থাকলে বা একাধিকবার মুদ্রিত হলে মূল কপিটি দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।
- একই শব্দ বা বাক্য পরপর ছাপা হলে, কোনো ছাপা শব্দের উপরে অন্য শব্দ উঠে গেলে, একই প্রজাতির হরফের সঙ্গে অন্য হরফ জুড়ে গেলে, অক্ষর শব্দে এলোমেলো হয়ে গেলে, কোনো অক্ষর উল্টোভাবে বসলে, দুটি শব্দের মধ্যে অতিরিক্ত বা স্বল্প ফাঁক এসে গেলে, দুটি লাইনের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে, একই শব্দের বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে অনভিপ্রেত ফাঁক রয়ে গেলে, এক পয়েন্টের টাইপের মধ্যে অন্য পয়েন্টের টাইপ বসে গেলে (যে কোনো অক্ষরের আকারকেই বলা হয় Point), প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইটালিক/বাঁকা অক্ষর না বসানো হয়ে থাকলে সব ক্ষেত্রেই সংশোধন জরুরি।
- যে কোনো মুদ্রিত বিষয়ের সৌন্দর্য ও সুসংহত বিন্যাস রক্ষা করার জন্যে উপযুক্ত মারজিন ও পাতার ক্রমাঙ্ক বজায় রাখা প্রয়োজন।
- এ সকল সংশোধনের পাশাপাশি সমগ্র রচনাটিতে বাক্যের গঠনগত বিন্যাসটি ঠিক আছে কি-না তা দেখে নিতে হবে।
- প্রদত্ত বিষয়ের মূল ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি সহজ আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত শিরোনাম যুক্ত করাও আমাদের কাজের আওতাধীন। এক্ষেত্রে প্রুফ সংশোধনের পর মূল রচনাটি ভালো করে পড়ে নিয়ে তার নির্যাসটুকু চিহ্নিত করে নিতে হবে এবং শিরোনামে তারই প্রতিফলন থাকবে।

- অনুচ্ছেদ বিভাজন বিষয়টি রচনার ভাবের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত একটি গঠনগত দিক। রচনাপাঠে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার ঝোঁক বদলের প্রতি লক্ষ রেখে এ কাজটি করতে হবে। অনুচ্ছেদ বিভাজন যথাযথ হলে রচনার রসগ্রাহিতা যেমন বাড়ে, তেমনই পাঠকের কাছে সহজেই বিষয়বস্তুটি বোধগম্য হয়ে ওঠে।

- ১৯৫৮ সালের ১২ই জুলাই Indian Standard Institute (বর্তমানে Bureau of Indian Standards) প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে যে সর্বজনগ্রাহ্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছেন, তা অনুসরণে তোমাদের কাছে জরুরি কিছু প্রতীক-চিহ্ন দেওয়া রইল ধীরে ধীরে এই কৌশলটি রপ্ত করে নেওয়ার জন্য।

প্রুফ সংশোধনের কৌশল :

⌒/— জুড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

trs./— স্থানান্তরিত করার জন্য।

Ital/— বাঁকা অক্ষর বসাতে হবে।

St — কাটা হরফ ঠিক রাখ।

N.P./— নতুন প্যারাগ্রাফ আরম্ভ করার ক্ষেত্রে।

F2/— মোটা অক্ষর (Bold) দিতে হলে।

Run on— এক লাইনে সাজানোর জন্য।

d/— বাদ দিতে হলে।

See Copy —প্রুফে বাদ গেছে। কপি দেখে ঠিক করার নির্দেশের ক্ষেত্রে।

#/— প্রয়োজনীয় ফাঁক রাখার জন্য।

❛/— উদ্ধৃতি চিহ্ন বসানোর ক্ষেত্রে।

,/— কমা বসাও

।/— দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের জন্য।

Eq#/— ফাঁক সমান করার ক্ষেত্রে।

Less#/— ফাঁক কমানোর জন্য।

ব/— কোনো অক্ষর নীচে বসলে, যেমন—লুব্ধক/সম্বল।

ব/— কোনো অক্ষর উপরে বসালে, যেমন—স্তব্ধ।

F1— সরু হরফ প্রয়োজন।

Pt. up— টাইপ বড়ো করার জন্য।

Pt. down—টাইপ ছোটো করার জন্য।

══— লাইন সমান করতে হলে।

XX/— শব্দ জড়িয়ে গেলে ঠিক করার জন্য।

Caps — ইংরাজিতে ক্যাপিটাল লেটার করার ক্ষেত্রে।

যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে :

যথাস্থানে	(।) ʎ	পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন বসাতে হবে।
”	,/ ʎ	কমা চিহ্ন বসাতে হবে।
”	(ঃ)ʎ	কোলন চিহ্ন বসাতে হবে।
”	(;) ʎ	সেমিকোলন চিহ্ন বসাতে হবে।
”	? ʎ	জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসাতে হবে।
”	! ʎ	বিস্ময়বোধক চিহ্ন বসাতে হবে।
”	’ ʎ	অ্যাপসট্রফি (ঊর্ধ্বকমা) চিহ্ন বসাতে হবে।
”	‘ ʎOR’	একক উদ্ধৃতি চিহ্ন বসাতে হবে।
”	“ ʎOR ”	ডবল উদ্ধৃতি চিহ্ন বসাতে হবে।
”	… ʎ	উহ্য রাখার চিহ্ন বসাতে হবে।
”	(/) ʎ	স্ট্রোক চিহ্ন বসাতে হবে।
”	(/ OR)ʎ	প্রথম বন্ধনী বসাতে হবে।
”	- ʎ	হাইফেন বসাতে হবে।

নমুনা

প্রুফ :

হেঁয়ালি-নাট্য | 16pt. Heading

ইংরাজিতে এরকম খেলা আছে, তাকে বলে, 'শ্যারাড' (sharade)। এ
খেলা দেখতে হলে এমন কয়েকটি লোক দরকার যারা অন্তত একটু-আধটু
অভিনয় করতে পারে। তারপর এ মন একটি কথা নিয়ে অভিনয় করতে
হবে, যাকে ভাগ করলে দু-তিনটা কথা হয়, যেমন Handsome (Hand
ও some বা Sum) অথবা Carpet (Car বা Cur ও pet)।
অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যে কথার প্রথম অংশটি, দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্বিতীয় অংশটি,
তৃতীয় দৃশ্যে সমস্ত কথাটি বুঝিয়ে দিতে হবে; যাঁরা দর্শক থাকবেন তাঁরা সব
দেখেশুনে বলবেন, কোন কথাটি নিয়ে অভিনয় করা হলো। যদি কোনো
কথার যদি কোনো কথার তিনটি অংশ থাকে—যেমন হাঁস পা-তাল, তা
হলে অবশ্য চারটি দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে। বাংলাতেও 'শ্যারাড' বা
'হেঁয়ালিনাট্য' হতে পারে একটা বাংলা দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার
হয়। মনে করো বৈঠক কথাটা নিয়ে অভিনয় হচ্ছে। প্রথম দৃশ্য—'বই'।
একজন লোক দিনরাত খালি বই নিয়ে ব্যস্ত, কেবলই বই পড়ছে চারিদিকে
তার রাশি রাশি বই ছড়ানো রয়েছে দেখে বিরক্ত হয়ে বলছে, "তোমার ও
পোড়া বইগুলো একটু হাওয়া খেয়ে একবার নবুবাবুর বৈঠকে যাই" লোকটি
অগত্যা রাজি হয়ে বলল,

"আচ্ছা, তোমরা এগোও, আমি এইটা শেষ করেই আসছি।"

দ্বিতীয়দৃশ্য—'ঠক'। একটি ছোট্ট বইয়ের দোকান, তার সামনে দাঁড়িয়ে
এক ভদ্রলোক বইওয়ালাকে ভীষণ গালাগালি দিচ্ছেন। বলছেন, "চোর
বাটপাড় ঠক জোচ্চর, আগাম টাকাটা নিয়ে এখন বই দেওয়ার বেলায় ফাঁকি
দিচ্ছ।" বইয়ালা বলে, "সে কী মশাই। কার কাছে টাকা দিলেন? ভদ্রলোক
চুটমটে খুব খানিক শাসিয়ে চলে গেলেন। এমন সময়ে সেই বই-পড়া লোকটি
এসেছে; বইওয়ালা তাকে একটি বহুকালের পুরনো পুথি দেখাল—তার অনেক
দাম। লোকটি বইখানা কিনে বলল, "বইটা একটু কাগজে জড়িয়ে বেঁধে
দাও তো।" বইওয়ালা "দিচ্ছি" বলে বইখানা নিয়ে তার বদলে কতগুলো
বাজে বটতলার বই বেঁধে দিয়ে বলল, "এই নিন মশাই।" বই-পড়া লোকটি
তখন হাঁ করে অন্য বই দেখছিল, সে কিছুই টের পেল না, বইয়ের প্যাকেট
নিয়ে চলে গেল।

সংশোধিত রূপ :

হেঁয়ালি-নাট্য

ইংরাজিতে একরকম খেলা আছে, তাকে বলে, 'শ্যারাড' (Charade)। এ খেলা দেখতে হলে এমন কয়েকটি লোক দরকার যারা অন্তত একটু-আধটু অভিনয় করতে পারে। তারপর এমন একটি কথা নিয়ে অভিনয় করতে হবে, যাকে ভাগ করলে দু-তিনটা কথা হয়, যেমন Handsome (Hand ও Some বা Sum) অথবা Carpet (Car বা Cur ও Pet)। অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যে কথার প্রথম অংশটি, দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্বিতীয় অংশটি, তৃতীয় দৃশ্যে সমস্ত কথাটি বুঝিয়ে দিতে হবে; যাঁরা দর্শক থাকবেন তাঁরা সব দেখেশুনে বলবেন, কোন কথাটি নিয়ে অভিনয় করা হলো। যদি কোনো কথার তিনটি অংশ থাকে—যেমন হাঁস পা-তাল, তা হলে অবশ্য চারটি দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে। বাংলাতেও 'শ্যারাড' বা 'হেঁয়ালি নাট্য' হতে পারে; একটা বাংলা দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হয়। মনে করো 'বৈঠক' কথাটা নিয়ে অভিনয় হচ্ছে।

প্রথম দৃশ্য—'বই'। একজন লোক দিনরাত খালি বই নিয়ে ব্যস্ত, কেবলই বই পড়ছে। তার চারিদিকে রাশি রাশি বই ছড়ানো রয়েছে দেখে বিরক্ত হয়ে বলছে, ''তোমারও ও পোড়া বইগুলো একটু রাখো দেখি। চলো একটু হাওয়া খেয়ে একবার নরুবাবুর বৈঠকে যাই।'' লোকটি অগত্যা রাজি হয়ে বলল, ''আচ্ছা, তোমরা এগোও, আমি এইটা শেষ করেই আসছি।''

দ্বিতীয় দৃশ্য—'ঠক'। একটি ছোট্ট বইয়ের দোকান, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বইওয়ালাকে ভীষণ গালাগালি দিচ্ছেন। বলছেন, ''চোর বাটপাড় ঠক জোচ্চোর, আগাম টাকাটা নিয়ে এখন বই দেওয়ার বেলায় ফাঁকি দিচ্ছ।'' বইওয়ালা বলে, ''সে কী মশাই! কার কাছে টাকা দিলেন?'' ভদ্রলোক চটেমটে খুব খানিক শাসিয়ে চলে গেলেন। এমন সময়ে সেই বই-পড়া লোকটি এসেছে; বইওয়ালা তাকে একটি বহুকালের পুরনো পুঁথি দেখাল—তার অনেক দাম! লোকটি বইখানা কিনে বলল, ''বইটা একটু কাগজে জড়িয়ে বেঁধে দাও তো।'' বইওয়ালা ''দিচ্ছি'' বলে বইখানা নিয়ে তার বদলে কতকগুলো বাজে বটতলার বই বেঁধে দিয়ে বলল, ''এই নিন মশাই।'' বই-পড়া লোকটি তখন হাঁ করে অন্য বই দেখছিল, সে কিছুই টের পেল না, বইয়ের প্যাকেট নিয়ে চলে গেল।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি

একাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক গ্রন্থিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক
আনুকূল্যে একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।
বিক্রয়যোগ্য নয়।